শিক্ষা-বিচিত্রা

শ্রীনিখিলরঞ্জন রায়

ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানি
কলিকাতা-১২
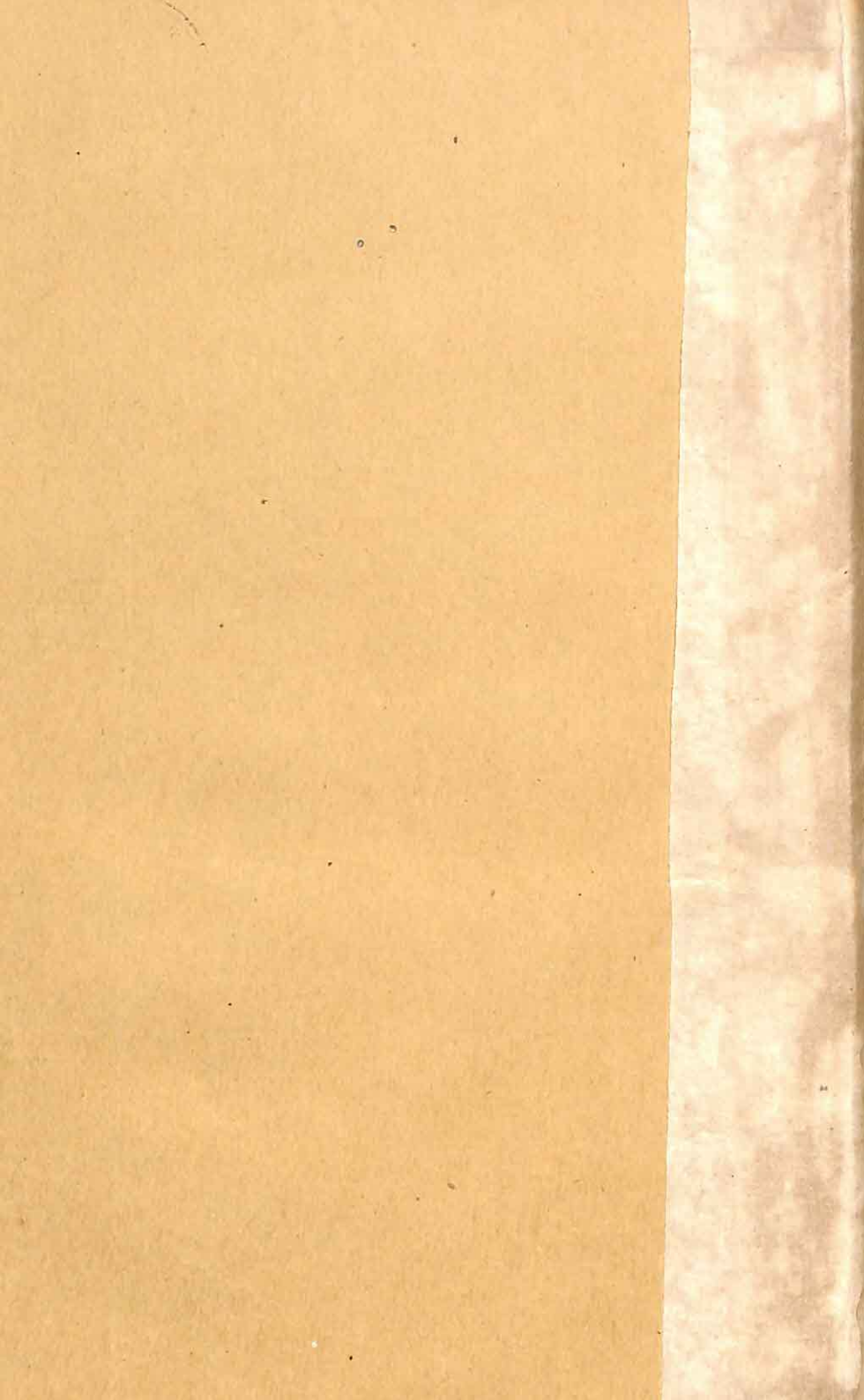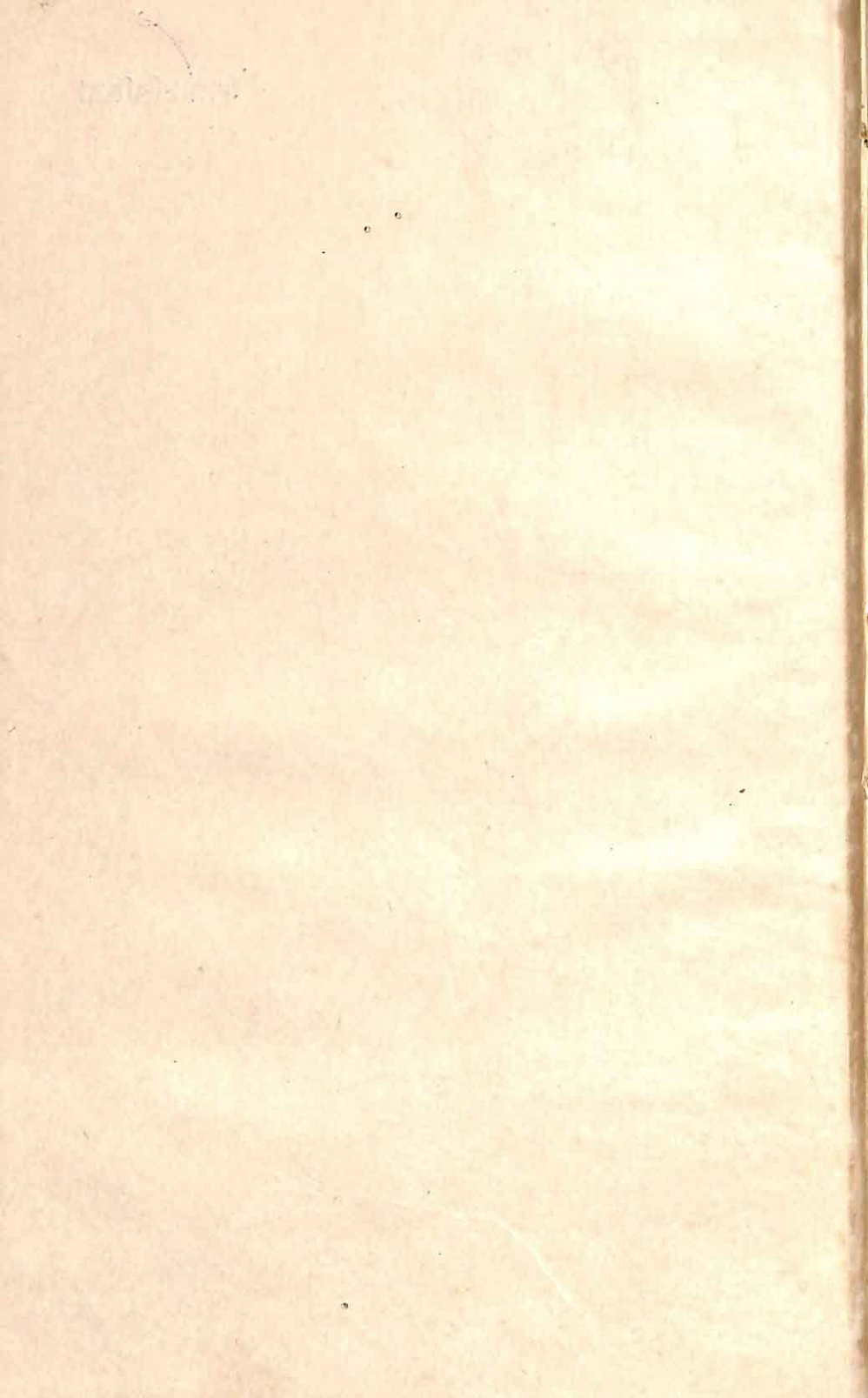
শিক্ষা-বিচিত্রা

শিক্ষা-বিচিত্রা

শ্রীনিখিলরঞ্জন রায়

ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি
৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট। কলিকাতা-১২

একনিষ্ঠ শিক্ষাব্রতী

শ্রীযুক্ত তামসরঞ্জন রায়

অগ্রজেষু

সূচিপত্র

শিক্ষা-বিচিত্রা

শিক্ষা-যুগের দুই প্রান্ত-পুরুষঃ

(১) দার্শনিক প্লেটো

মাটির পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবে—মানুষের এ হ'ল একটা বড় স্বপ্ন। বিজ্ঞান দিয়েছে মানুষকে প্রকৃতির উপর আধিপত্য আর ক্রমশঃই সেই আধিপত্যের ক্ষেত্র বিস্তৃতি লাভ করছে। জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে মানুষের কীর্তিধ্বজা প্রোথিত হয়েছে। শুধু দৃশ্যমান বহির্জগৎই নয়, প্রকৃতির অতি নিগূঢ় রহস্যও উদ্‌ঘাটিত হয়েছে বিজ্ঞানীর প্রখর, অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টির সম্মুখে। বিজ্ঞান এনেছে প্রকৃতির অপরিমেয় ভাণ্ডার লুণ্ঠন করে জড়-জীবনের প্রয়োজনীয় যাবতীয় সম্ভার। আরাম, আয়াস, সুখ-সম্ভোগের কত অভিনব উপকরণই আজ বিজ্ঞানের প্রসাদে মানুষের করতলগত। কিন্তু সেই কল্পিত স্বর্গরাজ্য কোথায়? মানুষ কি চায়? আপাত-মোহন সুখ-সমৃদ্ধির অন্তরালে না-পাওয়ার একটা হাহাকার মানুষের থেকেই যাচ্ছে! সেই স্বর্গরাজ্য আজও মানুষের নাগালের বাইরে! সুখ আছে, সমৃদ্ধিও প্রচুর, কিন্তু শান্তি কোথায়? মানুষ তার সন্ধান পেয়েছে কি? জড়বাদী বিজ্ঞান আর ভোগবাদী সভ্যতা কি এই প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিতে পারে? বিজ্ঞানের যত উৎকর্ষই সাধিত হোক না কেন, বিজ্ঞান নব নব ক্ষেত্রে যত কৃতিত্বই দেখাক না কেন, সেই প্রতিশ্রুত শান্তির স্বর্গরাজ্য এখনও বহুৎ দূর। কারণ কি? বিজ্ঞান মানুষের কল্যাণ এবং অকল্যাণ উভয়েরই পরিপোষক। এক হাতে খর্পর আর অপর হাতে বরাভয় এই কি হিন্দুর বিশ্বশক্তিরূপিণী জগন্মাতা-মূর্তির কল্পনা নয়? বিজ্ঞান একদিকে জীবের রক্ষক ও পরিবর্ধক, আর অপরদিকে সংহারক। কেন এমন হয়? বিজ্ঞানের প্রয়োগ, বিজ্ঞানের প্রতিপত্তি

এবং বিজ্ঞানের অগ্রগতি—সব কিছু যে মানুষকেই অবলম্বন করে। মানুষকে বাদ দিলে বিজ্ঞান অচল এবং অর্থহীন। মানুষই বিজ্ঞানের চালক ও প্রতিপালক। পরিচালকের গুণভেদে যেমন প্রতিষ্ঠানের গুণভেদ ঘটে, তেমনি মানুষের গুণভেদে বিজ্ঞানের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ সাধিত হয়। মানুষই আসল। বিজ্ঞান মানুষের হাতের পুতুল। মানুষের পূর্ণতা এবং মনুষ্যত্বের বিকাশের উপরেই নির্ভর করে বিজ্ঞানের সাফল্য ও সার্থকতা।

তাই মনুষ্যত্বের অনুশীলনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন অনেকেই। বহুজন বহুভাবে মানুষের চরিত্র-গঠনের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেছেন, শিক্ষায় চরিত্রগঠনকে দিয়েছেন অগ্রাধিকার। এখন থেকে ছু'হাজার চারশত বৎসর পূর্বে, খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম-চতুর্থ শতকে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার আদি পীঠ গ্রাসদেশে এই কথা নিয়ে প্রথম আলোচনা করেছিলেন দার্শনিক প্লেটো। সেই ছু'হাজার বৎসর পূর্বেকার কথার মূল্য আজও অপরিবর্তিত রয়েছে, আজও তার গুরুত্ব এতটুকু কমেনি। পরন্ত যুগ-প্রয়োজনে সেই পুরানো কথার পুনরাবৃত্তির আজ আবার একান্ত প্রয়োজন দেখা যাচ্ছে।

ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের আদি স্রষ্টা সোক্রাটিস-প্লেটো-এরিস্টটল। খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম-চতুর্থ শতকে এথেন্স নগরীতে এই মহান্ ত্রয়ীর আবির্ভাব। সোক্রাটিস-শিষ্য প্লেটো। প্লেটোর যখন বয়স মাত্র ২৩ বৎসর সেই সময় এথেন্স নগর-রাষ্ট্রে যে বিপ্লব ঘটে তার ফলে সমস্ত রাষ্ট্র-ক্ষমতা গণতান্ত্রিক সংসদের হস্তচ্যুত হয়ে ত্রিশজন সদস্যগঠিত এক দল-বিশেষের করতলগত হয়। ক্ষমতাপ্রাপ্ত দলের প্রভাবশালী কয়েকজন সদস্য ছিলেন প্লেটোর আত্মীয় বা বন্ধুস্থানীয়। নূতন শাসন-সংসদে যোগদান করবার জন্য প্লেটোর নিকট আহ্বান এল। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার এই এক অপূর্ব সুযোগ। প্লেটো সে সুযোগ গ্রহণও করেছিলেন। কিন্তু অনতিবিলম্বেই তাঁর ভুল ভাঙ্গল। তিনি যে আশা নিয়ে নবগঠিত শাসন-সংসদে যোগদান

করেছিলেন তার কর্মনীতি ও পদ্ধতির সঙ্গে তাঁর আদর্শগত বিরোধ প্রকট হয়ে উঠল, আর সেই বিরোধের মূল নিহিত ছিল মানুষের চারিত্রিক মূল্যায়ণে। প্লেটো দেখলেন, শাসন-সংসদের সদস্যেরা কলুষিত চরিত্রের লোক। ক্ষমতা-লোলুপতা এবং স্বার্থ-সাধন-প্রবৃত্তি এদের অভিভূত করে রেখেছে, রাষ্ট্রের প্রকৃত কল্যাণ এরা কামনা করে না, ক্ষমতা ও আধিপত্য নিয়েই এরা মশগুল। যে রাষ্ট্র ব্যবস্থার পরিবর্তন প্লেটো আশা করেছিলেন তার সম্ভাবনা সম্পূর্ণ তিরোহিত হয়ে গেল। প্লেটো সিদ্ধান্ত করলেন, রাজনীতি ততদিনই নিরর্থক, যতদিন না শুদ্ধ ও উন্নত চরিত্রের মানুষ রাজনীতির দায়িত্ব-গ্রহণে অগ্রসর হয়ে আসে। প্লেটোর সিদ্ধান্তের আরও বিশদ ব্যাখ্যায় তদ্‌গুরু সোক্রাটিসের বাণীর প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়ঃ Knowledge is virtue—জ্ঞানী ব্যক্তিই সদ্‌গুণী। প্লেটো বললেন, সামাজিক অশুভ ও অকল্যাণের অবসান ঘটবে সেদিন, যেদিন প্রকৃত জ্ঞানী ব্যক্তির হাতে সমাজ ও রাষ্ট্র-পরিচালনার ভার অর্পিত হবে।

"Either the real philosophers gain political control or else the politicians become by some miracle real philosophers."

এই সিদ্ধান্তের পর সক্রিয় ভাবে ক্ষমতালোভী রাজনীতি-ক্ষেত্রে আর থাকা চলে না। প্লেটো রাজনীতি-চর্চা ছেড়ে দিয়ে দর্শন-চর্চায় আত্মনিয়োগ করলেন। প্লেটোর মতবাদ লিপিবদ্ধ আছে তাঁর চিরায়ত বিখ্যাত গ্রন্থ Republic-এর পৃষ্ঠায়।

Republic গ্রন্থের এক-পঞ্চমাংশই শিক্ষা-বিষয়ক আলোচনা। শাসকবৃন্দের প্রকৃত শিক্ষণের কথা নিয়ে প্লেটো বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। রাষ্ট্র-পরিচালনা ন্যস্ত থাকবে শিক্ষিত প্রজ্ঞাবান ব্যক্তির উপর—এই হল প্লেটোর মূল বক্তব্য, আর শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য হবে চরিত্র-গঠন ও চরিত্র-বিকাশ। নৈতিক চরিত্রের উপর এতটা গুরুত্ব প্লেটোই প্রথম আরোপ করলেন। গ্রীক্ জাতি সুকুমার শিল্প ও

সৌন্দর্যানুশীলনের পথিকৃৎ। তাদেরই অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুখপাত্র প্লেটোর মতে সত্য, শিব ও সুন্দরের উৎস চারিত্রিক উৎকর্ষ। সুস্থ ও সুন্দর জীবনের তাগিদেই শিল্প-সৃষ্টির প্রয়োজন। নিছক আদর্শ-বিহীন, শিল্পের নিমিত্ত শিল্পের সমর্থনে তিনি কোন যুক্তিই প্রদর্শন করেননি। শিক্ষানীতির ব্যাখ্যায় প্লেটো বলছেন—শিক্ষা মানুষকে যা শ্রেয় তাকে শ্রদ্ধা করতে ও গ্রহণ করতে শেখাবে এবং যা হেয় তাকে ঘৃণা করতে ও বর্জন করতে উদ্বুদ্ধ করবে। ভোগমুখী মানুষ কি তা-ই চায়? কি সাহিত্য, কি চিত্রকলা কি সিনেমা—সর্বত্রই art for profit—বর্তমান যুগে শিল্পসৃষ্টির প্রধান প্রেরণা বা প্ররোচনা। শ্রেয়কে গ্রহণ আর হেয়কে বর্জন—প্লেটোনীতির সামাজিক গুরুত্ব আবহমান কাল বলবৎ থাকবে। যখনই সত্য এবং শ্রেয় অবজ্ঞাত হয় এবং স্বার্থবুদ্ধি প্রবল হয়ে ওঠে তখনই সামাজিক জীবনে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা দেখা যায় আর সমাজ-জীবন বিষ-জর্জরিত হয়।

আজ সমাজ-জীবনে প্রবল দুষ্টব্যাধি কালোবাজারি আর অতি লাভের আশা। সমাজ-দেহের শিরায় শিরায়, রক্তে রক্তে এই পাপের বিষ সংক্রামিত হয়ে মানুষের নীতিবোধকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। মৌখিক প্রতিবাদের অন্ত নেই। তারস্বরে সবাই কালোবাজারের বিরুদ্ধাচারী, কিন্তু সব প্রতিবাদই নিষ্ফল—কারণ, এই প্রতিবাদ নিছক মৌখিক, তার পিছনে কোন আন্তরিকতা নেই। মুখে যার মুণ্ডপাত করছি প্রাত্যহিক জীবনে পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ-ভাবে তাকেই সমর্থন করে যাচ্ছি। একজন অপরকে দোষ দিচ্ছে। অপরজন আর একজনের দোষ দেখাচ্ছে। কেউ আর নিজের দোষের কথা ভাবছে না। আত্মবিশ্লেষণ ও আত্মসংশোধনই এই বিষম গ্লানি হতে সমাজের মুক্তির একমাত্র উপায়। প্লেটো তাই বারবার প্রজ্ঞাশীল, বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তির হস্তে রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা অর্পণ করবার কথা বলেছেন। শিক্ষা সম্বন্ধে প্লেটোর

বক্তব্য স্পষ্ট ভাষায় বিবৃত হয়েছে ঃ যে তথ্য মানুষের জানা নেই, সেই তথ্য মানুষকে জানানোর নামই শিক্ষা নয় ; যেভাবে মানুষের আচরণ করা উচিত, সেই সদাচরণে মানুষকে প্রবৃত্ত করার নামই প্রকৃত শিক্ষা ঃ

"Education does not mean teaching men to know what they do not know ; it means teaching them to behave as they do not behave,"

বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এই কথাগুলি কত সত্য ! বিজ্ঞান নিয়ত প্রকৃতির নূতন নূতন রহস্যের উদ্‌ঘাটন করছে, আর শিক্ষার প্রসাদে সেই নব নব বার্তা নানা মাধ্যমে সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচারিত হচ্ছে। শিক্ষার দৌলতে কত তথ্যই না শিক্ষার্থী জানতে পারছে ! আজ শিক্ষা প্রধানতঃ তথ্য-সর্বস্ব। কত উপায়ে কত বিষয়ের কত তথ্য শিক্ষার্থীর মগজে ঢুকিয়ে দেওয়া যায়, তা-ই যেন শিক্ষার প্রধান ও পরম লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। শিক্ষার বড় উদ্দেশ্য চরিত্রগঠন এবং মনুষ্যোচিত সদ্‌গুণাবলীর বিকাশ— আজ প্রয়োজন-সিদ্ধির বিষম চাপে মামুলী কথার কথায় পর্যবসিত— ছাপা বইয়ের পৃষ্ঠায় নিবদ্ধ মাত্র এবং কার্যতঃ উপেক্ষিত। সহজে টাকা-রোজগারের পন্থা হিসেবেই আজ শিক্ষার মান ও মূল্য নির্ধারিত হচ্ছে। বিজ্ঞান ও বৃত্তি-বিষয়ক শিক্ষার উপর মাত্রাতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপিত হচ্ছে। ভারতের কথাই বিবেচনা করা যাক। দেশ আজ পুনর্গঠনের মুখে। একটা ব্যাপক ও দূরপ্রসারী পরিকল্পনানুসারে জীবনধারণের মান উচ্চতর করার জন্য বিপুল প্রয়াস করা হচ্ছে। পৃথিবীর বহু দেশের তুলনায় ভারতের আর্থিক অবস্থা অনেক নিচু। আর্থিক মানে ভারতকে অপরাপর দেশের সমকক্ষ করে তুলতে হবে—এই হচ্ছে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মুখ্য উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সফল করে তুলতে হলে চাই শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসার। তাই ভারতে আজ শিল্প-সংগঠনের এত তোড়জোড়। শিল্প-

সম্প্রসারণে চাই অসংখ্য কারিগর। তাই কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার আজ এত চাহিদা।

দলে দলে ছাত্র কারিগরি শিক্ষালয়গুলিতে ভীড় করছে। বৃত্তিমূলক কারিগরি-শিক্ষার প্রতি এই প্রবল ঝোঁকের পিছনে রয়েছে একটা সাময়িক সুবিধাবাদী মনোভাব। ইঞ্জিনীয়ারিং পাশের ভাল মন্দ ছাপ থাকলেই একটা চাকরি জূটবে—এই আশ্বাস রয়েছে কারিগরি-শিক্ষার প্রাত ঝোঁকের মূলে। দেশ-কল্যাণেচ্ছা একটা গৌণ উপলক্ষ্য মাত্র। শুধু কারিগরি-শিক্ষা কেন, শিক্ষার প্রায় ক্ষেত্রেই স্থূল প্রয়োজন-সিদ্ধি আজ একচেটিয়া প্রাধান্য লাভ করেছে। স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা-শিক্ষণ প্রায় সংবাদ-পরিবেশনের পর্যায়ে অবনমিত হয়ে এসেছে। শিক্ষার ভিতর চরিত্রগঠন বা মানুষ-তৈরির কোন সাগ্রহ চেষ্টা করা হচ্ছে কি? এ-প্রশ্নের কোন জবাব নেই। শিক্ষা, শিক্ষক ও শিক্ষার্থী আজ আদর্শের দিক দিয়ে সম্পূর্ণ নিঃস্ব ও দেউলিয়া।

পৃথিবীতে বেঁচে থাকার অধিকার সর্বজনীন। বেঁচে থাকার তাগিদেই জীবিকার কৌশল আয়ত্ত করাও একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু ঐটুকু নিয়ে সন্তুষ্ট থাকার মানে চুষিকাঠি নিয়ে শিশুর মত শান্ত থাকারই সামিল। এই সঙ্কীর্ণদৃষ্টি শিক্ষার বিরুদ্ধেই প্লেটোর সাবধান বাণী।

শিক্ষানীতি নির্দেশ করতে গিয়ে প্লেটো সর্বপ্রথমে জোর দিয়েছন চরিত্র গঠনের উপর। চরিত্রগঠনের অনুকূল পরিবেশ-সৃষ্টির কথাও উল্লেখ করেছেন বারবার। তাঁর Republic এবং Laws এই গ্রন্থদ্বয়ে শিক্ষা সম্বন্ধে যে মৌলিক তত্ত্ব অবতারণা করেছেন, তা সংক্ষেপে এই :

(১) তেমন বই-ই অধ্যয়ন করা বিধেয় যার বিষয়বস্তু এবং রচনা-বিন্যাস পাঠকের দৃষ্টি-ভঙ্গীতে এনে দেবে ঋজুতা ও আন্তরিকতা। জীবনের নানা সমস্যার শুদ্ধ সমাধানেই অধীত পুস্তক

সাহায্য করবে এবং নব নব প্রশ্নের রহস্যের উপর করবে আলোক-সম্পাত। মোট কথা, জীবনগঠনে সৎসাহিত্য-পাঠের উপকারিতা প্লেটোর অন্যতম প্রধান বক্তব্য।

(২) দ্বিতীয়তঃ প্লেটো জোর দিচ্ছেন সঙ্গীতানুশীলনের উপর। সুষম ছন্দ ও শব্দঝঙ্কার জীবনের প্রাত্যহিক আচরণে সমতা ও শুচিতা, সৎসাহস ও আত্মনিয়ন্ত্রণ-বিধান করবে এই ছিল প্লেটোর দৃঢ় বিশ্বাস।

(৩) তৃতীয়তঃ 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ'—উপনিষদোক্ত এই বাণীরই প্রতিধ্বনি মিলবে প্লেটোর কথায়। দৈহিক দুর্বলতা যেন মানসিক উৎকর্ষের পরিপন্থী না হয়ে দাঁড়ায়, সেইজন্যই শরীরচর্চার এত প্রয়োজন।

Republic গ্রন্থে প্লেটো বলেছেনঃ শিশুকে একটি সৎ ও সুন্দর পরিমণ্ডলের মধ্যে স্থাপন কর। পারিপার্শ্বিকের প্রভাব যেন তাকে সত্য, শিব ও সুন্দরের প্রতি আকৃষ্ট করে। কবির কাব্যে, সাহিত্যিকের রচনায় এবং শিল্পীর সৃষ্টিতে ফুটে উঠুক আদর্শ চরিত্রের অম্লান মহিমা। মনীষীপ্রবর প্লেটোর ইহাই বক্তব্য। নীচতা, হীনতা, ইন্দ্রিয়পরায়ণতা ও কামুকতা যেন চিত্রকলায়, ভাস্কর্যে স্থান না পায়; উদার ও মহৎ সৌন্দর্যই যেন শিল্পসৃষ্টির একমাত্র উপজীব্য হয়। প্লেটো বলেছেনঃ দিনের পর দিন যদি তোমার গাভী কটু আগাছা-ভরা মাঠে বিচরণ করে তবে সে গাভীর দুধও হবে বিস্বাদ এবং স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর। উৎকৃষ্ট মানসিক আহার মানুষ-শিক্ষার্থীর পক্ষেও অনুরূপভাবে অপরিহার্য। প্লেটোর কথাঃ

"Like a breeze bearing health from healthy lands influences from noble works may continually fall upon eye and ear from childhood upwards, and imperceptibly draw them into sympathy and harmony with the beauty of reason, whose impress they take."

সৎসাহিত্য এবং সুকুমার শিল্পের প্রভাবে শিশু-চরিত্র সুষ্ঠুভাবে

গঠিত হয়ে উঠবে। বৌদ্ধ অষ্টমার্গের অন্তর্নিহিত ভাবের সঙ্গে এই ভাবধারার কী অপূর্ব সামঞ্জস্য, আর বর্তমান কালের উদগ্র যৌন-আকৃতিসম্পন্ন সিনেমাচিত্র, টেলিভিশন, চিত্রকলা ও সাহিত্য অর্থাৎ জনসংযোগের যাবতীয় মাধ্যমের সহিত কী বিপুল বৈষম্য! দৈহিক সৌষ্ঠব এবং মানসিক উৎকর্ষ এ দু'য়ের উপরেই জোর দিয়েছেন প্লেটো। শিক্ষার মাধ্যম হবে কাব্য ও সঙ্গীত, ছন্দ ও শৃঙ্খলা। সুন্দর, সুগঠিত, স্বাস্থ্যোজ্জ্বল দেহ, আর উদার, অনুভূতিপ্রবণ, সজ্ঞান ও সংবেদনশীল মন—প্লেটো-পরিকল্পিত শিক্ষার এই হবে ফলশ্রুতি। শরীর-শিক্ষার উপর প্লেটো যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করে বলেছেন, সচ্চরিত্রগঠনে সর্বাগ্রে প্রয়োজন দৈহিক ও মানসিক বিকাশের মধ্যে সমতা-বিধান।

শুধু দেহ-সংগঠনে কোন পরমার্থ নেই। তেমনি কেবল মানসিক অনুশীলন মানুষকে পূর্ণতা দিতে পারে না। মানসিক শিক্ষাবিহীন মল্লবীর বড়জোর একটি সুদর্শন জন্তু, আর দুর্বলদেহী রুগ্ন মণীষী সংসারের অকেজো অপদার্থ আবর্জনাস্বরূপ। তাই প্লেটো প্রস্তাব করছেন যে, প্রত্যেক নাগরিক স্ত্রীপুরুষনির্বিশেষে প্রতি মাসে অন্ততঃ একদিন মুক্ত প্রাঙ্গণে খেলাধূলায় অতিবাহিত করবে। এমন কি তের থেকে আঠার বৎসর বয়স্কা মেয়েরা দৌড় এবং অশ্বারোহণ-জাতীয় শ্রমসাধ্য ব্যায়ামে অংশ গ্রহণ করবে। খেলাধূলা, ব্যায়াম এবং বক্তৃতা এই তিন নিয়ে দিনের কার্যসূচী রচিত হবে। সঙ্গে সঙ্গে তরুণেরা দলে দলে মুক্ত প্রান্তর শিবির-জীবনযাপনে অভ্যস্ত হবে। শিবির-জীবনে প্রত্যেককেই স্বহস্তে যাবতীয় পরিশ্রমের কাজ করতে হবে—শিবিরে পরিচারক এবং ক্রীতদাসের সেবা-গ্রহণ নিষিদ্ধ।

প্লেটোর শিক্ষানীতিতে আরও দুটো জিনিসের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রথমতঃ গণিত-বিজ্ঞান, আর দ্বিতীয়তঃ ইতিহাস। সে-কালে গণিতশাস্ত্র আজকের মত ফলিত বিজ্ঞান হতে পৃথকীকৃত হয়

নি। যা গণিত তা-ই বিজ্ঞান। গণিতবিজ্ঞান-চর্চার ব্যবহারিক মূল্য সম্বন্ধে প্লেটো পুরোপুরি সচেতন ছিলেন, কিন্তু তিনি মনে করতেন যে, গণিত-শাস্ত্রানুশীলন দ্বারা মানুষের মন বাস্তব প্রয়োজন-সিদ্ধির সীমারেখা উত্তীর্ণ হয়ে বৃহত্তর সত্যের প্রতি উন্মুখ হয়ে উঠবে। কেবল সমসাময়িক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে নয়, পরন্তু ভবিষ্যৎ দূরদৃষ্টি দিয়ে জীবনকে বিচার করতে শেখাবে বিজ্ঞান।

ইতিহাস-অধ্যয়নের ব্যাখ্যায় প্লেটোর অভিমত: অতীতের স্মৃতিই অতীতের ভুলভ্রান্তি থেকে আমাদের বাঁচায়। এ যুক্তি অখণ্ডনীয়। ইতিহাস নিজের পুনরাবৃত্তি করুক বা না করুক, ইতিহাসের শিক্ষা মানুষের ক্রমবিকাশে অপরিহার্য। ইতিহাস অতীতের ভিত্তি—বর্তমানের সৌধ যার উপর রচিত হয়!

প্লেটোর যৌবনকাল বেদনাসিক্ত। দু'টি প্রচণ্ড ধাক্কার টাল সামলাতে হয়েছিল অপেক্ষাকৃত অপরিণত বয়সেই! মাত্র ২৩ বৎসর বয়সে তাঁর রাজনৈতিক জীবনের অবসান ঘটে। ঘটনা-পরম্পরায় সমসাময়িক রাজনীতি এবং দলীয় সহকর্মীদের সহিত বিচ্ছেদ ঘটায় রাজনীতি-ক্ষেত্র হতে তিনি বিদায় নিতে বাধ্য হলেন। রাজনীতির উপর তিনি বিশ্বাস হারালেন।

প্লেটোর আটাশ বৎসর বয়সে গুরু সোক্রাটিস বিনাদোষে প্রাণ-দণ্ডে দণ্ডিত হন। যে আদর্শ রাষ্ট্র ও সমাজ প্লেটো গড়তে চেয়েছিলেন বাস্তব ঘটনার রূঢ় সংঘাতে তা স্বপ্নে বিলীন হয়ে গেল। এরূপ নিদারুণ বিপর্যয়ে যে-কোন ব্যক্তির পক্ষেই নৈরাশ্যবাদের আশ্রয়-গ্রহণ ভিন্ন গত্যন্তর থাকে না। কিন্তু প্লেটোর চরিত্র ছিল ভিন্ন ধাতুতে গড়া। তিনি বেছে নিলেন সমাজের কল্যাণ-সাধনের পথ। সমস্যার সমাধান কল্পে নির্দেশ জ্ঞাপন করলেন অকপট ভাষায়: প্রকৃত মানুষ তৈরি কর, শিক্ষাই মানুষ তৈরি করার একমাত্র উপায়। স্বতঃই স্মরণে আসে স্বামী বিবেকানন্দের কথা: "Man-making is my mission."—মানুষ তৈরি করাই আমার ব্রত।

(২) শিল্পযুগের শিক্ষাচার্য জন ডিউই

'অতীন্দ্রিয়তা বনাম বাস্তবধর্মিতা' পাশ্চাত্ত্য দর্শন-শাস্ত্রের একটা পুরানো বিতর্কের বিষয়।. ফলশ্রুতির আশ্বাসে প্রারব্ধ কর্মের অথবা প্রত্যক্ষ-লব্ধ ফল দ্বারা কোন প্রচেষ্টার মূল্যায়ণেরই নাম দার্শনিক পরিভাষায় প্র্যাগ্‌মেটিজম (Pragmatism)। কিন্তু কিন্তু তাতেও সব কথা বলা হয় না। প্র্যাগ্‌মেটিজম এক দিকে প্রত্যক্ষ ফলের আশ্বাস, আবার সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রিয়াতীত সুখ-স্বর্গের মোহন কল্পনাও বটে। বাস্তবধর্মিতা দর্শনশাস্ত্রের এক জটিল প্রশ্ন। পারলৌকিক জীবনের রহস্যগুলি ধর্মের ঘাড়ে আর মানব-মনের ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার রহস্য-সমাধানের ভার মনস্তত্ত্বের ঘাড়ে চাপিয়ে দর্শনশাস্ত্র নিশ্চিন্তে মানুষের প্রাত্যহিক বাস্তব জীবনের উদ্দেশ্য-নির্ণয় আর উন্নয়ন সাধনের উপায়-নিরূপণে ব্যাপৃত থাকলেই পারে না কি? এই প্রশ্নটা প্র্যাগ্‌মেটিক দার্শনিকদের ভাববার মত বিষয়।

দর্শনশাস্ত্রের চৌহদ্দি থেকে প্র্যাগ্‌মেটিজম্‌কে বের করে নিয়ে এসে শিক্ষা-শাস্ত্রালোচনায় প্রথম প্রয়োগ করেছিলেন হার্বার্ট স্পেনসার। বেকন, স্পেনসার ও মিলের উত্তরসাধক জন ডিউই। জন ডিউই প্লেটোর দার্শনিক তত্ত্বালোচনায় প্রবৃত্ত হয়ে আবিষ্কার করলেন যে, দর্শন-শাস্ত্রালোচনার সূত্রপাত হয়েছিল বাস্তব রাজনীতি এবং সামাজিক শৃঙ্খলাবিধানের তাগিদে। কিন্তু অচিরেই এক অতীন্দ্রিয় স্বপ্নলোকের গহনে হারিয়ে গেল দর্শনশাস্ত্রের বাস্তবধর্মিতা। পাশ্চাত্ত্য দর্শনের বিবর্তনের ধারা পরিবর্তিত হ'ল। জার্মান দার্শনিকেরা নিয়ে এলেন ধর্ম তথা আধ্যাত্মিক সমস্যাগুলি দর্শন-শাস্ত্রের আওতায়; আর, ইংরাজ দার্শনিকের চিন্তাভাবনা প্রযুক্ত হ'ল সামাজিক সমস্যার বিচার-বিশ্লেষণে।

জন ডিউই নিছক বাস্তববাদী। ডারুইনের বিবর্তনবাদের

তিনি একজন পূর্ণ সমর্থক। মানুষের মন এবং দেহ উভয়ই ক্রমশঃ বিবর্তিত হয়ে জীবন-যুদ্ধের উপযোগী হয়ে উঠেছে। কোন অপৌরুষেয় শক্তির অনুগ্রহে মানব দেহ-মনের আকৃতি বা প্রকৃতির গঠন-পরিবর্তন হয় নি।

অপৌরুষেয় শক্তিতে অবিশ্বাসী ডিউই'র মতে পরিবেশের প্রভাব দ্বারাই পার্থিব জগতের উদ্ভব, পরিবর্তন ও প্রগতি—এ-সবের ব্যাখ্যা করা চলে। দার্শনিক সপেনহরের ঐশী ইচ্ছা (Will) এবং বাঁর্গসর প্রাণশক্তিকে (*Elan Vital*) তিনি অস্বীকার না করলেও তার কাছে আত্মসমর্পণ করেননি। ভাগবতী শক্তি মানুষের ভিতরেই বিদ্যমান, তার জন্য কোন নিরপেক্ষ মহাজাগতিক (Cosmic) শক্তি-রূপ আধার খুঁজে বেড়ান বৃথা। প্রকৃতি ও পরিবেশের প্রতি বিশ্বস্ততাই বড় জিনিস। প্রকৃতপক্ষে এই দুনিয়ায় আধুনিক যুগ সে-দিনই শুরু হবে, যে-দিন ডিউই'র প্রকৃতিবাদ পূর্ণ মর্যাদা লাভ করবে—প্রতি ক্ষেত্রে এর যৌক্তিকতা স্বীকৃত হবে। জীবনকে বুঝতে হবে ধর্ম-বিশ্বাসের পৃষ্ঠপটে নয়, বুঝতে হবে জীবতত্ত্বের মাধ্যমে। এক-একটি বিশেষ পরিবেশে জীবকোষ বিভিন্নরূপে পরিবর্তিত, প্রভাবিত এবং প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে থাকে। মানুষের চিন্তা-ধারাও মুখ্যতঃ সামাজিক প্রভাবের খাত দিয়ে প্রবাহিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে।

পরিবেশ ও প্রভাবের উপরেই সমধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন জন ডিউই। কেবলমাত্র যে কোন একটা বিশেষ পরিস্থিতিতেই মানুষের ভাব-ভাবনার উন্মেষ হয়, সেকথা ঠিক নয়। চিন্তার বীজ অঙ্কুরিত, মুকুলিত ও ফলন্ত হয় সংস্কার ও সংস্কৃতির সামগ্রিক পরিবেশে। ব্যষ্টি বা একক ব্যক্তি সমষ্টি বা সমাজের প্রতিভূ, আবার সমাজও ব্যষ্টির প্রতিফলন। রাশি-রাশি সংস্কার, আচার-আচরণ, প্রচলিত নীতি, ভাষা ও ভাবের উত্তরাধিকার প্রভাব বিস্তার করছে নবজাতকের উপর এবং তাকে গড়ে-পিটে তুলছে

তারই পারিপার্শ্বিক সমাজের প্রতিবিম্বস্বরূপে। ঐশী শক্তির সর্বাত্মক নিয়ন্ত্রণ অথবা জন্মগত অপরিবর্তনীয় স্বভাব এ-দুয়েরই বিরুদ্ধবাদী হচ্ছেন ডিউই। সহজাত প্রবৃত্তিকে অত্যধিক গুরুত্ব আর শৈশব-শিক্ষণকে অত্যল্প গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে বলে ডিউই অভিযোগ করেছেন। সামাজিক উত্তরাধিকারের প্রবল প্রভাবকে জৈব প্রভাব বলে ভুল করা হয়েছে।

নিখুঁত পূর্ণতার উপাসক ছিলেন না জন ডিউই। পূর্ণতা (Perfection) আমাদের জীবনের লক্ষ্য নয়। জীবনের লক্ষ্য ক্রমোন্নতি ও ক্রমোৎকর্ষ। এই মতবাদের সঙ্গে 'চরৈবেতি'-আদর্শের আনুরূপ্য লক্ষ্য করা যায়। যেদিন চলার গতি রুদ্ধ হয়ে যাবে সেদিনই হবে জীবের অবলুপ্তি। শুধু আধ্যাত্মিক নয়, পার্থিব অর্থেও এ-কথা সত্য। অধম পুরুষ সে-ই, যে অন্য শত গুণ থাকা সত্ত্বেও আরও উন্নত হতে পারছে না, যে ক্রমশঃই নিচু ধাপে নেমে যাচ্ছে। আর উত্তম পুরুষ তিনি-ই, যিনি তাঁর শত ত্রুটি সত্ত্বেও ক্রমশঃ আত্মোন্নয়নের পথে অগ্রসর হচ্ছেন। উৎকর্ষের সংজ্ঞাও নির্দেশ করেছেন ডিউই ঃ আনুগত্য ও নিষ্ক্রিয় নিরীহতার নাম উৎকর্ষ নয়। কর্ম-সামর্থ্য ভিন্ন উৎকর্ষ নিরর্থক। বুদ্ধি ও মনস্বিতাই জীবনের শ্রেষ্ঠতম সম্পদ। অজ্ঞতা দৈবাশীর্বাদ নয়, অজ্ঞতা অচেতনতা ও দাসত্বের সামিল। জীবন-রূপায়ণে এবং মানুষের ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণে বুদ্ধির অবদান সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ।

আজ ফলিতবিজ্ঞান প্রতিযোগিতায় মনোবিজ্ঞানকে বহুদূর পিছনে ফেলেছে। মানুষ ফলিত বিজ্ঞানের যন্ত্রকৌশল আয়ত্ত করে পার্থিব সুখ-সুবিধা ও আরাম-আয়েশ যথেষ্ট পরিমাণেই ভোগ করছে বটে, কিন্তু জীবনের মহত্তর উদ্দেশ্যসাধনে প্রয়োজনসিদ্ধ বিজ্ঞানের মূল্য এখনও নিরূপিত হয় নি। প্রকৃতির উপর আধিপত্য-বিস্তার যতই বেশী হচ্ছে, ততই যেন মানুষ নিজের তৈরী বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে পড়ছে। কেন এই আধিপত্য ? কি ভাবে আয়ত্তীকৃত

প্রাকৃতিক শক্তিকে জীবনে প্রযুক্ত করা যায়? এই প্রশ্নই বর্তমান বিজ্ঞান-যুগের প্রধান প্রশ্ন। পাশ্চাত্ত্য দার্শনিক এই জিজ্ঞাসাকে অনুপম ভাষায় ব্যক্ত করেছেন:

"With all its efficiency, the European civilization is no high-level civilization. No one yearns for the ultimate. Few are in quest of the unknown. It is after all a mere bee-hive. This is but a bee-level civilization.

Perfect efficiency—but to what end? Improving their standard of living is a very commendable aim, but what are they living for? They are gathering more and more tools, increasing their destructive capacity, but what precisely is it they are fighting for? They at any rate do not know."

ডিউই ডিমোক্র্যাসিতে বিশ্বাসবান। ডিমোক্র্যাসির ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল থেকেও তিনি ডিমোক্র্যাসির প্রশস্তি রচনা করেছেন। প্রতিটি ব্যক্তির আত্মসংগঠন এবং আত্মোন্নতি-অর্জনই ডিমোক্র্যাসির প্রধান উদ্দেশ্য। আর, এই উদ্দেশ্য তখনই লভ্য, যখন গোষ্ঠী বা সমাজের স্বার্থের সহিত মানুষের স্বার্থ একাত্ম হয়ে ওঠে। রাজতন্ত্র বা ধনিকতন্ত্র গণতন্ত্র অপেক্ষা অধিকতর কর্মতৎপর, কিন্তু আবার বিপজ্জনকও বটে। রাষ্ট্রের যে মামুলী কাঠামোর সঙ্গে আমরা পরিচিত, তার উপর ডিউই আস্থা স্থাপন করেন নি। তিনি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কল্যাণ-রাষ্ট্রের সমাজসেবা এবং নিরাপত্তার বেশির ভাগ কার্যের নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার পক্ষপাতী। সংগঠিত স্বেচ্ছাসেবক-দল, যৌথ প্রতিষ্ঠান এবং ট্রেড-ইউনিয়ন ইত্যাদি সংস্থার মাধ্যমে ডিউই ব্যক্তি-স্বার্থ ও গোষ্ঠী-কল্যাণের মধ্যে একটা আপোস-

মীমাংসার কথা চিন্তা করতেন। স্বেচ্ছাসেবামূলক প্রতিষ্ঠানগুলি যতই সুষ্ঠুভাবে সংগঠিত হতে থাকবে রাষ্ট্র-কর্তৃত্ব ততই সহজ ও স্বাভাবিক রূপে এদের পরস্পরের মধ্যে মধ্যস্থতা ও বিরোধ-নিষ্পত্তি-বিধানে সফল হবে। বর্তমান রাষ্ট্র-সংগঠন রাজনীতি-ভিত্তিক। রাষ্ট্র-কর্তা একজন রাজনীতিক ব্যক্তি। রাষ্ট্র-বিন্যাসে অগ্রাধিকার রাজনীতিরই প্রাপ্য। কিন্তু স্বেচ্ছাসেবা-সংস্থা মাত্রেই যেমন, সাহিত্য বা বিজ্ঞান-পরিষদ, ব্যবসায়ী-সঙ্ঘ, শ্রমিক-মণ্ডলী বা ধর্মীয় মিশন ইত্যাদি—সঙ্কীর্ণ রাজনীতির গণ্ডি ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক মর্যাদা লাভ করতে পারে। জাতীয়তাবাদী রাজনীতি মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টি করে বিশ্বজনীন মনোভাবকে ক্ষুণ্ণ করে।

রাজনীতি সেদিনই পূর্ণ সার্থকতা অর্জন করবে, যেদিন সামাজিক সমস্যা-সমাধানে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও পরীক্ষা-নীতি প্রযুক্ত হবে। রাজনীতি-ক্ষেত্রে মানুষ এখনও পর্যন্ত কতকগুলি প্রমাণ-পরীক্ষা-নিরপেক্ষ তত্ত্ব নিয়ে মাতামাতি করছে। সমাজের ত্রুটি ও গলদ ততদিন দূর হবার নয় যতদিন কতকগুলি তত্ত্বসর্বস্ব রাজনৈতিক মতবাদই মানুষের অবলম্বন হয়ে থাকবে। ব্যক্তিতন্ত্র, গণতন্ত্র, রাজতন্ত্র বা অভিজাততন্ত্র যে কোন রাষ্ট্র-কর্তৃত্বের নমুনাই কল্পনা-প্রধান তত্ত্বমাত্র। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রয়োগ এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা দ্বারা প্রত্যেক রাজনৈতিক তত্ত্বের যৌক্তিকতার যাচাই আবশ্যক। ডিউই এই দৃষ্টিভঙ্গীর নাম দিয়েছেন 'Experimental attitude'। ডিউই'র নিজের কথাতেই এর ব্যাখ্যা পাওয়া যায়ঃ

"The experimental attitude substitutes detailed analysis for wholesale assertions, specific enquiries for temperamental convictions, and small facts for opinions whose size is in precise ratio to their vagueness. With the advance of the experimental method, the question has ceased to be—which one

of the two rival claimants has a right to the field. It has become a question of clearing up a confused subject-matter by attacking it bit by bit. There is no case where the final result was anything like victory for one or another among the pre-experimental notions. All of them disappeared because they became increasingly irrelevant to the situation discovered, and with their irrelevance they became unmeaning and uninteresting."

বাস্তব জীবনের সমস্যাগুলিকে সাহিত্যের হাতে তুলে দিয়ে দর্শনশাস্ত্র অপ্রাকৃত ও অবাস্তব কল্পনাবিলাসকে অবলম্বন করে একটা নিষ্ক্রিয়তার ভূমিকায় নীরব অভিনয় করে যাচ্ছে—ডিউই'র এই একটা বড় অভিযোগ। আধুনিক যুগে বিজ্ঞানের নিকট আত্মসমর্পণ করে দর্শন যেন পলায়নের পথ খুঁজে বেড়াচ্ছে। মানুষকে ও বর্তমান দুনিয়ার সব সমস্যা ও সংগ্রামকে পরিহার করে দর্শনশাস্ত্র আজ নিষ্ফল জ্ঞানতত্ত্বের (Epistemology) নিরাপদ পক্ষপুটে আশ্রয় খুঁজছে। দর্শনশাস্ত্রের এই অধোগতির প্রতিকারকল্পে ডিউই যে উপায় বাতলেছেন তা হচ্ছে এই যে, অন্যান্য বিষয়ের মত দর্শনশাস্ত্রকেও বাস্তবধর্মী হতে হবে। মাটির পৃথিবীই হবে দর্শনের ভাবনা-চিন্তার বিষয়।

"The task of future philosophy is to clarify men's ideas as to social and moral strifes of their own day".

১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে যুক্তরাষ্ট্রের পূর্বাঞ্চলীয় ভারমণ্ট প্রদেশের বার্লিংটন শহরে জন্মেছিলেন জন ডিউই। আমেরিকার পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশগুলিকে ব্যঙ্গচ্ছলে বলা হত ক্ষয়িষ্ণু পূর্বাঞ্চল। এই অঞ্চলেই তাঁর শৈশব ও শিক্ষাকাল অতিবাহিত হয়। পুরাতন পূর্বাঞ্চলীয় ঐতিহ্যকে

আয়ত্ত করে ডিউই বেরুলেন পশ্চিমের অপেক্ষাকৃত আধুনিক ও প্রগতিশীল কালচারের সন্ধানে। পশ্চিমের মিনেসোতা, মিসিগান ও শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে একাদিক্রমে ১৬ বৎসর অধ্যাপনা করে আবার পূর্বপ্রদেশে ফিরে গেলেন ডিউই, এবং কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপকের পদ অলঙ্কৃত করলেন। পূর্বাঞ্চলীয় পরিবেশ ডিউই'র জীবন-দর্শনকে বিশেষভাবেই প্রভাবিত করেছিল। পূর্বাঞ্চলীয় পরিবেশের প্রভাবে ডিউই পেয়েছিলেন একটা অকপট সরলতা, যে বৈশিষ্ট্য তাঁর চরিত্রে ও ব্যক্তিত্বে আজীবন অটুট ছিল। বিশ্বখ্যাতির উচ্চশিখরে আরোহণ করেও ডিউই তাঁর স্বকীয়তা থেকে বিচ্যুত হননি। শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরূপেই ডিউই চিন্তাধারার মৌলিকতার জন্য প্রথম বিশ্বখ্যাতি অর্জন করেন। জীবনের শেষ সময়টি পর্যন্ত (অর্থাৎ ১৯৫২ খৃষ্টাব্দ) ডিউই তাঁর প্রবল পরীক্ষা-অনুরাগ (experimental bent) বজায় রেখেছিলেন। যে-কোন নতুন ভাব বা বস্তুর প্রতি তাঁর ছিল একটা সহজাত প্রবল আকর্ষণ। শিক্ষাক্ষেত্রে যে কোন নতুন তত্ত্ব বা তথ্যের প্রতি ছিল তাঁর অপরিসীম অনুরাগ। ডিউই'র শ্রেষ্ঠ কীর্তি 'Democracy and Education' নামক গ্রন্থে তাঁর সমগ্র দার্শনিক চিন্তা অভিব্যক্ত হয়েছে। তাঁর এই গ্রন্থ আজ আমেরিকার শিক্ষব্যবস্থাকে যতখানি প্রভাবান্বিত করেছে, তেমন আর কোন কিছুই করতে পারেনি। আমেরিকার শিক্ষকমাত্রেই জন ডিউই'র নেতৃত্ব স্বীকার করে নিয়েছেন।

সংক্ষেপে জন ডিউই'র শিক্ষা-দর্শনের মূল বক্তব্যগুলিকে এইরূপে বিবৃত করা যায় :—

(১) পণ্ডিতী শিক্ষা উন্নাসিকতার স্রজক এবং ডিমোক্র্যাসির পরিপন্থী। পরন্তু পেশাগত জ্ঞাতিভাব ডিমোক্র্যাসির পরিপোষক।

(২) শিল্প-ভিত্তিক সমাজের বিদ্যালয়গুলিকে গড়ে তুলতে হবে ক্ষুদ্রায়তন কর্মকেন্দ্র ও কম্যুনিটি-রূপে। হাতে-কলমে কাজের ভিতর

দিয়ে বিদ্যালয়ই আর্থিক ও সামাজিক পরিস্থিতির উপযোগী কর্ম-কৌশলে এবং নিয়ম-শৃঙ্খলায় শিক্ষিত করে তুলবে আগামী দিনের নাগরিককে।

(৩) শিক্ষা কেবলমাত্র সাবালকত্ব-প্রাপ্তির জন্য প্রস্তুতিই নয়। শিক্ষার প্রয়োজন আজীবন ও আমরণ। বিদ্যালয়ী শিক্ষা ভবিষ্যৎ জীবনের প্রস্তুতির সহায়কমাত্র। মানুষের প্রকৃত শিক্ষা শুরু হয় স্কুল ছেড়ে যাবার পর থেকে, এবং চলতে থাকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত।

শিক্ষা ও মনের মুক্তি

ওরিয়েণ্টেশান (Orientation) কথাটার প্রচলন আজকাল সমধিক। শিক্ষা, সমষ্টি-উন্নয়ন, সমাজকল্যাণ এবং অন্যান্য বহু সরকারী বিভাগ বা বেসরকারী সংস্থার উদ্যোগে আজকাল নানা-শ্রেণীর শিক্ষণব্যবস্থা পরিকল্পিত ও পরিচালিত হচ্ছে। এই-সব শিক্ষণব্যবস্থায় ওরিয়েণ্টেশান কোর্সের একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান নির্দিষ্ট আছে। যে-কোন পূর্ণাঙ্গ শিক্ষণব্যবস্থার পূর্বেই ওরিয়েণ্টেশান কোর্সের বিধান দেওয়া হয়।

সমষ্টি-উন্নয়ন ব্লকসমূহে সমাজশিক্ষা-সংগঠক ও সংগঠিকা-নিয়োগের ব্যবস্থা আছে। সংগঠকদের মূল ট্রেনিং হয় দশ মাসের জন্য। সমাজশিক্ষা-সংগঠিকাদের সম্প্রতি নূতন নামকরণ হয়েছে মুখ্যসেবিকা। পাঁচ মাসের জব্-ট্রেনিং-এর (Job-Training) পর সমাজশিক্ষা-সংগঠকদের আরও কয়েকবার বিভিন্ন ধরনের ট্রেনিং-এ পাঠানো হয়। রিফ্রেশার কোর্স (Refresher Course) এবং স্পেশ্যাল ট্রাইব্যাল (Special Tribal Course) এইরূপ বিশেষ ধরনের ট্রেনিং। সমাজশিক্ষা-সংগঠক-শিক্ষণ-কেন্দ্রের কর্তৃপক্ষ বার-বার সুপারিশ করছেন যে, জব্-ট্রেনিংএ আসবার পূর্বে সংগঠক-শিক্ষার্থীরা যেন ওরিয়েণ্টেশান-ট্রেনিং নিয়ে আসেন। তা হলে সংগঠক-শিক্ষার্থীরা তাদের নূতন কর্মধারার মূল উদ্দেশ্য সম্বন্ধে খানিকটা জ্ঞানলাভ করবে, এবং তবেই তাদের জব্-ট্রেনিং সুষ্ঠু ও সফল হতে পারবে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষণ-ব্যবস্থাতেও ওরিয়েণ্টেশান-ট্রেনিং-এর প্রয়োজন স্বীকৃত হচ্ছে।

ইংরেজী Orientation শব্দটার একটা যথাযথ বাংলা প্রতিশব্দ বাতলান কঠিন। আভিধানিক অর্থে ওরিয়েণ্টেশান বলতে বুঝায় অন্যান্য বস্তুর সম্পর্কে কোন বিষয়কে স্পষ্টরূপে জানা (To know one's position in relation to other things.)। কিন্তু এটা

হচ্ছে ভাবানুবাদ। সরল কথানুবাদে (literal translation) শব্দটার মানে পূর্বদিক-নির্ণয়করণ। পূর্বদ্দিক ঠিক করতে পারলে অন্য তিনদিক ঠিক করতে আর কতক্ষণ!

ওরিয়েণ্টেশান না হলে অর্থাৎ দিক হারিয়ে ফেললে, কত রকমের হয়রানি হয়, তারই একটা উদাহরণ দিচ্ছি। অন্ধকার রাত্রি, মেঘাবৃত আকাশ। নিজ গ্রামের অনতিদূরবর্তী পরিচিত পথ হারিয়ে, সারারাত শিকারীকে ঘুরে ঘুরে হয়রান হতে হল। মেঘাচ্ছন্ন আকাশে তারা দেখা না যাওয়াতেই এই বিভ্রাট। বনের শিকারী আর নৌকার মাঝি আকাশের তারা দেখে রাত্রিবেলা দিক ঠিক করে। এক্ষেত্রে ওরিয়েণ্টেশান হয় নি। ভোরের আলোতে শিকারী আবিষ্কার করল যে, সে সারারাত তার গাঁয়ের কাছেই এ-দিক সে-দিক ঘুরে মরেছে।

ওরিয়েণ্টেশান শব্দটির সরল কথানুবাদ থেকেই তার গভীরতর তাৎপর্য বুঝতে পারা যায়। সেই পথহারা শিকারী বা দিক্‌হারা নাবিক যেমন পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ দিক নির্ণয় করে নিজের অবস্থিতি স্থির করে, তেমনি শিক্ষার্থীরা তাদের জ্ঞাতব্য বিষয়টিকে ভালভাবে জানতে সমর্থ হয় অপরাপর বিষয়ের সঙ্গে তার সম্পর্কের ভিতর দিয়ে। পৃথক পৃথক ভাবে কোন বিষয় আয়ত্ত করার প্রয়াসকে ওরিয়েণ্টেশান বলা ঠিক নয়। আরও বিশদভাবে বলা যেতে পারে যে প্রাকৃতিক পরিবেশ, সামাজিক পরিস্থিতি এবং মানুষের শ্রেষ্ঠ চিন্তা-সম্পদের সহিত শিক্ষার্থীর পরিচিতিরই আর এক নাম ওরিয়েণ্টেশান। শিক্ষণীয় বিষয় এবং শিক্ষার্থীর পারস্পরিক সংযোগ তখনই সুন্দর ও সার্থক হয়, যখন যে বস্তু বা বিষয় ঠিক যেভাবে আমাদের ব্যবহারে লাগে ঠিক সেই ভাবেই তা শেখা যায়, বা শেখান হয়।

ওরিয়েণ্টেশান কি এবং কোন্ উপায়ে লভ্য? এই জিজ্ঞাসার মধ্যে নিহিত আছে আর একটি মামুলী প্রশ্ন : কিরূপ ব্যক্তিকে সমাজ

আদর্শশিক্ষক বলে মনে করে? আদর্শশিক্ষক কে? 'বড় যদি হতে চাও ছোট হও তবে'—কবির এই উক্তিটি নেহাত অর্থহীন নয়। শিক্ষক হবেন সহৃদয় ও সজ্জন ব্যক্তি, অমায়িকতা হবে তাঁর চরিত্রের বিশেষ গুণ। সর্ববিদ্যা-পারঙ্গম না হলেও প্রায় সর্ব-বিষয়েই তিনি হবেন মোটামুটি ওয়াকিবহাল। দরদী সমাজ-বন্ধুকেই আমরা শিক্ষকরূপে দেখতে চাই। এতগুলি দুর্লভ উপাদানের সমাবেশেই আদর্শশিক্ষক-চরিত্রের গঠন। শিক্ষকের নিকট সমাজের অপরিমিত প্রত্যাশা। উকিল, ডাক্তার, ব্যবসায়ী, প্রশাসক, বিচারক, মন্ত্রী ও অপরাপর বৃত্তিধারিগণ দু'হাতে সমাজের সম্পদ গ্রহণ করেন। সমাজের কর্তৃত্বও তাঁদেরি হাতে। কিন্তু তাঁদের নিকট সমাজের প্রত্যাশা অনেক কম। দুর্নীতি-পরায়ণ ব্যবসায়ী, দুশ্চরিত্র প্রশাসক বা অসামাজিক বিচারক—সমাজ এঁদের বিনা দ্বিধায় প্রশ্রয় দিচ্ছে। কিন্তু অনুরূপ শিক্ষককে সমাজ সহ্য করতে নারাজ, কেননা, শিক্ষকের চরিত্র, আচরণ ও প্রভাবের উপরেই সমাজের কল্যাণ বহুলাংশে নির্ভর করছে। পক্ষান্তরে সমাজের নিকট শিক্ষকের প্রত্যাশা অতি সামান্য। একজন বিবেকহীন ধূর্ত উকিল অর্থ সম্পদে স্ফীত হয়ে উঠলে সমাজ তাঁকে নির্বিচারে নেতৃত্বের আসনে বসায়, কিন্তু তাঁরই প্রতিবেশী কর্তব্যনিষ্ঠ শিক্ষককে সমাজ সেই সম্মান ও প্রতিপত্তি দেয় না, কারণ শিক্ষক দরিদ্র। আমরা প্রতিদিন দেখতে পাই ছায়াছবির সুদর্শন অভিনেতা বা ছলাকলাময়ী রূপসী অভিনেত্রী কি-পরিমাণ বিত্ত ও বিজ্ঞপ্তি লাভ করছেন। সমাজ সানন্দে যে প্রাধান্য এদের দিচ্ছে, বা এদের নিয়ে যে অশোভনীয় মাতামাতি চলছে, তার শতাংশের একাংশও অনাদৃত শিক্ষকের ভাগ্যে জুটবে কি? অবশ্য, এটা শিক্ষকের দুর্ভাগ্য নয়। শিক্ষকের মান ও মূল্য আর ছায়াছবির অভিনেতার চেহারার বিজ্ঞাপন ঠিক একই তৌলে পরিমেয় নয়। রাজনীতি আর অভিনয়-মঞ্চের ডামাডোলের বাইরে, ঐশ্বর্য ও অর্থ-সম্পদহীন অখ্যাত

শিক্ষকের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার মূল্যের পরিমাপ হয় সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের মানদণ্ডে। সেই মূল্য ও মর্যাদা-লাভের উপায়টিও ভিন্ন।

যে জ্ঞান, যে শিক্ষণ ও যে অভিজ্ঞতা লাভ করে শিক্ষক সত্যিকারের সমাজ-সংগঠক এবং জাতীয় জীবনের প্রতিষ্ঠাতা হওয়ার গৌরব অর্জন করতে পারেন, সংক্ষেপে তাকে লিবারেল এডুকেশন (Liberal Education) আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। বিগত উনিশ শতকে পাশ্চাত্যের শিক্ষাবিদ্‌গণ লিবারেল এডুকেশন-এর গুণগ্রাহী ছিলেন। ক্রমশঃ বিজ্ঞান ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার কদর বেড়ে যাওয়াতেই সাধারণ শিক্ষার, নামান্তরে লিবারেল এডুকেশনের গুরুত্ব হ্রাস পায়।

বৈজ্ঞানিক ও চিকিৎসকের মত শিক্ষাবৃত্তিজীবিগণও বিশেষজ্ঞ হয়ে পড়েন। যার যার নির্দিষ্ট বিষয়ের সীমানার মধ্যেই তার পঠন-পাঠন সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ল। শিক্ষক-শিক্ষণ বিদ্যালয়গুলিও বিশেষজ্ঞ-তৈয়ারির কাজে অগ্রণী হয়ে উঠল। যে সাধারণ উদারনৈতিক শিক্ষার প্রভাবে মানুষের ব্যক্তিগত চরিত্রের উৎকর্ষ সাধিত হয় এবং সামাজিক চেতনার বিকাশ হয়, তার প্রতি যেন শিক্ষাবিদ্ ও শিক্ষক-শিক্ষণ-প্রতিষ্ঠানগুলির একটা ঔদাসীন্য এবং বিরূপতার ভাব দেখা গেল। অতিমাত্রায় বিশেষজ্ঞতা বা বৃত্তিকৌশল-অর্জনের প্রয়াস শিক্ষকতাকে আর দশটা সাধারণ পেশার পর্যায়ভুক্ত করে তুলল। শিক্ষক-শিক্ষণ-বিদ্যালয়ে শিক্ষানবীশগণ কোন একটা বিশেষ ধরনের পারদর্শিতা-অর্জনে আত্মনিয়োগ করলেন। কিন্তু একাধিক বৎসরের ট্রেনিং-সমাপ্তির পরেও দেখা গেল, শিক্ষক তাঁর ছাত্র-সম্বন্ধীয় তাত্ত্বিক (theoretical) বা বাস্তব (practical) জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিশেষ লাভ করেন নাই। শিক্ষকতা ব্রতের যে দুটো বড় জিনিস—শিক্ষকের চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের বিকাশ এবং সাহিত্য, শিল্পকলা, ইতিহাস ও বিজ্ঞানের ভিতর দিয়ে মানুষের উচ্চ চিন্তাধারার অভিব্যক্তির পরিচয়-লাভ—সে দুটো জিনিসেরই অভাব থেকে গেল। মানুষের মহতী চিন্তাধারার সহিত

সম্যক্ পরিচয়েরই আর এক নাম শিক্ষা বা সংস্কৃতি। আর শুধু পরিচয়মাত্রই নয়, সেই পরিচয়ের সূত্রেই আদর্শশিক্ষক-চরিত্রের পরিস্ফুরণ হয়। ক্রেন ব্রিণ্টন (Crane Brinton)-নামধেয় পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাবিদ্ তৎপ্রণীত 'Ideas and Men'-নামক গ্রন্থে দর্শন, ধর্মশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র, ইতিহাস, সাহিত্য ও বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ের অনুশীলনের মাধ্যমে ওরিয়েণ্টেশান-শিক্ষণের বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছেন। এই প্রসঙ্গে একটা সাবধান-বাণীও তিনি উচ্চারণ করেছেন। সামনে একখানা মানচিত্র খুলে বসে তার অসংখ্য নাম আর সঙ্কেতের জটিল গহনে নিজেকে হারিয়ে ফেলার পক্ষপাতী তিনি নন। তাঁর মূলবক্তব্য এই যে, সাধারণ উদারনৈতিক শিক্ষা হচ্ছে অনেকটা মানচিত্রের সাহায্যে ভূ-খণ্ডের আকৃতি-প্রকৃতি, বিস্তার ও বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে একটা সঠিক ধারণা-জন্মানর মত। সাধারণ শিক্ষার যে-কয়েকটি উদ্দেশ্য সর্বজনীন স্বীকৃতি লাভ করেছে, এই প্রসঙ্গে তা উল্লেখযোগ্য :

(ক) সম্বন্ধনির্ণয় (Orientation);

(খ) সংস্কার-মোচন (Emancipation);

(গ) দায়-দায়িত্ব-স্বীকার (Dedication);

(ঘ) আত্ম-উপলব্ধি (Self-realisation);

(ঙ) ভাবপ্রকাশের ক্ষমতা (Competency in communication)।

ওরিয়েণ্টেশান বা সম্বন্ধনির্ণয় সম্পর্কে কিছু আলোচনা প্রবন্ধের প্রথমেই করা হয়েছে। এ বিষয়ে আরও দু'-চারটি কথা বলা যেতে পারে। দৃশ্যমান বহির্জগতের সঙ্গে শিক্ষার্থীর সম্বন্ধ-নির্ণয় ওরিয়েণ্টেশান ট্রেনিং-এর প্রথম ধাপ। বিশ্ব-পরিস্থিতিতে মানুষের স্থান ওরিয়েণ্টেশান-ট্রেনিং-এর একটা বড় কথা। শক্তিশালী অণুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে ক্ষুদ্রতম অণু এবং নিখিল বিশ্বের (Microcosm and Macrocosm) যে রূপটি প্রত্যক্ষ করি,

তারই নাম Orientation to the Physical World—দৃশ্যমান বহির্জগতের সহিত শিক্ষার্থীর সম্বন্ধ। পরিবর্তনশীল জগতে নিত্য নব রূপায়ণ, ভূপৃষ্ঠের আবর্তন-বিবর্তন, মহাশূন্যের রহস্য—সব কিছুর সঙ্গেই মানুষের সম্বন্ধ রয়েছে। সেই সম্বন্ধ-নির্ণয়ের আশু প্রয়োজন অস্বীকার করা যায় কি?

ঊর্ধ্বলোকের জ্যোতিষ্কমণ্ডলী আর পরমাণুর পরমাশ্চর্য রহস্য উভয়ই মানুষের দৃষ্টিভঙ্গীকে সম্প্রসারিত করে, মনের সঙ্কীর্ণতা দূর করে এবং নূতন উপলব্ধি ও অনুভূতি জাগিয়ে তোলে। দৃশ্যমান ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের সহিত পরিচয় ভিন্ন ওরিয়েন্টেশানের গোড়াপত্তন হয় না।

সামাজিক পরিবেশে মানুষের স্থান ওরিয়েন্টেশান-ট্রেনিং-এর আর একটি বিশেষ দিক। ইতিহাস ও ঐতিহ্য, সমাজবিদ্যা ও তার বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা, যথা—সাহিত্য, শিল্প ও সঙ্গীত ইত্যাদির সহিত পরিচয় ছাড়া মানুষের জ্ঞান সম্পূর্ণ হতে পারে না এবং সমাজ-জীবনের মূলসূত্রটি আবিষ্কার করা সম্ভব নয়। ঐতিহাসিক সিসেরোর (Cicero) মতে জন্মপূর্ব ঘটনা সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকা চিরকাল অবোধ শিশু হয়ে থাকার সামিল। যে-কোন প্রকৃত শিক্ষিত ব্যক্তির পক্ষেই মানুষের যুগ-যুগান্তের সাধনার শ্রেষ্ঠ ফলস্বরূপ মহতী চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হওয়া অপরিহার্য। মানুষের বিপুল জ্ঞানসম্ভার আয়ত্ত করা যে-কোন একজন ব্যক্তির পক্ষেই দুঃসাধ্য। কিন্তু জ্ঞান-সমুদ্র পাড়ি দেওয়ার কথা হচ্ছে না। এ যেন আলোক-স্তম্ভের সাহায্যে বিপথগামী না হওয়া। সামাজিক পরিবেশের সহিত সাযুজ্যের ফলে পরমতসহিষ্ণুতা, ধীর বিচারবুদ্ধি এবং চিন্তায় ও কর্মে সঙ্গতি ও সমতা ইত্যাদি গুণরাশির বিকাশ ঘটে। জেনারেল এডুকেশনের ইহাই প্রকৃত সংজ্ঞা। তাই জেনারেল এডুকেশন শুধু শিক্ষাব্রতীরই প্রয়োজন নয়, সমাজের প্রতিটি নাগরিকের জন্যই চাই জেনারেল এডুকেশন। যে-কোন বৃত্তিধারীর পক্ষেই তা

অপরিহার্য। ইঞ্জিনীয়ার, ডাক্তার, উকিল, ব্যবসায়ী, শিল্পপতি—যিনিই হোন্ না কেন—সকলেই সর্বাগ্রে সমাজের নাগরিক। অন্য সব দায়িত্বের উপরেই মানুষের সামাজিক দায়িত্ব।

উদারপন্থী সাধারণ শিক্ষার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য চিত্তের প্রসার ও অজ্ঞতা, ভয়, বিদ্বেষ, কুসংস্কার ইত্যাদির বন্ধন হতে মানব-মনের মুক্তি-সাধন ঃ

> "চিত্ত যেথা ভয়শূন্য উচ্চ যেথা শির,
> জ্ঞান যেথা মুক্ত, যেথা গৃহের প্রাচীর
> আপন প্রাঙ্গণ-তলে দিবস-শর্বরী
> বসুধারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি।"

মনের এই উদার, ভয়লেশহীন মুক্ত অবস্থার সৃষ্টি হয়, উদারপন্থী শিক্ষার সাহায্যে। কলেজে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা যখন আসে, তাদের অনেকেই তখন কতকগুলি অন্ধ সংস্কার সঙ্গে নিয়ে আসে। এই সংস্কারগুলি কখনও সামাজিক, কখনও বা ধর্মসংক্রান্ত, আবার কখনও জাতি-বিদ্বেষ-প্রসূত এবং প্রায়শঃই প্রাদেশিক। সঙ্কীর্ণ ধর্মবিশ্বাস এতই বদ্ধমূল হয়ে থাকে যে তাকে অতিক্রম করে প্রমাণসিদ্ধ সত্যকে উপলব্ধি করাও অসম্ভব। রুশো বলেছিলেন ঃ "Man is born free, but everywhere he is in chains." যুক্তিহীন সংস্কারের কঠিন বন্ধন হতে শিক্ষার্থীর মন আংশিকভাবে ছাড়া পেলেও শিক্ষান্তে সংসারে প্রবেশের প্রাক্কালে নানা অজ্ঞতা ও অযৌক্তিকতার বোঝার লাঘব বড় একটা হয় না। মানুষে মানুষে পারস্পরিক সম্পর্কের প্রতি অস্বচ্ছ ঘোলাটে দৃষ্টিভঙ্গী এবং প্রচলিত প্রথার প্রতি নির্বিচার আনুগত্য এতই প্রবল থাকে যে কোন নূতন ভাব ও চিন্তা গ্রহণ করা দূরে থাকুক অনুধাবন করা পর্যন্ত অসম্ভব হয়।

ইতিহাস, প্রকৃতি-বিজ্ঞান, মনস্তত্ত্ব, দর্শন ও সমাজবিদ্যা-অনুশীলনের মধ্য দিয়া মনের বন্ধনদশা ঘোচান সম্ভব। উদারপন্থী শিক্ষার এ একটা খুব বড় উদ্দেশ্য।

উদারনৈতিক সাধারণ শিক্ষার উদ্দেশ্যস্বরূপ যে-কয়টি বিষয় ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, তার মধ্যে দায়িত্ব-স্বীকার একটি বড় কথা। উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত সংস্কৃতি-অভিমানী অনেক ব্যক্তির মধ্যেই অনভিপ্রেত বাস্তবকে এড়িয়ে চলার প্রবণতা দেখা যায়। উচ্চ-শিক্ষা ও সংস্কৃতি মানুষকে খানিকটা দায়িত্বহীন মননশীল জীবে পরিণত করে। যে শিক্ষা বা সংস্কৃতি মানুষের আত্মবিশ্বাসের ভিত্তিকে শিথল করে দেয়, তা অসম্পূর্ণ ও অকল্যাণকর। সঙ্কট-মুহূর্তে এইরূপ শিক্ষিত ব্যক্তি যেন কোন স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পারেন না, সংশয় ও সন্দেহের দোলায় দোদুল্যমান, ভারসাম্যহীন একটা অনিশ্চিত অবস্থায় পড়ে ঘুরপাক খেতে থাকেন। এ-হেন অবস্থা ব্যষ্টি ও সমষ্টি উভয়েরই জীবনে বিড়ম্বনামাত্র।

এইরূপ শিক্ষার মারাত্মক ত্রুটি এই যে, জীবনের ও সমাজের রূঢ় সমস্যাগুলির প্রতি তা একটা নিষ্ক্রিয় নিরপেক্ষতার ভাব জাগিয়ে তোলে এবং অনিবার্যকে কাটিয়ে যাবার প্রবৃত্তিকে প্রশ্রয় দেয়। সৎ কি অসৎ, উচিত কি অনুচিত, ন্যায় কি অন্যায়—যে-কোন প্রশ্নের উভয় দিক এইরূপ মনোভাবাপন্ন ব্যক্তি বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখবেন, কিন্তু তার সম্মুখীন হতে নারাজ। নিরপেক্ষ দর্শকের ভূমিকায় এঁরা নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকেন, কখনও জীবনের প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে সক্রিয় ভূমিকায় অবতীর্ণ হন না। এঁরা জ্ঞানপাপী অর্থাৎ জেনে-শুনেও দৃঢ়তা ও প্রত্যয়ের অভাবে ন্যায় ও সত্যের মর্যাদা-রক্ষায় অগ্রসর হন না। এই শ্রেণীর নিষ্ক্রিয়তার ফলে সমাজে অবাঞ্ছিতের দলই প্রাধান্য লাভ করে—সামাজিক প্রগতি ব্যাহত ও সংহতি শিথিল হয়ে পড়ে। 'অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে'—উভয়েই সমদোষে দোষী।

ধন-সম্পত্তি ও সামাজিক সুযোগ-সুবিধা ব্যক্তিগত সুখ ও সম্ভোগের জন্য নয়; সমষ্টির সুখেই ব্যক্তির সুখ, সমষ্টির কল্যাণেই ব্যক্তির কল্যাণ—এই আদর্শের যথার্থ পরিপোষণ ও পরিস্ফুরণেই উদারনৈতিক সাধারণ শিক্ষার সাফল্য ও সার্থকতা।

আত্মানুসন্ধান বা আত্মবিশ্লেষণ জিনিসটার গুরুত্বও অবহেলা করার নয়। উদারনৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত মন অন্যের ছিদ্রানুসন্ধান ও দোষ-ক্রটি উদ্‌ঘাটন করতে সঙ্কুচিত হয়। প্রকৃত শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রভাবে মানুষ নিজের দিকটায় তাকাতে শেখে। অন্যের বিরূপ সমালোচনার পূর্বে আত্মসমালোচনার দ্বারা চিত্তশুদ্ধির প্রয়োজন।

শেষ কথা, লব্ধ জ্ঞান ও অর্জিত অভিজ্ঞতাকে মনোজ্ঞ প্রকাশ-ভঙ্গীতে দশজনের হিতার্থে বিতরণ করার শক্তি-সৃষ্টিও উদারনৈতিক শিক্ষারই ফলশ্রুতি। কৃপণের গুপ্ত সঞ্চিত ধনের মতই রুদ্ধদ্বার জ্ঞান-ভাণ্ডার মানুষের কোন কাজেই আসে না। প্রকৃত শিক্ষা মানুষকে আত্মকেন্দ্রিকতার সঙ্কীর্ণতা হতে বিশ্বকেন্দ্রিকতার উদারক্ষেত্রে মুক্তি দেয়। শিক্ষার প্রসাদেই সংস্কারের শত বন্ধন থেকে মানুষের মন মুক্তি লাভ করে।

শিক্ষা সৃজনধর্মী

শিক্ষা সৃজনধর্মী। শিক্ষার প্রকৃত স্বরূপ—মানুষের সহজাত শক্তির সম্যক্ বিকাশ-সাধন—নব নব ক্ষেত্রে নব নব সৃজনে মানুষের শক্তির উদ্বোধন। সৃজনধর্মী শিক্ষা নিয়ে গত শতাব্দী হতেই শুরু হয়েছে আন্দোলন। শিক্ষককে স্রষ্টা হতে হবে এবং শিক্ষণকে সৃজনমুখী করে তুলতে হবে, এই হল সংক্ষেপে এই আন্দোলনের প্রধান শ্লোগ্যান।

শিক্ষাক্ষেত্রে 'সৃজন' এই কথাটা নিয়েও খানিকটা মতদ্বৈধ দেখা দিয়েছে। আভিধানিক অর্থে 'সৃজনের' সংজ্ঞা দ্বিবিধ :

(১) কোন কিছু তৈরি করাই নামান্তরে সৃজন—তা ভালো-মন্দ, উত্তম-অধম, সৎ-অসৎ যা-ই হোক না কেন। দ্বিতীয় অর্থ—

(২) শুভঙ্করী সৃষ্টি।

প্রথমোক্ত সংজ্ঞাটি নেহাত অভিধানগত—শিক্ষাক্ষেত্রে এর প্রয়োগ অচল। দ্বিতীয় সংজ্ঞাটিই গ্রহণ-যোগ্য এবং সর্বজনগ্রাহ্য।

অধিকাংশ শিক্ষাবিদের মতে শিল্প, সঙ্গীত, ভাস্কর্য, স্থাপত্য, বিজ্ঞান এবং এ-জাতীয় সমস্ত বিষয় সৃজনানুকূল ও শিক্ষণীয় বিষয়। চিত্রশিল্পী নূতন চিত্র এঁকে নূতন সৌন্দর্যের সৃষ্টি করছেন, ভাস্কর পাথর খোদাই করে নূতন মূর্তি গড়ছেন, সুরকার নব নব সুরঝঙ্কার সৃষ্টি করছেন, বৈজ্ঞানিকের নূতন আবিষ্কার মানুষকে নূতন সম্পদ-সমৃদ্ধির সন্ধান দিচ্ছে। সুতরাং এঁরাই হচ্ছেন সৃজনকারী। জাতীয় ঐতিহ্যের সঞ্চয়ে এঁদের অবদান সর্বজনস্বীকৃত। আবার শিল্প-স্থাপত্য-ভাস্কর্য-সুরসৃষ্টি ইত্যাদির ভিতর দিয়েই মানুষের সহজাত ক্ষমতারও স্ফুরণ হচ্ছে। সে দিক দিয়েও এ-বিষয়গুলির শিক্ষণ-অনুশীলন সৃজনাত্মক। কিন্তু এই কি সব? নূতন সৃজনের সম্ভাবনা কি শুধু এই-কয়টি নির্দিষ্ট বিষয়ের গণ্ডির মধ্যেই সীমাবদ্ধ? মতান্তরে, এবং সেই মতের গুরুত্বও উপেক্ষণীয় নয়; যাঁরা দার্শনিক, যাঁরা কবি,

এমন কি যাঁরা ব্যবসায়ী, যাঁরা শাসক, তাঁরাও কোন-না-কোন প্রকারে নূতন সৃষ্টি দ্বারা মানুষের মানস-পুষ্টি অথবা সামাজিক প্রগতির সহায়তা করছেন। সুতরাং তাঁরাও সৃজক। এতদিন অবধি সৃজনধর্মী শিক্ষক ও শিক্ষণের কথাই শোনা যেত। সৃজনধর্মী শিক্ষার পুরোপুরি দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল শিক্ষকের উপর। শিক্ষণ-পদ্ধতিকে ধরে নেওয়া হত সৃজনকারী শিক্ষার মাধ্যম বা বাহন। যে শিক্ষার্থী, তারও যে কিছু করণীয় আছে—সে কথাটা যেন ছিল নেহাতই গৌণ। আধুনিক শিক্ষা-বিচিন্তায় একটা পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। সৃজনাত্মক শিক্ষণের পরিবর্তে সৃজনাত্মক শিক্ষার কথাও ভাবা হচ্ছে। যিনি শিক্ষা দান করছেন তাঁর একার দায়িত্বই সবটা নয়, যে শিক্ষা গ্রহণ করছে তারও দায়িত্ব আছে—এবং যথেষ্ট পরিমাণেই। অর্থবিহীন, বাস্তব জীবনের সহিত সম্পর্ক-শূন্য কতকগুলি তথ্য বা সংবাদ-সংগ্রহ প্রকৃত শিক্ষা নহে। এমন বহু তথাকথিত শিক্ষিত ও শিক্ষাভিমানী ব্যক্তি আছেন, যাঁদের তথ্যের ঝুলি অপরিমিত ভারী। বহু বইয়ের নাম, বহু লেখকের নাম-ধাম, বহু ঘটনা-পঞ্জী, বহুবিধ সংবাদ-সমাচার এঁদের নখ-দর্পণে। কিন্তু এঁরাই কি প্রকৃত জ্ঞানী? আদৌ নন। প্রকৃত জ্ঞান অভিজ্ঞতা-সঞ্জাত এবং বাস্তবের সহিত সম্বন্ধযুক্ত। এইরূপ নয় বলেই বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু কৃতী স্নাতক আক্ষেপোক্তি করেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে অধীত বিষয়গুলি এবং তৎ-লব্ধ তথ্য বা জ্ঞান পরবর্তী জীবনে বড় একটা কাজে লাগে না। অভিযোগটি সর্বৈব সত্য এবং তার কারণ এই যে এ-দেশে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে সৃজনাত্মক শিক্ষার বিশেষ কোন মর্যাদা নাই। গতানুগতিকের গণ্ডি অতিক্রম করে নূতন সৃজনধর্মী পথে শিক্ষার ধারাকে প্রবাহিত করার দুঃসাধ্য ব্রত কে গ্রহণ করবে? বিশ্ববিদ্যালয়ে কি শিখলাম, তারই উপর সবটা গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে। কি করে শিখলাম তার উপর বিশেষ কোন গুরুত্বই দেওয়া হচ্ছে না। স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, সৃজনধর্মী শিক্ষার দিকে কোন নজর

দেওয়া হয়নি এবং অর্জিত বিদ্যা অনেকটাই হয়েছে কৃত্রিম ও যন্ত্রচালিতবৎ—জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতার সহিত যোগাযোগ-বিহীন।

কি শিক্ষা-দাতা, কি শিক্ষা-গ্রহীতা—উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গীই যেন নেতিবাচক। ধরে নেওয়া হচ্ছে কতকগুলি বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করার নামান্তরই শিক্ষা। আগাগোড়াই শিক্ষার্থী এই মনোভাবের বশবর্তী হয়ে শিক্ষার বিভিন্ন স্তর উত্তীর্ণ হবার প্রয়াস করছে, আর শিক্ষক তাকে সে প্রতিবন্ধক অতিক্রমণে সহায়তা করছেন। এই ধারণা বদ্ধমূল হয়ে রয়েছে শিক্ষার্থীর মনে, ফলে শিক্ষাগ্রহণ-ব্যাপারটি তার পক্ষে একটা আতঙ্ক ও পরাজয়-সুলভ অভিজ্ঞতায় পর্যবসিত হচ্ছে। এই ভ্রমাত্মক মনোভাবের নিরসন আবশ্যক।

অভিজ্ঞতাই জ্ঞান এবং জ্ঞান-সঞ্চয়ই শিক্ষা। একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মানুষের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান-আহরণ ও বিতরণের প্রয়াসকেই বলা হয় শিক্ষা। অজ্ঞাত অথবা আংশিক জ্ঞাত হাজার হাজার বছর ধরে মানুষ পৃথিবীর বুকে বিচরণ করছে। তীব্র শীত, প্রচণ্ড উত্তাপ, দাবানল, দিগন্তপ্লাবী বন্যা, ভূকম্পন, দুর্ভিক্ষ, মড়ক ইত্যাদি কতো নৈসর্গিক উপপ্লব, খেয়ালী প্রকৃতির কতো বিচিত্র পরিবর্তনের ভিতর দিয়েই না মানুষকে তার যাত্রাপথে অগ্রসর হতে হয়েছে। আজকের মানুষের সামুদায়িক জ্ঞান সেই যুগ-যুগান্তের অর্জিত অভিজ্ঞতার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। স্বল্পস্থায়ী জৈব জীবনের সঙ্কীর্ণ পরিধির মধ্যে প্রকৃতির অনন্ত লীলার রহস্য-সন্ধানেরই আর এক নাম শিক্ষা। মানুষের সম্মুখে প্রকৃতির অনন্ত জিজ্ঞাসা। পদে পদে মানুষের ভুল, আর ভুল-সংশোধনের নিরন্তর চেষ্টা। ভুল আর ভুল-সংশোধনই মানুষের অভিজ্ঞতার সম্পদ। শিক্ষা-সাধনায় চাই সপ্রশ্ন কৌতূহলী মন। শিক্ষা-সাধনার সুদীর্ঘ পথে চলমান পথিকের পঞ্চেন্দ্রিয়, অনুভূতি ও কল্পনা সদাজাগ্রত, সদা-উন্মুক্ত থাকা চাই।

শিক্ষার্থীর আত্মজিজ্ঞাসাই শিক্ষার্থীর অনুপ্রেরণা। কি ও কেন —এই প্রশ্নই সতত শিক্ষার্থীর মনকে জ্ঞানমুখী করে রাখে। তোতা-

তদানীন্তন বিখ্যাত রাজনৈতিক নেতা উইলিয়ম ইওয়ার্ট গ্ল্যাডস্টোন নির্বাচনী প্রচারে একটি শ্লোগ্যান ব্যবহার করেছিলেন: "Educate your Masters"—তোমাদের প্রভুদের শিক্ষিত কর। প্রভু অর্থাৎ নির্বাচক-মণ্ডলী। ব্যঙ্গচ্ছলে বলা হয় যে ইংলণ্ডের জনগণ প্রতি পাঁচ বছরে একবার মাত্র স্বাধীনতা অর্জন করে: "The people of England are free once in five years"—এই ব্যঙ্গোক্তির পিছনে যে রূঢ় সত্য প্রচ্ছন্ন রয়েছে সেটা হচ্ছে এই যে, সত্যিকারের সর্বজনীন শিক্ষা ও সমাজচেতনা ছাড়া গণতন্ত্র সার্থক হতে পারে না। পাঁচ বৎসর অন্তর একবারমাত্র সাধারণ নির্বাচনে ভোটদান করেই জনসাধারণ যদি মনে করে যে নাগরিক হিসাবে তাদের কর্তব্য যথাযথ পালিত হয়েছে, আর তাদের কিছু করণীয় নেই, তবে সে-অবস্থাটা রাজনৈতিক আত্মাবলুপ্তিরই সামিল। "Constant vigilance is the price of liberty"—সদা-জাগ্রত অবস্থাই স্বাধীনতার মূল্য, আর শিক্ষাই সেই জাগৃতির সোনার কাঠি।

রাজনৈতিক তাগিদ ছাড়াও সর্বজনীন শিক্ষার অপরিহার্যতা আজ সর্বজন-স্বীকৃত। জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসাদে আজ প্রকৃতির মণি-মঞ্জুষার চাবিকাঠি মানুষের করায়ত্ত। পার্থিব ও ব্যবহারিক জীবনে আজ অপরিমেয় সমৃদ্ধি ও সম্পদের অধিকারী মানুষ। মানস ও মনীষার ক্ষেত্রে মানুষের অগ্রগতি হয়েছে আসামান্য। কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে, এই বিপুল বৈভবের মধ্যেও সাধারণ মানুষের (the common man) জীবন চরম দৈন্য ও নিঃস্বতায় বিড়ম্বিত। ইউনেস্কো (UNESCO) বা বিশ্বসংস্কৃতি-সংসদের হিসাবে বিশ্বের দুই-তৃতীয়াংশ লোক আজও পর্যন্ত শিক্ষার সুযোগলাভে বঞ্চিত, আর জগতের জনসংখ্যার তিন-চতুর্থাংশই অর্ধাশন, অনশন ও দারিদ্র্য-নিপীড়িত। সাধারণ মানুষের জীবনের মানোন্নয়ন আজ জগতের, বিশেষ করে তথাকথিত অনগ্রসর অঞ্চলসমূহের প্রধান সমস্যা।

শিক্ষাই মানুষের ভাগ্য-পরিবর্তনের প্রধান উপায়। শিক্ষাই নতুন পথের নির্দেশক। ভারতবর্ষের বর্তমান পরিস্থিতিতে এই কথাটার গুরুত্ব বিশেষভাবে বিবেচ্য। আজ দেশময় এক বিরাট্ গঠনমূলক বিপ্লব অনুষ্ঠিত হচ্ছে। রাষ্ট্রীয় অধিকার, সামাজিক সাম্য, আর্থিক ও বৈষয়িক অবস্থার উন্নয়ন, শিক্ষাসংস্কৃতির উৎকর্ষ ইত্যাদি জাতীয় জীবনের নানা দিকেই নূতন সৃষ্টির বিপুল প্রয়াস চলেছে। জাতি-পুনর্গঠনের এই মহাযজ্ঞে আজ প্রত্যেক ভারতবাসীকেই যোগদান করতে হবে। চল্লিশ কোটি নরনারীর সম্মিলিত প্রচেষ্টাতেই এই মহাযজ্ঞ হবে সফল।

আজ এই নব কর্মসাধনায় সমগ্র জাতির উদ্‌বোধন চাই। 'আজ সর্বাগ্রে চাই জাতীয় চৈতন্যের উন্মেষ এবং সেইজন্যই চাই সর্বজনীন জাতীয় শিক্ষা। যেমন মাটির জমিন তেমনই মনের জমিন। আজ মাটির জমিনে বেশী ফলনের উদ্যম চলেছে। মাটির জমিনে বেশী ফসল তখনই ফলবে, যখন মনের জমিনের হবে সম্যক্ পরিচর্যা—আর তারই নামান্তর হচ্ছে শিক্ষা।'

যে-কোন পূর্ণাঙ্গ ও সর্বার্থক জাতীয় শিক্ষা-পরিকল্পনাতেই শৈশব হতে শুরু করে আজীবন নানা ক্ষেত্র ও পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুতির ব্যবস্থা থাকে। ভারতের জাতীয় শিক্ষা-পরিকল্পনাও সেইরূপ একটি সুচিন্তিত সর্বার্থক পরিকল্পনা। সংক্ষেপে এই ব্যাপক পরিকল্পনার পরিচয়ঃ

(ক) শিশু-শিক্ষা বা নার্সারি এডুকেশন ঃ খেলাধূলা ও আনন্দের মাধ্যমে শিশুর সহজাত বৃত্তিগুলিকে শিক্ষামুখী করে তোলা।

(খ) সর্বজনীন প্রাথমিক বা বুনিয়াদী শিক্ষা ঃ ভারতীয় সংবিধানের শর্তানুযায়ী ৬ হতে ১৪ বৎসর বয়স্ক প্রত্যেক বালক ও বালিকার জন্য যথাযোগ্য শিক্ষাব্যবস্থা। প্রাথমিক শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য—একদিকে নিরক্ষরতা-দূরীকরণ, আর অন্যদিকে শিক্ষার অনুষঙ্গে মানুষের অন্তর্নিহিত সৃজনী শক্তির পরিস্ফুরণ।

(গ) মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিক শিক্ষা: উচ্চতর শিক্ষা এবং বহুমুখী ও বৃহত্তর জীবনের নানা প্রয়োজনের জন্য প্রস্তুতি এবং দায়িত্বশীল নাগরিক জীবনের গোড়াপত্তন মাধ্যমিক শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য।

(ঘ) উচ্চশিক্ষা: যোগ্যতানুসারে ও ধনী-নির্ধন-নির্বিশেষে সকলেরই উচ্চশিক্ষা-লাভের সুযোগ। সাহিত্য, দর্শন, শিল্প, বিজ্ঞান ইত্যাদি নানা বিষয়ে উচ্চতম জ্ঞানানুশীলন দ্বারা জাতীয় শিক্ষা-সংস্কৃতি-সভ্যতার উৎকর্ষ-সাধন, এবং সমাজ ও জাতির নেতৃত্ব-গ্রহণে যোগ্যতা-অর্জন উচ্চশিক্ষা-নীতির মূল উদ্দেশ্য।

(ঙ) অন্ধ, বধির, খঞ্জ প্রভৃতি বিকলাঙ্গের জন্য বিশেষ বিশেষ ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা।

(চ) কারিগরী ও বৃত্তিমূলক নানা বিষয়ে শিক্ষা।

(ছ) চিকিৎসাশাস্ত্র, ইঞ্জিনীয়ারিং, আইন, ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রভৃতি পেশা-মূলক বিষয়ে উচ্চশিক্ষা।

(জ) শিক্ষক-শিক্ষণ বা ট্রেনিং।

(ঝ) সমাজশিক্ষা, অর্থাৎ স্কুল-কলেজের শিক্ষালাভে বঞ্চিত বৃহত্তর জনসমাজের শিক্ষা এবং স্কুল-কলেজের পরবর্তী শিক্ষানুশীলন। প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষা, গ্রন্থাগারের প্রসার, সঙ্গীত ও শিল্পকলার চর্চা, চিত্ত-বিনোদন-মূলক শিক্ষা এবং সর্বোপরি সমাজ-চেতনার উদ্বোধন—সমাজশিক্ষা-আন্দোলনের ইহাই প্রধান লক্ষ্য।

আজ পশ্চিমবঙ্গে তথা সমগ্র ভারতেই এই বহুমুখী ও সর্বব্যাপক পরিকল্পনানুযায়ী শিক্ষা প্রসার লাভ করে চলেছে। নানা অভাব ও স্বল্পতা সত্ত্বেও গত দশ বৎসরে শিক্ষার যে-অগ্রগতি হয়েছে, বিগত তুইশত বৎসরেও তা হয় নি। শিক্ষার অগ্রগতির সঙ্গে জাতির উন্নতি ও উৎকর্ষ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। কল্যাণধর্মী রাষ্ট্রের সার্থক রূপায়ণে সর্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা অপরিহার্য। আজ শিক্ষা কেবল গুটিকয়েক সৌভাগ্যবান ব্যক্তির জন্য নয়, শিক্ষা সর্বজনের।

শিশুশিক্ষার বুনিয়াদ

১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত শিক্ষাবিদ্ ফ্রয়েবেল জার্মানীতে সর্বপ্রথম তাঁর কিণ্ডার-গার্টেন স্কুল স্থাপন করেছিলেন। Kinder-garten জার্মান শব্দ, বাঙলা পরিভাষায় বলা যেতে পারে শিশু-উদ্যান,—অর্থাৎ যেখানে নানা প্রকারের খেলাধূলার মাধ্যমে শিশুর শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক ব্যক্তিত্ব পরিস্ফুরণের সুযোগ পায়। আজকাল সব প্রগতিশীল দেশেই শিশুশিক্ষার নানাবিধ ব্যবস্থা করা হচ্ছে এবং ফ্রয়েবেল-প্রবর্তিত কিণ্ডার-গার্টেন স্কুল পৃথিবীর সর্বত্রই সমাদর লাভ করেছে। অতি সংক্ষেপে কিণ্ডার-গার্টেন-পদ্ধতির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে,—অভিভাবকের সহযোগিতায় শিশু-প্রকৃতির সম্যক্ অনুধাবন এবং একটা আনন্দময় পরিবেশের মাধ্যমে শিশু-ব্যক্তিত্বের সর্বাঙ্গীণ বিকাশসাধন।

মূল উদ্দেশ্যটির প্রতি লক্ষ্য রেখে কিণ্ডার-গার্টেন স্কুলের ঘর-বাড়ী, আসবাবপত্র ও সাজসরঞ্জাম প্রভৃতি এমনভাবে পরিকল্পিত এবং প্রস্তুত করা হয়, যাতে সেগুলি শিশুদেরই উপযোগী হয়। কিণ্ডার-গার্টেন স্কুলের গৃহটি হবে আড়ম্বর-বর্জিত, অথচ সুন্দর ও সুদৃশ্য। যে-সব ঘর শিশুরা ব্যবহার করবে, সেগুলি স্থানীয় জলবায়ু বা নৈসর্গিক অবস্থা অনুসারে পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর বা দক্ষিণ-মুখো হতে পারে। ঘরগুলির ভিতরে আলো ও বাতাস প্রচুরভাবে চলাফেরা করবে। শীত-প্রধান দেশগুলিতে অবশ্য যথেষ্টসংখ্যক কাচের দরজা-জানালা বসিয়ে ঘরগুলি আলোকোজ্জ্বল, অথচ কবোষ্ণ রাখাই বিধিসঙ্গত। ঘরগুলির ভিতরটা হবে উজ্জ্বল, বর্ণবৈচিত্র্যে চিত্তাকর্ষক ও আরামদায়ক।

খেলা-ঘর বা খেলা-প্রাঙ্গণের আসবাবপত্র হবে শিশুদেরই ব্যবহারোপযোগী, অর্থাৎ দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতায় হ্রস্ব ও সাদাসিদা ধরনের। শেলফ্, চেয়ার, টেবিল, টুল সব-কিছুই ঐরকমের হবে

কিন্তু এগুলির গঠন হবে মজবুত, মসৃণ আর মনোহারী। স্নান-ঘর, মুখ-ধোবার জায়গা, শোবার ঘর, মল-মূত্রাগার—সব-কিছুই শিশুদের ব্যবহারের পক্ষে সহজ করে তৈয়ারি করতে হবে। ঘরের ভিতরে শিশুদের খেলাধূলার জন্য মাথাপিছু ৩৫ বর্গফুট জায়গা আর ঘরের বাইরে ৭০ হতে ১০০ বর্গফুট জায়গা রাখা বিধেয়। ঘরের বাইরে সামনেই থাকবে ফুলের বাগান, সবুজ ঘাসে-ঢাকা পরিচ্ছন্ন প্রাঙ্গণ। অবস্থাবিশেষে, অর্থাৎ যে-সব অঞ্চলে বৃষ্টিপাত অত্যধিক পরিমাণে হয়, সে-সব জায়গায় সিমেন্ট বা পিচ-ঢালা পাকা আঙিনার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। স্কুল-ঘরটির চারদিকেই থাকবে সুন্দর ও সযত্ন-রক্ষিত ফুলের বাগান। গাছের ছায়ায় ছোট ছোট বেঞ্চ থাকবে আর গাছের ডালে ডালে ঝুলবে দোলনা, যাতে চড়ে শিশুরা দুলতে পারবে।

কিণ্ডার-গার্টেনের পরিচালিকা ও শিক্ষিকারা যে-সব ঘর ব্যবহার করবেন, সেগুলি শিশুদের ঘরগুলি হতে পৃথক হবে, যথা—আপিস-ঘর, স্টাফ-রুম, রান্নাঘর ইত্যাদি।

সাধারণতঃ আড়াই হতে ছয় বৎসর বয়সের শিশুরাই কিণ্ডার-গার্টেন স্কুলে আসে। অনধিক আধ মাইল দূরের বাড়ির শিশুদেরই কিণ্ডার-গার্টেনে ভর্তি করা হয়। বয়স অনুসারে শিশুদের কয়েকটি দলে বা গ্রুপে ভাগ করে নেওয়া হয়। কেউ কেউ আবার বিভিন্ন বয়সের শিশুদের সম্মিলিত গ্রুপই পছন্দ করেন। একজন বিশেষ-শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষিকার পক্ষে ১৫ হতে ২০ জন শিশুর তত্ত্বাবধানের ভার নেওয়া সমীচীন। শিক্ষিকাকে সাহায্য করবেন একজন সাহায্যকারিণী, যিনি কিণ্ডার-গার্টেন বা নার্সারি-শিক্ষায় বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্ত না-ও হতে পারেন। তবু বাস্তবক্ষেত্রে এ-ব্যবস্থা সব সময়ে করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। প্রায়ই একজন শিক্ষিকা কমপক্ষে ২৫ হতে ৩০টি শিশুর ভার নিতে বাধ্য হন এবং একটা নির্দিষ্ট সময়পঞ্জী অনুসারে মায়েরাই পালাক্রমে শিক্ষিকাকে সাহায্য করে থাকেন। বেতনপ্রাপ্ত সাহায্যকারিণী অনেক সময়েই পাওয়া যায় না।

দিনের কার্যক্রম নির্ধারিত হয় প্রতিটি শিশুর স্বভাব, ভাল-লাগা-না-লাগা ও সামর্থ্যের সহিত সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য রক্ষা করে। প্রতি সপ্তাহে শিক্ষিকারা একত্রে মিলিত হয়ে স্ব স্ব সাপ্তাহিক পর্যবেক্ষণের বিশ্লেষণ ও সমালোচনা করে থাকেন। এই সভায় প্রত্যেকটি শিশুর প্রয়োজন ও প্রকৃতিকে কেন্দ্র করে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা চলে এবং সেই আলোচনার ভিত্তিতেই রচিত হয় পরবর্তী সপ্তাহের কার্যক্রম।

একদিকে শিশুদের দৈহিক সামর্থ্য ও বৃদ্ধি এবং অন্যদিকে তাদের মানাসক বিকাশ—এই দুটো জিনিসের দিকে নজর রেখে কিণ্ডার-গার্টেন স্কুলে প্রচুর পরিমাণে খেলাধূলার সরঞ্জাম রাখা হয়। সেই সরঞ্জামগুলি ব্যবহার করার পক্ষে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা হয় ও যথেষ্টপরিমাণ স্থান নির্দিষ্ট থাকে।

খেলাধূলা এবং যদৃচ্ছ লাফালাফি-ঝাঁপাঝাঁপির সঙ্গে সঙ্গে সৃজনাত্মক কাজের প্রতিও নজর দেওয়া হয়। মোটামুটি একই সামর্থ্যের শিশুরা এখানে প্রথম পরস্পর মিলেমিশে কাজ করবার সুযোগ পায়। এই সুযোগ সচরাচর বাড়িতে পাওয়া দুষ্কর। তার কারণ, বাড়িতে একই বয়সের ও সমান শারীরিক সামর্থ্যের শিশুর সংখ্যা একাধিক না হওয়াই স্বাভাবিক। শিশুর বড় ভাই-বোনেরা সোদক দিয়ে তার উপযুক্ত সহচর হতে পারে না।

তৃতীয়তঃ, কিণ্ডার-গার্টেন স্কুলে শিশুদের স্বাস্থ্য-পরীক্ষার সুব্যবস্থা থাকে এবং বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের নির্দেশানুসারে স্বাস্থ্য-গঠনের পক্ষে অনুকূল যত্ন দেওয়া হয়, যেমন—দাঁত-পরীক্ষা, স্নান, ব্যক্তিগত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, ভাল অভ্যাসের অনুশীলন এবং স্বাস্থ্যপ্রদ খাদ্য ও পানীয় ইত্যাদি।

কোন একটি বিশেষ সিলেবাস বা পাঠ্যসূচী অনুসরণ করা হয় না। শিক্ষিকা শিশুর সহজাত ইচ্ছাবৃত্তির অবাধ অভিব্যক্তিকেই উৎসাহিত করেন, অথচ সেই সঙ্গে সতর্ক দৃষ্টি রাখেন, যাতে শিশুর অবাধ সঞ্চরণ উচ্ছৃঙ্খল ও এলোমেলো ছুটোছুটিতে পর্যবসিত না

হয়ে একটা সফল কার্যধারায় রূপান্তর লাভ করে। শিশুর মাকে ঘনিষ্ঠভাবে নার্সারি বা কিণ্ডার-গার্টেনের কাজে যোগদান করে শিশুর প্রকৃতি সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লাভ করবার সুযোগ দেওয়া হয়। শিক্ষিকা ও অভিভাবিকা—এই দু'য়ের মধ্যে থাকে সাহচর্য ও অন্তরঙ্গতা। নার্সারি ও কিণ্ডার-গার্টেন স্কুলের বিপক্ষে যে-যুক্তিটা প্রায়ই বড় গলায় প্রচার করা হয়ে থাকে সেটা হচ্ছে এই যে, কিণ্ডার-গার্টেন স্কুল হতে আসা শিশুরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এসে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নূতন পরিবেশ ও নিয়ম-শৃঙ্খলার সঙ্গে নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারে না। এ সম্বন্ধে এখনও বিশেষ অনুসন্ধান বা গবেষণা হয়নি। আসলে কিণ্ডার-গার্টেন স্কুলের বাধা-নিষেধহীন মুক্ত পরিবেশই এর কারণ, অথবা গতানুগতিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তথাকথিত বিধি-নিষেধেরই কোন গলদ আছে—সে-কথাটা বিশেষভাবে বিচার্য।

পাশ্চাত্ত্য দেশগুলির মত অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ডেও প্রাক্-বিদ্যালয় শিক্ষার (Pre-School Education) ব্যাপক ব্যবস্থা আছে। এই-সকল দেশে ভ্রমণ-কালে বিভিন্ন শ্রেণীর প্রাক্-বিদ্যালয় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করবার সুযোগ হয়েছিল। এই প্রতিষ্ঠানগুলি সাধারণতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ঃ

(১) ডে নার্সারি অথবা ক্রেশ (Day Nursery or Chreche) ঃ এই-সকল প্রতিষ্ঠানে মাত্র কয়েক সপ্তাহ হতে ছয়বৎসর-বয়স্ক শিশুদের নেওয়া হয়। যে-সকল মায়েরা কল-কারখানায়, দোকানে বা আপিসে কাজ করে, তাদের শিশুদের দৈনিক সাত হতে দশ ঘণ্টা ক্রেশে রেখে যত্ন করা হয়।

(২) প্লে-গ্রুপ বা প্রি-স্কুল প্লে-সেণ্টার (Play-Group or Pre-School Play-Centre) ঃ দুই হতে সাড়ে পাঁচ বৎসরের শিশুদের জন্য দৈনিক অথবা সপ্তাহের কয়েকটি নির্দিষ্ট দিনে অন্যূন এক ঘণ্টা থেকে অনূর্ধ্ব আড়াই ঘণ্টা-কাল খেলাধূলার ব্যবস্থা করাই এই শ্রেণীর প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব।

(৩) নার্সারি-কিণ্ডার-গার্টেন (Nursery-Kinder-garten): দুই বৎসর থেকে ছয় বৎসরের শিশুদের দৈনিক আড়াই হতে সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা-কাল যত্ন নেওয়া হয়।

সমগ্র অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠানগুলি এখন একটা সুনির্দিষ্ট নীতি অনুসারে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হচ্ছে। প্রত্যেক রাজ্যেই কিণ্ডার-গার্টেন ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এবং এই সংঘগুলিই কিণ্ডার-গার্টেন-আন্দোলন পরিচালনা করছেন। কেন্দ্রীয় কমনওয়েলথ গভর্ণমেণ্টও এ-বিষয়ে সজাগ ও সক্রিয়।

তাছাড়া, লেডী গাওরি ট্রাস্ট (Lady Gowrie Trust)-মারফত প্রত্যেক বড় শহরেই লেডী গাওরি চাইল্ড সেণ্টার স্থাপিত হয়েছে। এই শিশু প্রতিষ্ঠানগুলি বেশ জনপ্রিয় এবং এগুলির সুষ্ঠু তত্ত্বাবধান, পরিচালনা ও উন্নতি-সাধনের জন্য সরকার ও জনসাধারণ মুক্তহস্ত। জাতীয় শিক্ষা-ধারার অবিচ্ছেদ্য ও অবিসংবাদী অংশরূপে প্রাক্-বিদ্যালয় শিশুশিক্ষাও আজ পূর্ণ মর্যাদা লাভ করেছে।

এই আন্দোলনের পিছনে যে-মনোভাব বা দৃষ্টিভঙ্গী অনুপ্রেরণা যোগাচ্ছে, তাকে অল্প কথায় বলা যেতে পারে—"We live for the future generation"—ভবিষ্যদ্বংশীয়দের জন্যই আমাদের বেঁচে থাকা।

শিক্ষা ও অবসর

জনবিরল গ্রাম্য পথ দিয়ে হেঁটে চলেছি। অনতিদূরে একটি গ্রাম্য পাঠশালা। খড়ের চালা ও ছেঁচা বাঁশের বেড়া। পথের মোড় ঘুরতেই সমবেত শিশুকণ্ঠের উচ্চকিত কলধ্বনি শুনতে পেলাম:

"আজ আমাদের ছুটি রে ভাই,
আজ আমাদের ছুটি।
কি করি আজ ভেবে না পাই,
পথ হারিয়ে কোন্ বনে যাই,
কোন মাঠে যে ছুটে বেড়াই
সকল ছেলে জুটি।"

ছেলেরা সমস্বরে রবীন্দ্রনাথের 'ছুটির দিনে'-শীর্ষক কবিতাটি আবৃত্তি করছে। বলা বাহুল্য, পরিদর্শক মহাশয়ের উপস্থিতির সঙ্গে সঙ্গেই সেই তারস্বর স্তব্ধ হয়ে গেল।

ছাত্র-শিক্ষক উভয় পক্ষই আগন্তুকের প্রতি সম্ভ্রমসূচক তুষ্ণীভাব অবলম্বন করল। পরিদর্শক মহাশয় যথারীতি স্কুল পরিদর্শন শুরু করলেন।

যে-শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরা আবৃত্তি করছিল, পরিদর্শক মহাশয় প্রথমে সেই শ্রেণীতেই প্রবেশ করলেন এবং প্রশ্ন করলেন: "ছুটির দিনে তোমরা কে কি করবে?" ইন্‌স্পেক্টারের কাছে ভালমানুষির পরিচয় দিতে হবে—এই ইচ্ছে ছাত্র-ছাত্রীদের মনের বদ্ধমূল ধারণা। আর ভালমানুষির প্রধান লক্ষণ পড়াশুনায় মনোযোগ। তাই ছেলেমেয়েদের সবারই এক উত্তর: "আমরা পড়ব।"

কিন্তু এ কেবল ছোট ছেলেমেয়েদের উত্তরই নয়, প্রাপ্ত-বয়স্করাও ঠিক এই ধরনের জবাবই দিয়ে থাকে। ছুটির দিন কি-ভাবে কাটান যায়, সে-বিষয়ে আমরা বড় একটা ভাবি না। ছুটির

আনন্দ পুরোপুরি আমরা পাইও না। সত্যি যেন "কি করি আজ ভেবে না পাই!"

কাজ ও অবকাশ—এ-দু'য়ের সম্বন্ধে আমাদের অনেকেরই একটা ভ্রমাত্মক ধারণা আছে। কাজ জিনিসটাকে আমরা অনেকেই বাধ্যতামূলক, অপরিহার্য, সুতরাং অনভিপ্রেত বলে মনে করতে অভ্যস্ত। কাজেই এমন একটা অস্বস্তিকর অবস্থার আংশিক বিরতি অথবা পূর্ণচ্ছেদকেই আমরা অবকাশ বলে মনে করি। কর্ম ও কর্ম-বিরতি এ-দু'য়ের মধ্যবর্তী অপর কোন তৃতীয় অবস্থার কথাটা সহজে মনে পড়ে না। সেই পাঠশালার ছেলেমেয়েদের মতোই রুটিন-বাঁধা কাজের বাইরের সময়টাকে কি-ভাবে উপভোগ করা যেতে পারে, সে-বিষয়ে প্রাপ্তবয়স্করাও অজ্ঞ।

ইংরাজী 'Leisure' ও 'Rest'—এই কথা দু'টি অনেকটাই ভিন্নার্থক। বিশ্রাম কথাটা নেতিবাচক। নিরবচ্ছিন্ন কর্মের পর আসে ক্লান্তি বা অবসাদ। দেহযন্ত্রই হোক বা মনোযন্ত্রই হোক, অবসাদগ্রস্ত হলেই তা বিশ্রাম বা কর্মবিরতি চায়। কিন্তু অবকাশ কথাটা ঠিক কর্মবিরতি-জ্ঞাপক নয়। এর অর্থ কর্ম-পরিবর্তন। যে-কোন কাজই দীর্ঘকাল-ব্যাপী হলে একঘেয়ে হয়ে পড়ে। একঘেয়েমি জিনিসটা বিরক্তিরই নামান্তর। বিরক্তি-বোধকেই ভুলবশতঃ ক্লান্তি বলা হয়। আসলে ক্লান্তি বা শ্রান্তি হয়ত তখনও আসবার দেরি আছে, কিন্তু বিরক্তিবশতঃ কাজের প্রতি বিরূপতা জন্মে গিয়েছে, আর সে-কাজ করা চলে না। আমরা মনে করি, "আর না, ক্লান্ত হয়েছি, এবার বিশ্রাম প্রয়োজন, রণে ভঙ্গ দেওয়াই শ্রেয়ঃ।" একঘেয়েমি-প্রসূত বিরূপতার ভাব দূর করা খুব কঠিন নয়। কাজের পরিবর্তন দ্বারা সহজেই তা করা যেতে পারে। স্কুলের রুটিন তৈরি করার সময় এই নীতিটি পালন করা একান্তই প্রয়োজন।

রুটিনে সাহিত্য, গণিত, বিজ্ঞান, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়গুলি এমন ভাবে সন্নিবেশ করা আবশ্যক, যাতে বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে

যাওয়ার দরুণ পড়ুয়ার মনে একঘেয়েমি না আসে। সাধারণতঃ দেখা যায়, দিনের প্রথম দিকের ঘণ্টাগুলি অঙ্ক, বিজ্ঞান ও সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ের জন্যই নির্দিষ্ট রাখা হয়। ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদি বিষয়গুলি দিনের শেষভাগেই পড়ানো হয়ে থাকে। স্কুলের রুটিনের মতো আমাদের দৈনদিন কর্মসূচীও এই একই নীতি অনুসারে নির্ধারিত হলে ভাল হয়। দৈহিক মেহনত, মনঃসংযোগ-মূলক কাজ, চিত্ত-বিনোদন, বিশ্রাম ইত্যাদির সযত্ন সুবিন্যাসে দিনের কাজ আরও ভালভাবে, আরও আনন্দের মধ্যে সম্পন্ন করা যেতে পারে। যে-কোন কাজের সাফল্যের মূলেই রয়েছে আনন্দ। যে যে-কাজটিতে আনন্দ পায়, সে সেই কাজটিই ভালভাবে সম্পন্ন করে। আনন্দই কর্মের উৎস।

আবার leisure বা অবকাশ কথাটায় আসা যাক। সাধারণ অর্থে leisure বলতেই ছুটি বুঝায়। আর ছুটি মানেই (স্কুলের) কর্মবিরতি। প্রাচীন গ্রীকরা কিন্তু leisure-অর্থেই schole (বা school) কথাটি ব্যবহার করতেন। রোমের অধিবাসিগণ স্কুল শব্দটির প্রতিশব্দ হিসাবে ludas শব্দটি ব্যবহার করেন, এবং ludas শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ খেলা।

সংসারের যাবতীয় কাজকেই প্রাচীন গ্রীস-বাসীরা দুই ভাগে ভাগ করতেন : (ক) প্রয়োজনীয় ও (খ) সুন্দর। প্রথমে প্রয়োজনীয়, যেমন—ভাত-কাপড়, বাসস্থান, ক্ষেত-খামারের মেহনত আর কামারশালার কাজ ইত্যাদি।

রুজি-রোজগারের ধান্দায় ঘুরতেই হবে। কিন্তু সে-ধান্দা শেষ করে এস 'সুন্দরের' সন্ধানে। যা দেখতে ভাল লাগে, তা-ই সুন্দর। যে-কাজ করতে আনন্দ পাওয়া যায়, তা-ই সুন্দর। প্রাচীন গ্রীসবাসীর কাছে সঙ্গীত ও শরীর-চর্চামাত্রই ছিল 'সুন্দর' কাজের সামিল। এজন্যই তারা schole (স্কুল) স্থাপন করত। সেই স্কুলে নাচ-গান, বীণা ও বাঁশী-বাজান, সাঁতার-কাটা, মল্লযুদ্ধ,

মুষ্টিযুদ্ধ, দৌড়-প্রতিযোগিতা, গল্প-বলা, কবিতা-পাঠ ইত্যাদি আনন্দানুষ্ঠানের ব্যবস্থা থাকত, আর সব চাইতে বেশী গুরুত্ব আরোপ করা হ'ত বাচনভঙ্গীর উপর। তখনকার দিনে ছাপাখানার কথা তো দূরে থাক, লেখা-পড়ার চলও বড় একটা ছিল না। তাই মুখের কথার মূল্যই ছিল সব চাইতে অধিক।

আজ আমরা 'স্কুল' কথাটিকে প্রাচীন গ্রীকদের অর্থে ব্যবহার করি না। স্কুল বলতেই কাজ, আর অবকাশ বলতেই বুঝি সে-কাজ থেকে অব্যাহতি! আনন্দদায়ক হোক বা না হোক, কাজ-মাত্রই ভাল। আর, কাজ না করাটাই নিন্দনীয়। এই ধারণাই আমাদের মনের কোণে প্রচ্ছন্ন রয়েছে। সেই ধারণার বশবর্তী হয়েই পাঠশালার পড়ুয়ারা পরিদর্শকের কাছে ছুটির দিনেও নিজেদের সাফাই গাইতে চেষ্টা করে।

অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতক ইংলণ্ডে শিল্প-বিপ্লবের যুগ (Age of Industrial Revolution)। তদানীন্তন শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিতে কর্মী ও শিল্পীরা কাজের ফাঁকে অবসর খুব কমই পেত। তখনও কারখানা-আইন বিধিবদ্ধ হয় নাই। তাই প্রতি কর্মীকে দৈনিক গড়পড়তা চৌদ্দ ঘণ্টা কারখানায় বা কয়লার খনিতে মেহনত করতে হ'ত। শিল্পপতিরা বাড়তি উৎপাদনের তাগিদে মজুরদের যত পারেন খাটিয়ে নিতেন। পাদ্রী ও যাজক-সম্প্রদায়ও অবসর-সময়কে শয়তানের সময় বলে অভিহিত করতেন। প্রথম মহা-যুদ্ধের সময় যখন ইংলণ্ডে সমরোপকরণ-উৎপাদন-বৃদ্ধির একটা জোর তাগিদ দেখা গিয়েছিল, সেই সময় মানুষের কর্মশক্তি ও বিরাম—দু'য়ের পারস্পরিক সম্বন্ধ-নির্ণয়ের একটা চেষ্টা হয়। এই পরীক্ষায় যে-সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, তাতে বলা হয় যে, মানুষমাত্রেরই কর্ম-শক্তি সীমিত। নির্দিষ্ট সাধ্য ও সময়ের অতিরিক্ত কার্যভার মানুষের সেই শক্তিকে হীনবল করে দেয় এবং সেই অনুপাতে তার কার্যদক্ষতা হ্রাস পেতে থাকে। বাস্তব ক্ষেত্রে পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে

যে, উপযুক্ত পরিবেশে অপেক্ষাকৃত অল্প সময় কাজ করেও একজন কারিগর বা শিল্পী যে-পরিমাণ উৎপাদন করতে পারে, সাধ্যসীমা Fatigue-limit) অতিক্রান্ত হলে বেশী সময়ের শ্রমে সেই অনুপাতে কম উৎপাদন হতে থাকে। সময় বেশী হলেই কাজের ফলও বেশী হবে—এ অতি ভুল ধারণা। বরং উল্টো ফল হয়, কাজের উৎকর্ষ হ্রাস পায়। মরা ঘোড়াকে হাজার চাব্‌কালেও ছুটে চলে না। তাই আজকাল দৈনিক কাজ আট ঘণ্টা থেকে ছয়ে হ্রাস করবার প্রস্তাব বিবেচিত হচ্ছে।

কাজের সঙ্গে সঙ্গে একদিকে যেমন অবকাশের দরকার, তেমনি দরকার বিশ্রামের।

> "বিরাম কাজের অঙ্গ, এক সাথে গাঁথা,
> নয়নের অংশ যেন নয়নের পাতা।"

বিশ্রামকে কর্মবিহীনতা বলা যায়, কিন্তু অবকাশের সংজ্ঞা অন্যরূপ। নিছক কর্মহীনতার নাম অবকাশ নয়। এক নিদ্রা ব্যতীত সুস্থ মানুষের পরিপূর্ণ কর্মহীনতা আলস্যেরই নামান্তর। প্রকৃত পক্ষে এইরূপ অবস্থা মানুষের পক্ষে দুর্বিষহ।

অবকাশ-সময়ের সদ্ব্যবহার কিভাবে করা যায়? কিভাবে কর্মী এক ধরনের কাজ হতে ভিন্ন ধরনের কাজের ভিতর দিয়ে আনন্দ লাভ এবং কাজের উৎকর্ষ সাধন করতে পারে? এই প্রশ্নটা সাধারণ কাজের ক্ষেত্রে যেমন, শিক্ষার ক্ষেত্রেও তেমনি বিবেচনাযোগ্য।

আমরা যন্ত্র ও বিজ্ঞান-যুগের মানুষ। বিজ্ঞান মানুষের কর্ম-ক্ষেত্রের সীমা নানা দিকে প্রসারিত করেছে, এবং কর্ম ও চিন্তা এবং ভাব-ভাবনার নানা বৈচিত্র্য-সাধনাকে সফল করেছে। আবার, অন্য দিকে বিজ্ঞান মানুষকে দিয়েছে নূতন সম্পদ ও সচ্ছলতার অধিকার, অধিকতর অবকাশ-ভোগের সুযোগ। মানুষ কি-উপায়ে এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করবে?

শিক্ষার ক্ষেত্রে 'হবি' (Hobby) বা খেয়াল একটা বড় স্থান

অধিকার করে। মানুষ পেটের তাগিদে এমন অনেক কিছু কাজ করতে বাধ্য হয়, যে-কাজের সঙ্গে তার সহজাত প্রবণতার কোন সংযোগই নাই। সেই অনিচ্ছাকৃত কাজের মাধ্যমে মানুষের প্রতিভা অথবা ব্যক্তিত্বের পরিস্ফুরণ অসম্ভব। তার প্রতিভার বিকাশ তেমন কাজের ভিতর দিয়েই সম্ভব, যে-কাজের সঙ্গে তার সহজাত প্রবণতার একটা যোগ আছে। অবকাশ-সময়ের সদ্ব্যবহারের পক্ষে 'হবি'-অনুশীলন এক অতি প্রকৃষ্ট উপায়। 'হবি'-অনুশীলন তাই বলে একটা সাময়িক হুজুগ বা হালকা ধরনের খেয়ালখুশি চরিতার্থ করাই নয়। 'হবি'-অনুশীলনের পিছনেও যথেষ্ট চিন্তা, পরিকল্পনা ও মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ প্রয়োগ করতে হবে। বয়স, সামাজিক পরিবেশ ও আর্থিক সামর্থ্য অনুসারে 'হবি'রও তারতম্য বা রকমফের হওয়া অসম্ভব নয়। আমাদের শিক্ষা-পরিকল্পনায় 'হবি'-অনুশীলনের উপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। 'হবি'-চর্চার ভিতর দিয়ে বোঝা যাবে শিক্ষার্থীর প্রতিভার ধারা কোন্ দিক দিয়ে পরিচালিত করলে সর্বাধিক ফললাভ সম্ভব। নব-পরিকল্পিত শিক্ষা-ব্যবস্থায় হাতের কাজ, চিত্রাঙ্কন, নৃত্যগীত, নাটকাভিনয়, উদ্যান-রচনা, খেলাধূলা ইত্যাদি আরও অন্যবিধ 'হবি'-চর্চার মূল্য স্বীকৃতিলাভ করছে। নূতন ধরনের শিশু-শিক্ষার পাঠক্রমে এই-সকল বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এবং শিক্ষায়তনসমূহে এই-সকল বিষয়ে হাতে-কলমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থাও আছে।

ব্যাপকতর সংজ্ঞায় শিক্ষা মানুষের পূর্ণ ব্যক্তিত্ব-বিকাশের সহায়ক। এই সংজ্ঞার তাৎপর্য উপলব্ধি করলে পাঠ্য আর পাঠ্যবিষয়-বহির্ভূত (extra-curricular) বলে কোন পৃথক বস্তুর সত্তা স্বীকার করা যায় না। এক্সট্রা-কারিকুলার কথাটাই শিক্ষাক্ষেত্রে অচল। পাঠ্যবিষয়ের সম্পূরক (Co-curricular) হিসাবেই 'হবি'র মূল্য নির্ধারণ করা উচিত।

গ্রামীণ শিক্ষা

'গ্রামীণ শিক্ষা' কথাটা একেবারে নতুন না হলেও নতুন করে ভেবে দেখবার মতো। আমরা যে-যুগে বাস করছি, তাকে সংক্ষেপে বলা যায় বিজ্ঞান ও শিল্পের যুগ। উনিশ-বিশ শতকে পাশ্চাত্ত্য দেশগুলি বিজ্ঞান-বলে শিল্পের অভাবনীয় উন্নতিসাধন করেছে। শিল্পোন্নতিই বর্তমান বিশ্বসভ্যতার ভিত্তি বা মেরুদণ্ড। জগতের অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর অঞ্চলগুলিও সেই পথ অবলম্বন করেই বিশ্বপ্রতিযোগিতায় অগ্রগামী হবার জন্য সচেষ্ট হয়েছে। ভারত-রাষ্ট্রের নীতিও সেই আদর্শেই পরিচালিত হচ্ছে। আমাদের দ্বিতীয় পাঁচশালা পরিকল্পনার একটা প্রধান উদ্দেশ্যই হচ্ছে বড় ও ছোট নানা প্রকারের শিল্প গড়ে তোলা এবং ভারতবর্ষকে নানা শিল্পজাত দ্রব্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তোলা। শিল্পের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে দেশে বড় বড় শহর গড়ে উঠে। মানুষ দলে দলে গ্রাম ছেড়ে কর্মসংস্থানের খোঁজে শহরগুলিতে এসে জমায়েত হয়। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে যা ঘটেছে, এদেশেও তা ঘটছে এবং ঘটবে। এই প্রসঙ্গে আদম-সুমারির কয়েকটি তথ্য উল্লেখযোগ্য। ১৯৫১ সনের হিসাবে ভারতের মোট জনসংখ্যা পঁয়ত্রিশ কোটি আটষট্টি লক্ষেরও বেশী। এই জনসমষ্টির শতকরা ২০ জন শহরবাসী, বাকী ৮০ জনই হচ্ছে গ্রামবাসী। ভারতে মোট গ্রামের সংখ্যা পাঁচ লক্ষেরও অধিক, আর শহরের সংখ্যা মাত্র ৩০১৮, তার মধ্যে যেগুলি খুব বড়, অর্থাৎ যেগুলিকে বলা হয় নগর তা মাত্র ৭৫টি। গত দশ বৎসরে শহর ও শহর-বাসীর সংখ্যা বেড়েছে। যতোই শিল্পের প্রসার হবে, যতই নতুন নতুন কল-কারখানা গড়ে উঠবে, ততোই শহরের সংখ্যাও বাড়বে। আর সঙ্গে সঙ্গে নতুন রাস্তাঘাট-নির্মাণ, বিদ্যুৎ-শক্তি-উৎপাদন, যানবাহনের উন্নতি-সাধন ইত্যাদি গঠনমূলক কার্য-সম্প্রসারণের ফলে গ্রামাঞ্চল ও শহরের মধ্যকার ব্যবধান ক্রমশই সঙ্কুচিত হয়ে আসবে।

এখন কথা হচ্ছে এই যে, যান্ত্রিক ও শিল্প-সভ্যতার প্রসারের ফলে কি এমন একটা সময় আসবে, যখন গ্রামগুলি আর গ্রাম থাকবে না, সারা দেশটাই শহরে শহরে ভরে উঠবে, অনেকটা যেমন ঘটেছে পাশ্চাত্ত্য দেশগুলিতে? পল্লী-প্রধান ভারতীয় সভ্যতা ও সমাজ-জীবনের যে একটা বড়ো রকমের রূপান্তর ঘটছে এবং আরও যে ঘটবে, সে-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। কিন্তু এমন একটা অদূর বা সুদূর ভবিষ্যতের কল্পনা করা যায় না, যখন গ্রাম বলে কোন জিনিস থাকবে না, সারা দেশটাই হয়ে উঠবে একটা বহুবিস্তৃত শহর।

বর্তমান যান্ত্রিক সভ্যতা মানুষের জীবনে যে-নানাবিধ সমস্যার সৃষ্টি করেছে, তার মধ্যে একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হচ্ছে মানুষের বিশ্রামবিহীনতা। যন্ত্রের মতো সভ্য মানুষ আজ সর্বদাই ব্যস্ত ও কর্মচঞ্চল, নিক্তির ওজনে তার সময়ের প্রতিটি মুহূর্ত যেন পরিমিত। মানুষ আজ দিগ্বিদিকে কিসের সন্ধানে যেন ছুটে বেড়াচ্ছে। জীবন-স্রোতে আজ লেগেছে এক দুর্বার গতিবেগ। নিরুদ্বেগ মন্থরগতি পল্লীজীবনের স্থান অধিকার করেছে এক অশান্ত, অস্বাভাবিক ও উদ্বিগ্ন অবস্থা। মানুষের স্নায়ু আজ দ্রুত স্পন্দিত ও বিকারগ্রস্ত। শান্তি ও সমতার অভাব বর্তমান যান্ত্রিক সভ্যতার একটা বড়ো গলদ।

তাই আজ পাশ্চাত্ত্য দেশগুলিতে মানুষের চিন্তাভাবনার মোড় ঘুরেছে বলে মনে হয়। সদাত্রস্ত শহর-জীবনের ফাঁকে ফাঁকে স্নিগ্ধ, শান্ত পল্লী-জীবনের আরামটুকুর জন্য আজ মানুষ লালায়িত। শহরের সমৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গ্রামগুলিকে শ্রীমণ্ডিত করে তোলবার প্রয়াস চলেছে। মানুষ শহরে কাজ করে, আর গ্রামে নেয় বিশ্রাম। শহরের কল-কারখানায় তৈরী হয় শিল্পসম্ভার আর গ্রামের কৃষিক্ষেত্র যোগান দেয় কাঁচামাল।

তাই গ্রামকে একেবারে উপেক্ষা করে আমাদের নতুন সমাজ-গঠনের প্রচেষ্টা চলতে পারে না। দেশের বেশির ভাগটাই গ্রাম এবং দেশের বেশির ভাগ লোকই যখন গ্রামে থাকে এবং গ্রামেই থাকবে,

তখন আমাদের সমাজ ও দেশ-গঠনের পরিকল্পনায় গ্রাম একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করবে।

শিক্ষার কথাই ধরা যাক। এ পর্যন্ত যে-নীতিতে এবং যে-ধারায় আমাদের দেশে শিক্ষা প্রচলিত ছিল, তাকে মুখ্যতঃ শহরমুখীন শিক্ষা বললে ভুল হবে না। শহরের চাহিদা মেটাবার জন্যই এ-শিক্ষা পরিকল্পিত ও পরিচালিত হ'ত। দেশের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির অধিকাংশই ছিল শহরে। গ্রামেও যেখানে কোন স্কুল ছিল, তার সঙ্গে শহরের স্কুলের বিশেষ কোন পার্থক্য ছিল না। গ্রামের স্কুল আর শহরের স্কুল—এদের পাঠ্যবিষয়, পাঠদান এবং পাঠোদ্দেশ্য সবই ছিল এক। একই সিলেবাসের ভিত্তিতে এবং একই পরীক্ষার তাগিদে গ্রাম ও শহরের স্কুলে পঠন-পাঠন চলত এবং আজও চলছে। ফল দাঁড়াল এই যে, গ্রামে গ্রামে স্কুল হ'ল, গাঁয়ের ছেলেরা গাঁয়ে থেকেই শিক্ষার সুযোগ লাভ করল। কিন্তু শিক্ষা শেষ করে কেউ আর গ্রামে থাকতে চাইল না। কারণ, তার অর্জিত শিক্ষার মর্যাদা গ্রামে পাওয়া গেল না। গ্রামে তার কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা যে অতি সামান্য। একটু ঘুরিয়ে বললে পরিস্থিতি দাঁড়াচ্ছে এই যে, যে-শিক্ষা আমরা পেলাম, গ্রাম্য জীবনের সমস্যাগুলির সমাধানের পক্ষে তা আদৌ কার্যকরী হ'ল না। গ্রাম্য জীবনের প্রধান অবলম্বন—কৃষি, পশুপালন, কুটিরশিল্প, সমবায়, গৃহনির্মাণ ইত্যাদি আরও বহু প্রকারের বৃত্তি। এগুলির কোনটার জন্যই স্কুল-কলেজের প্রচলিত শিক্ষা আমাদিগকে প্রস্তুত করে তোলে না। গ্রাম্য জীবনের সহিত যোগ-সম্পর্ক-বর্জিত একটা অবাস্তব পুথি-পড়া শিক্ষা জীবনের প্রয়োজনে সামান্যই কাজে লাগে, যদিও অভিমানের বোঝা বাড়িয়ে তোলে যথেষ্ট পরিমাণে। এ-শিক্ষা জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী।

মহাত্মা গান্ধীর শিক্ষা-পরিকল্পনায় প্রয়োজনসিদ্ধ শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। বুনিয়াদী-শিক্ষা সৃজনধর্মী শিক্ষা। শিক্ষার্থীর সহজাত সৃজনাত্মক শক্তিকে শিক্ষার ভিতর দিয়ে

পরিস্ফুট ও পরিপুষ্ট করে তোলা বুনিয়াদী শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য। মহাত্মাজী এইরূপ শিক্ষার সর্বজনীন প্রসারের দ্বারাই ভারতের লক্ষ লক্ষ গ্রাম আর কোটি কোটি গ্রামবাসী ভারতীয় নরনারীর জীবনকে সুন্দর, স্বচ্ছন্দ ও সচ্ছল করে তুলতে চেয়েছিলেন।

ভারতের জাতীয় পরিকল্পনায় গ্রামীণ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হয়েছে। দেশের বিভিন্ন পল্লী-অঞ্চলে দশটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে পূর্ণাঙ্গ পল্লীশিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে পরিণত করবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ-প্রতিষ্ঠিত শ্রীনিকেতন উক্ত দশটি প্রতিষ্ঠানের অন্যতম। এই পল্লী-প্রতিষ্ঠানগুলির শিক্ষা ও শিক্ষণের ধারা প্রচলিত স্কুল-কলেজের শিক্ষাধারা হতে হবে বহুলাংশে পৃথক ধরনের। এখানে যারা শিক্ষালাভ করতে আসবে, তারা যাতে শিক্ষান্তে গ্রাম্য জীবনের নানা সমস্যা-সমাধানে সক্ষম ও সিদ্ধকাম হতে পারে, সেটাই হবে এই শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য। এখানে থাকবে কৃষি-বিষয়ে, পশুপক্ষী পালন-বিষয়ে, মৎস্য চাষ-বিষয়ে, শিল্প-বিষয়ে, ব্যবসা-বাণিজ্য-বিষয়ে, সমবায়-বিষয়ে, স্বায়ত্তশাসন-পরিচালনা-বিষয়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য-সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয়েও শিক্ষাদানের ব্যবস্থা। ঠিক এই বিশেষ ধরনেরই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান দেখা যায় অস্ট্রেলিয়ায়। অস্ট্রেলিয়ার 'Area School' বা আঞ্চলিক বিদ্যালয়গুলি বিখ্যাত। বিস্তীর্ণ জন-বিরল দেশ অস্ট্রেলিয়া। চাষবাস, মেষপালন ও গোপালন অস্ট্রেলিয়ার প্রধান উপজীব্য। বহুবিস্তৃত ভূখণ্ডে চাষীরা চাষবাস, ফলের বাগান, গবাদি পশুপালন ইত্যাদি করে থাকে। এদের সন্তান-সন্ততিরা বেশির ভাগই চাষবাসের কাজে, গবাদি পশুপালনের কাজে ভবিষ্যতে আত্মনিয়োগ করবে। Area School-গুলিতে গ্রামাঞ্চলের ছেলে-মেয়েরা হাতে-কলমে এমন শিক্ষাই পায়, যা পরবর্তী জীবনে তাদের বৃত্তির পক্ষে হবে কার্যকর। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে তারা শিক্ষা পায় কৃষিবিজ্ঞানে, পশুপক্ষী-পালনে, কাঠের কাজে, লোহার কাজে, রাজ-মিস্ত্রীর কাজে, শুশ্রূষাকারীর কাজে। সেই সঙ্গে কৃষ্টিমূলক শিক্ষা

সম্পর্কেও বিশেষ যত্ন নেওয়া হয়। যে চাষী হবে, যে গোয়ালা হবে, যে রাজমিস্ত্রী হবে, যে ছুতোর হবে বা অন্য কিছু হবে, প্রত্যেকেই শিক্ষিত, মার্জিত, সংস্কৃতিবান মানুষ হয়ে উঠে, তার প্রতি নজর দেওয়া হয়। শিক্ষা ও সংস্কৃতির দিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীধারী অপিসের কেরাণী বা আদালতের উকিল আর গ্রামবাসী চাষীর মধ্যে প্রভেদ অতি সামান্য। উভয়েই শিক্ষিত ও মার্জিত। দেশের কল্যাণ-সাধনে উভয়েরই দায়িত্ব রয়েছে, এবং উভয়েই যাতে সেই দায়িত্ব যথাযথ পালন করতে পারে, দেশের শিক্ষা-নিয়ন্ত্রকগণ সে-দিকে লক্ষ্য রাখছেন।

ভারতে শিক্ষার পুনর্গঠনে গ্রামীণ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত বেশী, কারণ ভারত গ্রামপ্রধান দেশ। গ্রামবাসীর সংখ্যা শহরবাসীর সংখ্যা অপেক্ষা বহুগুণ বেশী। গ্রামীণ শিক্ষাই হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে জাতীয় শিক্ষা-সংস্কৃতির মূল। ইহার মাধ্যমেই জাতীয় সংস্কৃতির ধারা দেশের আপামর জনসাধারণের মধ্যে সঞ্চারিত হবে।

শিক্ষক ও সমাজ

শিক্ষার বহুবিধ সংজ্ঞা। অন্যতম সংজ্ঞা —সমাজ-পরিবেশের সহিত সামঞ্জস্য ও সমন্বয়-সাধনের প্রচেষ্টা। সমাজ পরিবর্তনশীল—এই পরিবর্তনশীলতার সহিত তাল রক্ষা করা যে-কোন শিক্ষাব্যবস্থাপনারই উদ্দেশ্য ও উদ্যম। সমাজের প্রয়োজন ও চাহিদার সঙ্গে যে শিক্ষাব্যবস্থার সংযোগ বা সামঞ্জস্য থাকে না, সে-শিক্ষাব্যবস্থা জমির সঙ্গে সংযোগবিহীন গাছের মতোই বিশীর্ণ বিশুষ্ক হয়ে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। টবের ফুলগাছের মতো কৃত্রিম উপায়ে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব হলেও সে-ব্যবস্থা হয়ে থাকে পঙ্গু ও প্রাণহীন।

শিক্ষা ও সমাজ এ-দুইয়ের সম্পর্ক ওতঃপ্রোত। সমাজ-বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাব্যবস্থারও বিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। সামাজিক পরিবেশের প্রভাবে শিক্ষার নীতি, উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি ক্রমাগতই প্রভাবিত ও পরিবর্তিত হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ ইংরাজের সাম্রাজ্য-বিস্তার ও পাবলিক স্কুলের সৃষ্টি ও পরিচালনার পারস্পরিক সম্বন্ধের কথা উল্লেখ করা যায়। দুনিয়া-জোড়া সাম্রাজ্য-শাসনের তাগিদে যে-বিশেষ ধরনের শিক্ষার প্রয়োজন অনুভূত হয়েছিল, ইংলণ্ডের পাবলিক স্কুল-স্থাপনের মূল উদ্দেশ্য নিহিত ছিল সেই প্রয়োজনে।

নানা দেশে নানা সময়ে নানা শিক্ষা-আন্দোলন পরিচালিত হয়েছে। যে-চিন্তা, ভাবনা ও দার্শনিক তত্ত্বাদির ভিত্তিতে এই-সকল আন্দোলন দানা বেঁধে উঠেছে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, এই-সকল ভাব-ভাবনার পিছনে রয়েছে একটা সামাজিক প্রয়োজন-সিদ্ধির তাগিদ। শিক্ষা-দার্শনিক ও শিক্ষা-আন্দোলনের পথিকৃৎগণ সমাজ-প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন এবং তা মেটাবার জন্যই শিক্ষার নূতন ব্যবস্থা ও পরিবর্তনের গুরুত্ব উপলব্ধি করেছেন, এবং অবস্থানুযায়ী নব নব নীতি ও পদ্ধতির পোষকতা করেছেন। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ উনিশ শতকে এদেশে ইংরাজী শিক্ষা-প্রবর্তন-আন্দোলনের

কথা বলা যেতে পারে। রামমোহন প্রমুখ প্রবর্তকগণ ইংরাজী শিক্ষাকে সাদরে ও সাগ্রহে স্বাগত অভিনন্দন জানিয়েছিলেন এইজন্যই যে, তাঁরা বুঝেছিলেন, শত শত বর্ষের সঙ্কীর্ণতা ও কূপমণ্ডূকতার অবসান ঘটাতে হলে ভারতীয় আচার ও অন্ধবিশ্বাসের পঙ্কিল বদ্ধ জলাশয়ে পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের মুক্তধারাকে প্রবাহিত করা একান্ত দরকার।

একদিক দিয়ে একথা যেমন সত্য যে, সামাজিক প্রভাবে শিক্ষা, চিন্তা ও ব্যবহারের পরিবর্তন সাধিত হয়, তেমনি শিক্ষাচিন্তা দ্বারা সমাজ-বিবর্তন যত প্রবলভাবে প্রভাবিত হয়, তেমন আর কিছুতেই হয় না। শিক্ষা ও সমাজ এ-দুয়ের পারস্পরিক সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য ও অপরিহার্য। আজ ইংরাজ, আমেরিকান, ফরাসী, জার্মান, জাপানী—যে-কোন শিক্ষাগ্রসর জাতির সামাজিক প্রগতি সেই দেশের শিক্ষাব্যবস্থার উৎকর্ষের নিদর্শন। দেশের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলিই দেশের ও সমাজের প্রতিভার প্রতিফলন ও পরিচয়। ইংরাজের অক্সফোর্ড, কেমব্রিজ, ইটন-হ্যারো, ব্রিটিশ মিউজিয়াম, আমেরিকার হার্ভার্ড, কোলাম্বিয়া, লাইব্রেরি অফ্ কংগ্রেস, ফরাসী জাতির ল্যুভর ও বিব্লিওথেক ন্যাশনাল, বা স্কান্দিনেভীয় দেশসমূহের ফোক্ হাই স্কুল (Folk High School) বা গণবিদ্যালয়গুলি সে-সব দেশের কেবল জাতীয় গৌরবের বস্তুই নয়, জাতির প্রাণকেন্দ্র-স্বরূপও বটে। জাতীয় চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য গঠিত হয়েছে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির মাধ্যমে। 'ওয়াটারলুর যুদ্ধ ফতে হয়েছিল ইংলণ্ডের পাব্লিক স্কুলের ক্রীড়াঙ্গনে'—এই বহুল-প্রচলিত কথাটি জাতীয় চরিত্রের উপর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা-নীতির অপরিসীম প্রভাবের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

আদিম মানুষের শিক্ষাব্যবস্থা ঃ

অতি আদিম গুহা-মানবের শিশুকেও একপ্রকার শিক্ষানবীশি করতে হত। তাকে অবশ্য আধুনিক বিজ্ঞানানুমোদিত সংজ্ঞায় 'শিক্ষা'

বলে অভিহিত করা যাবে না। কিন্তু প্রাত্যহিক জীবনের তাগিদে এই তালিমির প্রয়োজন ছিল অপরিহার্য। প্রকৃতির বিরুদ্ধে সেদিনের মানুষকে আজকের মানুষ অপেক্ষা অনেক বেশী সংগ্রাম করতে হত। সেই আদিম বন্য জীবনের নানা বিপদ ও সমস্যার সঙ্গে লড়াই করতে হলে মানুষকে প্রস্তুত হতে হত। সে-আদিম সমাজেরও হয়তো, হয়তো বা কেন নিশ্চয়ই, কতকগুলি নিয়ম-শৃঙ্খলা, বিধি-নিষেধ ও আইন-কানুন থাকা স্বাভাবিক। আদিম মানবশিশুকে গোড়া থেকেই তার প্রাত্যহিক জীবনের তালিম নিতে হত। সামাজিক ও পারিপার্শ্বিক পরিবেশের সঙ্গে খাপখাওয়াবার আর এক নাম শিক্ষা—adjustment to social changes and environment. এই অর্থে আদিম মানবের শিক্ষাব্যবস্থাকে সত্যিকারের শিক্ষা বলে স্বীকার করতে হবে বই কি! যেমন পুরাণ-কাহিনীতে কথিত আছে যে, রাজা জনক ও কুরুরাজ স্বহস্তে হল চালনা করতেন। তৎকালীন রাজা ও সমাজপ্রধানকেও হল-চালনা ও কৃষিকর্ম হাতে-কলমে শিখতে হত। অবশ্য এখনকার দিনে তা না করলেও চলে। তার কারণ, তখনকার দিনে কৃষিকাজই ছিল মানুষের সব চাইতে বড় কৃত্য। প্রাচীনতম গুহা-মানব কর্তৃক অঙ্কিত পাথরের প্রাচীর-চিত্রে দেখা যায় যে, কিভাবে বন্য জন্তু শিকার করতে হবে সে বিষয়ে প্রবীণেরা নবীনকে হাতে-কলমে-রপ্ত করে তুলছেন। সমাজ ও শিক্ষা ছিল পরস্পরের অতি নিকটে। একে অপরের পরিপূরক।

কিন্তু শিক্ষাব্যবস্থা ক্রমশঃ যতই প্রতিষ্ঠান-কেন্দ্রিক হতে লাগল, ততই যেন পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও শিক্ষাব্যবস্থার মাঝখানে ব্যবধানের অন্তরাল সৃষ্টি হতে শুরু করল। আদিম মানুষ শিক্ষালাভ করত প্রকৃতির মুক্ত অঙ্গনে। কিন্তু যেদিন শিক্ষা প্রকৃতির খোলা আকাশ, মাঠ ও বন থেকে সরে গিয়ে গৃহের নিরাপদ আশ্রয়ে প্রবেশ করল, সেদিন থেকেই বোধ হয় মানুষের শিক্ষাব্যবস্থা সমাজজীবন

হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তে লাগল। এর ফলে শিক্ষা, তথাকথিত শিক্ষিতের দল ও শিক্ষাহীন জনসাধারণের মাঝে গড়ে উঠল একটা শ্রেণী-ব্যবধান বা বৈষম্য। আমাদেরই দেশের সাম্প্রতিক ইতিহাসের একটা অধ্যায় সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক। বিদেশী ইংরাজ এদেশে রাজত্ব কায়েম করে বসল। তারপর তারা মুখ্যতঃ নিজেদের স্বার্থে এবং কতকটা সদিচ্ছা প্রণোদিত হয়ে এদেশে ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্তন করেছিল। এ-ঘটনা ঘটেছিল উনিশ শতকের প্রথমার্ধে। এই নতুন ব্যবস্থার অন্যতম প্রবর্তক লর্ড মেকলের (Lord Macaulay) বিখ্যাত পরিস্রবণবাদ (Filtration Theory) প্রায় সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্তকগণ আশা পোষণ করেছিলেন যে, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের আনুকূল্যে ইংরাজী শিক্ষা আপামর জনসাধারণে প্রসারিত হবে। কিন্তু ঠিক তার বিপরীতটাই ঘটল। মুষ্টিমেয় শিক্ষিত সম্প্রদায় নবলব্ধ শিক্ষার দৌলতে সরকারী চাকুরি ও ক্ষমতায় আসীন হয়ে জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন একটা আত্মকেন্দ্রিক গোষ্ঠীতে পরিণত হল। জনসাধারণের সঙ্গে শিক্ষিত লোকের সংযোগ হয়ে এল ক্ষীণ। এই অবাঞ্ছিত অবস্থাটা প্রত্যক্ষ করা যায় যখন নানা উন্নয়ন পরিকল্পনা নিয়ে আজকের দিনে শিক্ষিত সরকারী কর্মচারী বা সমাজকর্মীরা গাঁয়ে গাঁয়ে গিয়ে গ্রামবাসীদের সমর্থন ও সহযোগিতা-লাভে বহুলাংশে বিফল হন। পরিস্রবণবাদের ব্যর্থতার কারণ— যে-নীতি ও পদ্ধতি অনুসারে বিদেশী ইংরাজী শিক্ষা এদেশে চালু হয়েছিল, তার সংযোগ ছিল না দেশের মাটির সঙ্গে অর্থাৎ দেশের ঐতিহ্য ও জাতির প্রতিভার সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করতে পারে নি এই নতুন শিক্ষাব্যবস্থা।

নতুন আন্দোলনঃ

শিক্ষাকে সমাজমুখী করার উদ্দেশ্যে আবার এক নতুন আন্দোলনের সূচনা দেখা গিয়েছে পৃথিবীর নানাদেশে। সেই

গজদন্তনির্মিত গম্বুজ (Ivory Tower) থেকে নামিয়ে শিক্ষাধারাকে আবার সমাজের নিম্নভূমির উপর দিয়ে প্রবাহিত করার প্রয়াস চলেছে। এই প্রসঙ্গে কয়েকটি বিশেষ বিশেষ শিক্ষা-আন্দোলনের নাম উল্লেখযোগ্য। বিগত প্রথম বিশ্ব-মহাযুদ্ধের পর চীন দেশে অনুসৃত জনশিক্ষা-আন্দোলন (Mass Education Movement), মেক্সিকোর ভ্রাম্যমাণ সাংস্কৃতিক দল (Mobile Cultural Mission) ও ডেনমার্ক, সুইডেন প্রভৃতি দেশের গণবিদ্যালয়গুলি (Folk Schools) উক্ত আন্দোলনের দৃষ্টান্ত। এই আন্দোলনের মূল ও মুখ্য উদ্দেশ্য—স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায়ঃ "Carry education to the people"—শিক্ষাকে জনগণের কাছে পৌঁছে দাও। গণশিক্ষার লক্ষ্য হচ্ছে জনগণের প্রাত্যহিক জীবনের প্রয়োজন মেটান এবং তাহাদের নিজেদের ও সমাজের উন্নতির জন্য আকাঙ্ক্ষার উদ্বোধন।

ভোগবাদ মানুষের জীবনে অশোভন প্রাধান্য লাভ করেছে। ভোগবাদী মানুষের শিক্ষাও সঙ্কীর্ণ বস্তুতান্ত্রিকতা এবং লোভ, ক্ষমতা-লিপ্সা ও স্বার্থবুদ্ধি দ্বারা আচ্ছন্ন। নীতিজ্ঞান, আধ্যাত্মিকতা ও পরমার্থ আজ উপেক্ষিত। বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার বিরুদ্ধে এ একটা বড়ো রকমের অভিযোগ। শিক্ষার এই সঙ্কীর্ণ ও স্বার্থবুদ্ধি-প্রধান দৃষ্টিভঙ্গী মানুষের চরিত্রের উপর এক অতি শোচনীয় প্রভাব বিস্তার করছে। মানুষ হয়ে পড়ছে আত্মকেন্দ্রিক এবং সামাজিক দায়-দায়িত্ব-বিষয়ে অজ্ঞ ও উদাসীন। আজ সারা দুনিয়ায় শিক্ষার এই অনভিপ্রেত অবস্থাটা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। শিক্ষার প্রভাবকে আজ স্কুল থেকে গৃহে, গৃহ হতে সমাজে এবং বৃহত্তর অর্থে সমাজ হতে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দেবার আয়োজন চলেছে। অর্থকরী ও পেশাদারী লক্ষ্যই শিক্ষার একমাত্র লক্ষ্য নয়। প্রয়োজন-সিদ্ধি এবং মানব-ধর্ম ও আধ্যাত্ম-বাদ এই দু'য়ের মধ্যে সন্ধি-স্থাপনই শিক্ষার উদ্দেশ্য। যেহেতু আজ এই নতুন আন্দোলন শিক্ষাকে প্রাত্যহিক ও পরমার্থিক জীবনের সঙ্গে

নিবিড় ঐক্যসূত্রে গ্রথিত করতে চায়, সেহেতু শিক্ষার অর্থ আজ আর খণ্ড খণ্ড তথ্য-পরিবেশনমাত্রই নয়। একদিকে সামাজিক পরিবেশ ও প্রগতি আর অপর দিকে জীবনের পরমার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে, শিক্ষাধারার মোড় ফেরাবার এক শুভ সন্ধিক্ষণ সমাগত।

সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগে—দ্বিতীয় চার্লস্ যে-সময় ইংলণ্ডের সিংহাসনে আসীন, সেই সময় রয়্যাল সোসাইটি অব লণ্ডন-এর প্রথম অধিবেশন হয়। সেই দিনটি থেকে ঐতিহাসিকগণ বর্তমান বিজ্ঞান-যুগের গণনা করে থাকেন। নানা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে সামাজিক পরিবর্তনের গতি হয়েছে অতিশয় ত্বরান্বিত। যে-পরিবর্তন অতীতে তিনপুরুষের জীবদ্দশায় সংঘটিত হত না, আজ তা এক-জীবনেই পরিদৃষ্ট হচ্ছে। এতই দ্রুতগতিতে বিজ্ঞান আজ প্রগতির পথে এগিয়ে যাচ্ছে যে, সামাজিক পরিবর্তন তার সঙ্গে সমতালে চলতে পারছে না। বৈজ্ঞানিক পরিবর্তনের ফলে মানুষের জীবনে নিত্য যে নতুন নতুন অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে, সমাজ তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করতে গিয়ে রীতিমত হাঁফিয়ে উঠছে।

গত মহাযুদ্ধের কালে পৃথিবীতে আণবিক যুগের প্রবর্তন হয়েছে। পরম শক্তিমান পরমাণুর ধ্বংসাত্মক ক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার সৃজনী-শক্তির উদ্বোধন বিশ্ব-জীবনে নতুন দিগন্তের আভাস দেখাচ্ছে। বিজ্ঞানের এই প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়া মানুষের জীবনকে আমূল আলোড়িত করেছে। আজ একটা বিপুল সামাজিক বিবর্তনের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে মানুষ। এই পরিস্থিতিতে মানব-সমাজের নেতৃত্ব গ্রহণ করবে কে? এ-নেতৃত্ব গ্রহণ করতে পারে একমাত্র শিক্ষা ও শিক্ষক। সমাজ-বিবর্তনে শিক্ষকই পথিকৃৎ, শিক্ষাই পথ-প্রদর্শক। নতুন সামাজিক প্রভাব ও পরিবেশের সঙ্গে বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে সদা-সচেষ্ট। কয়েকটা দৃষ্টান্ত দ্বারা এই নতুন অবস্থাটা ভালোভাবে বুঝতে চেষ্টা করা যাক। আজকের দিনে শিশু ও কিশোর শিক্ষার্থীকে নিত্য-নতুন বস্তু শিখতে হয়। জ্ঞান-বিজ্ঞানের পরিধি

নিত্যবর্ধমান। শিক্ষার প্রয়াসও বিরামবিহীন ও নিরবিচ্ছিন্ন। আজ যে-তথ্য নতুন, আগামী দিনেই তার ঘটছে পরিসমাপ্তি। কি বিজ্ঞান, কি অর্থনীতি, কি সমাজশাস্ত্র—প্রতিটি ক্ষেত্রেই পরীক্ষা-নিরীক্ষার অন্ত নাই। পাঠ্য ও পঠনীয় বিষয়েও প্রতিনিয়ত পরিবর্তন ও পরিবর্ধন অপরিহার্য। সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থার উপর এর প্রত্যক্ষ প্রভাব সুদূরপ্রসারী এবং এর আর একটা লক্ষণীয় বিষয়ঃ সমাযোজন বা Communications-বৈচিত্র্য। বিভিন্ন সমাযোজন-মাধ্যমের ব্যবহার ও প্রয়োগ আধুনিক শিক্ষা-পদ্ধতির অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। রেডিও, সিনেমা ও টেলিভিশনের ব্যাপক ব্যবহার আজ শিক্ষা ও শিক্ষকের সহায়কমাত্রই নয়, এক জটিল সমস্যাও বটে। সহজতর সমাযোজনের দৌলতেই আজ দূরত্বের ব্যবধান ঘুচে গেছে। আজ কয়েক ঘণ্টায় মানুষ গোটা ছুনিয়াটাকে চক্কোর দিয়ে আসতে পারে। জাতিগত, ভাষাগত, আচারগত নানা বৈষম্য—যা মানুষকে মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন রাখে—তার কোন-কিছুই আজ আর মানুষের চলার পথে এবং পরস্পরের মেলামেশা আর ভাব-বিনিময়ের ব্যাপারে অন্তরায় বলে গণ্য হয় না।

যন্ত্র মানুষের শ্রম-লাঘবকারী। যন্ত্রের প্রসাদে কায়িক শ্রমের অনেকখানি সাশ্রয় ঘটছে এবং মানুষ বেশী পরিমাণে বিশ্রাম উপভোগ করতে সমর্থ হচ্ছে। সেই বিশ্রামের সময়-অতিবাহনেরও নানা উপায়, নানা মাধ্যম আবিষ্কৃত হয়েছে। নানা বিচিত্র উপায়ে মানুষ আজ চিত্তবিনোদন করছে। কিন্তু যতটা দ্রুত উপায়ে মানুষের শ্রমের লাঘব ঘটছে, ঠিক ততটা তাড়াতাড়ি সেই বিশ্রাম-সময়ের সদ্ব্যবহারের উপায় আবিষ্কৃত হচ্ছে না। ফলে শ্রম-লাঘব-জনিত যে-বাড়তি সময়টা মানুষের হাতে আসছে, তা অনেকক্ষেত্রেই উপভোগ্য না হয়ে বিরক্তি-জনক বোঝাস্বরূপ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। বিজ্ঞান ও সমাজ-বিজ্ঞানের প্রগতির ফলে উদ্ভূত এই সমস্যাগুলি আজ শিক্ষা ও শিক্ষকের সম্মুখে একটা বড় প্রশ্ন তুলে ধরেছে।

এই পর্যন্ত সমাজ ও শিক্ষা—এ-দুয়ের পারস্পরিক সম্পর্কের বিষয়ে যা বলা গেল, তা সাধারণ ভাবে প্রগতিশীল পাশ্চত্ত্য দেশগুলির সম্বন্ধে প্রজুয্য হলেও প্রাচ্য ও ভারতবর্ষের পক্ষেও তা সমভাবেই সত্য।

রাজনৈতিক স্বাধীনতা-লাভ এবং তৎপরবর্তী বারবৎসর-কালে ভারতে এক ব্যাপক গঠনমূলক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান চলেছে। এই যজ্ঞানুষ্ঠানের প্রধান উদ্দেশ্য জনগণের দারিদ্র্য-নিরসন, জীবন-যাত্রার মান-উন্নয়ন অথবা এক কথায় পার্থিব সম্পদ-বৃদ্ধি। এই উদ্দেশ্য-সাধনের পন্থা কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার, আর্থিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা-সাধন ও উৎপাদন-বৃদ্ধি। দেশের জনসংখ্যা ক্রমবর্ধমান—প্রতি দশ বৎসরে দেশের জনসংখ্যা শতকরা দশজন হিসাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। সুতরাং জনসংখ্যা-নিয়ন্ত্রণ দেশ-পুনর্গঠন পরিকল্পনার একটা জরুরী অংশ। দেশরক্ষা-সমস্যাটাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার, গণতন্ত্র-সম্মত প্রশাসনিক ব্যবস্থা, নারী-পুরুষের সমানাধিকার ইত্যাদি নানা বিচিত্র সমস্যাই আজ স্বাধীন দেশের সমাজের শিক্ষাব্যবস্থার সম্মুখে নতুন জিজ্ঞাসারূপে উপস্থিত হয়েছে।

সমাজের নতুন রূপায়ণের পটভূমিকায় আজ শিক্ষক ও শিক্ষকের গুরু দায়িত্বের কথাটা ভেবে দেখা যাক।

স্বাধীনতার নতুন সংজ্ঞা ঃ

পরাধীনতার যুগে দেশপ্রেম বলতে দেশের শৃঙ্খলা-মোচনই বোঝাত। কবিকণ্ঠে তারই প্রতিধ্বনি শুনতে পাই ঃ

> “শিকল-দেবীর ঐ যে পূজা বেদী
> চিরকাল কি রইবে খাড়া ?
> পাগলামি তুই আয় রে দুয়ার ভেদি
> ঝড়ের মতন বিজয়কেতন নেড়ে,
> অট্টহাস্যে আকাশখানা ফেঁড়ে
> ভোলানাথের ঝোলাঝুলি ঝেড়ে
> ভুলগুলি সব আন রে বাছা বাছা।”

অথবা "ফাঁসীর মঞ্চে গেয়ে গেল যারা জীবনের জয় গান" ইত্যাদি।

সেটা ছিল ভাঙনের যুগ। স্বাধীনতাহীনতায় জাতীয় আবেগের উত্তেজক রস যোগাত কবি ও আদর্শবাদীর দল। কারাবরণ, ফাঁসীর মঞ্চে আরোহণ ও অপরাপর নানা নিগ্রহ-লাঞ্ছনা-ভোগই ছিল দেশ-প্রেমিকের বড় তকমা। আজও অবধি দেশপ্রেমের এই একদেশদর্শী সংজ্ঞাটিই বলবৎ রয়েছে। দেশপ্রেম যে শুধু নেতিবাচক নয়, দেশপ্রেম যে কেবল স্বাধীনতা-অর্জন-প্রচেষ্টাই নয়, দেশপ্রেম যে আরও বড়, দেশপ্রেমের যে গঠনাত্মক একটা দিক আছে, সে-কথাটা খুব ভালভাবে আমরা অনেকেই চিন্তা করে দেখি না। "*Dulcet decorum et pro patria mori*—it is glorious to die for one's country. It is equally glorious to live for one's country."

স্বাধীন দেশের নাগরিকের দেশপ্রেমের সংজ্ঞা ইহা ছাড়া আর কি হতে পারে? গত যুদ্ধে গোটা জার্মানী দেশটাই ব্রিটিশ-রুশ-মার্কিন বোমার আঘাতে এক ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল। কিন্তু আজ মাত্র ১২।১৩ বৎসরের ব্যবধানে জার্মানী তার যুদ্ধ-ক্ষত সম্পূর্ণ মোচন করে নূতন ভাবে নিজেকে গড়ে তুলেছে। এই পুনর্গঠন কেবল বৈদেশিক সাহায্যেই (Marshall Aid) সম্ভবপর হয়নি। যে-কারণে এই বিস্ময়কর পুনর্গঠন সম্ভবপর হয়েছে, তা হচ্ছে সে-দেশের শিক্ষাব্যবস্থার উৎকর্ষ। শিক্ষা-ব্যবস্থাই জাতির ঘোর দুর্দিনে জাতির মনোবল অক্ষুণ্ণ রেখেছিল। শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলিই জাতির শিরায় শিরায়, ধমনীতে ধমনীতে নতুন প্রাণধারা সঞ্চারিত করেছে। বৈদেশিক সাহায্য পৃথিবীর বহু অনগ্রসর দেশেই অঢেল আসছে, কিন্তু সমপরিমাণ সুফল অনেক স্থলেই ফলছে না। আমাদের দেশের কথাই ভাবা যাক। আমাদের ব্যাপক উন্নয়নমূলক কাজের অগ্রগতির পক্ষে যেটা সর্বাপেক্ষা গুরুতর প্রতিবন্ধক, সেটা হচ্ছে জনগণের মনে সাড়ার

অভাব এবং স্বতস্ফূর্ত সহযোগিতার স্বল্পতা। রাজনৈতিক স্বাধীনতা-আন্দোলনে যে-পরিমাণে জনসাধারণের সমর্থন ও সাহায্য পাওয়া গিয়েছিল, তার এক-চতুর্থাংশ পাওয়া গেলেই আজ দেশের বহুবিধ সমস্যার আশু সমাধান সম্ভব হয়ে উঠত। কিন্তু জনচিত্তের জাগরণ রাজনৈতিক আন্দোলনের চিরাচরিত মাধ্যমে অর্থাৎ শোভাযাত্রা, শ্লোগ্যান ও গরম গরম বক্তৃতা দ্বারা সম্ভব হবে না। অন্য মাধ্যমের প্রয়োজন। সে-মাধ্যম আর কিছু নয়, সে হচ্ছে—শিক্ষা। একটি সুস্থ সংহত শিক্ষাব্যবস্থার দ্বারাই এই মহৎ কার্য সুসম্পন্ন হতে পারে। অন্য কোন-কিছুতেই নয়। আজ এই নতুন পরিস্থিতিতে শিক্ষার উপর যে-গুরু দায়িত্বভার এসে পড়েছে, তার কথাই গভীর ভাবে চিন্তার প্রয়োজন।

বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী প্রমুখ মহান্ জাতীয় নেতৃগণ তাই বার বার দেশের শিক্ষাব্যবস্থার উৎকর্ষ-সাধনের উপর এত গুরুত্ব আরোপ করে গিয়েছেন। তাঁরা বিদেশীয় শিক্ষার শ্রেষ্ঠ সারবস্তু-গ্রহণের যেরূপ বিরোধিতা করেন নাই, সেইরূপ ভারতীয় ঐতিহ্য ও জাতীয় প্রতিভার ভিত্তির উপর জোর দিয়ে শিক্ষা-সংস্কারের কথা পুনঃ পুনঃ বলেছেন :—

"Let western lights enter our percincts through the lattice-work of our eastern windows."—প্রাচ্যের বাতায়ন-পথে পাশ্চাত্ত্যের আলো-বাতাসে আমাদের গৃহ আলোকিত পুলকিত হোক।

একটা বৃহত্তর দৃষ্টিকোণ থেকে শিক্ষা ও শিক্ষকের সামাজিক দায়িত্বের কথা বিচার করলে প্রথমেই যে-বিষয়টির কথা মনে পড়বে তা হচ্ছে শৃঙ্খলাধর্মী দেশপ্রেম। আজ শিক্ষক-সমাজকেই দেশ ও সমাজ-পুনর্গঠনের উদ্বোধনী যজ্ঞের প্রধান হোতা হতে হবে। দেশ-প্রেমের নূতন বাণী আগামী দিনের মানুষের চিত্তে অঙ্কুরিত করে দেবার দায়িত্ব শিক্ষকের। শিক্ষক যে-উপাদান নিয়ে কাজ করেন,

ন্তা প্রধানতঃ মানবিক উপাদান—এত ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাপূর্ণ গ্রহীতা-সমাবেশ অপর কোন বৃত্তিজীবীর আয়ত্তে নাই। এদিক দিয়ে শিক্ষক ভাগ্যবান। শিশুচিত্তে সু-শিক্ষক একদিন যে-ভাবের বীজটি বপন করেন, তা-ই ভবিষ্যতে বিরাট কর্ম-সম্ভাবনায় পরিণত হতে পারে। তরুণ সম্প্রদায়ের মতো এতোবড় প্রচার-মাধ্যম আর দ্বিতীয়টি নাই। তরুণ সমাজকে মহৎ আদর্শে উদ্বোধিত করেই জাতিকে সার্থকতার পথে চালিত করা সম্ভব। জাতীয় পুনর্গঠনের ইহাই সুবর্ণ পন্থা।

শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ও সমাজ-জীবন ঃ

মহাত্মা গান্ধী-প্রবর্তিত বুনিয়াদী শিক্ষাব্যবস্থার একটা মূলমন্ত্র হচ্ছে—বিদ্যালয়ের সঙ্গে সমাজ জীবনের-ঐক্য-সাধন। সমাজের জন্যই বিদ্যালয়। সমাজ-জীবনের নানা দায়-দায়িত্ব ও নানা সমস্যাকে কেন্দ্র করেই শিক্ষাদান ও শিক্ষা-গ্রহণ করা আবশ্যক। নঈ তালিমের মূল বক্তব্যটিই বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের পাঠ্য-ক্রমে সন্নিবেশিত হয়েছে ঃ

"Each trainee shall take part in the organization of the community life of the institution as also in the life outside. Further, each trainee shall be required to do some educational and social welfare work in the neighbourhood."

বিদ্যালয়টিকে একটি বৃহৎ পরিবার বা সমাজ-রূপে সংগঠিত ও পরিচালিত করা বিধেয়। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সমাজ-জীবনের পূর্ণবিকাশের জন্যই আবাসিক বিদ্যালয়ের আবশ্যকতা। শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভা যেমন একদিকে শিক্ষার্থীকে নব প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করবে, তেমনি শিক্ষার্থীর সজীবতা ও প্রাণ-চঞ্চলতা শিক্ষককে রক্ষা করবে একঘেয়েমি ও জরা-জীর্ণতার অপঘাত থেকে।

বিদ্যালয়-সমাজ-প্রতিষ্ঠান (Community School) ঃ

কি কি কার্যকরী উপায়ে শিক্ষালয়কে সমাজ-জীবনের সহিত যুক্ত করা সম্ভব? যে-আন্দোলন আজ শিক্ষাকে সমাজমুখী

করে তুলতে চাইছে, তার প্রথম কথাই হচ্ছে 'Knowledge must be functional'. একাধিক বিষয়ে খণ্ড-বিচ্ছিন্ন আংশিক জ্ঞানলাভ দ্বারা মানুষের অতি সামান্যই কল্যাণ বা ব্যক্তিত্বের বিকাশ-সাধন হতে পারে। সমাজমুখী শিক্ষা পুথিগত বিদ্যাকে বর্জন করে না। বরং পুস্তকাধিগত বিদ্যাও ব্যবহারিক জীবনের পরিপ্রেক্ষিতেই বিতরিত ও গৃহীত হওয়া প্রয়োজন। এর দ্বারাই ব্যষ্টিগত, গোষ্ঠীগত ও সামাজিক জীবনে সুষম উন্নয়ন সাধিত হবে।

সমাজমুখীন শিক্ষাপ্রণালী ঃ

সমাজমুখীন শিক্ষার যে যে প্রণালী বা পদ্ধতি নির্ধারিত হয়েছে, তারই কয়েকটি প্রসঙ্গতঃ উল্লিখিত হল ঃ

সমস্যা-সমাধান (Problem approach) ঃ খাদ্য, বস্ত্র ও গৃহ—এই তিনটি হচ্ছে মানুষের আদিম ও আবহমান কালের সমস্যা—বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন পদ্ধতিতে শিক্ষাপ্রণালীকে এই সমস্যা তিনটির সমাধানে প্রয়োগ করা হচ্ছে। গৃহনির্মাণ, খাদ্য-উৎপাদন ও সংরক্ষণ, বস্ত্র বা পরিচ্ছদ প্রস্তুত, শিল্পকার্য ইত্যাদি শিক্ষণীয় বিষয়গুলি তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। বুনিয়াদী শিক্ষার গোড়ার কথাও তাই—কোন কাজের মাধ্যমে শিক্ষাদান, অথবা তথ্যমূলক শিক্ষার সঙ্গে হাতে-কলমে কাজের সংযোগ-বিধান এবং হাতে-কলমের কাজকেই শিক্ষার মাধ্যমরূপে গ্রহণ।

সর্বজনীন শিক্ষা ঃ বিদ্যালয়-গৃহটি কেবল ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়া শিখবার জায়গা-ই নয়, বিদ্যালয় সর্বসাধারণের প্রতিষ্ঠান।

বহু দেশেই আজকাল স্কুল-গৃহটিকে স্থানীয় জনসাধারণের নিকট প্রিয় ও প্রয়োজনীয় করে তোলা হচ্ছে। স্কুল-লাইব্রেরিটির অংশবিশেষ সাধারণের জন্য খোলা থাকে। স্কুলের কারখানায় স্থানীয় চাষী গৃহস্থেরা তাদের প্রয়োজন-মাফিক টুকিটাকি জিনিস প্রস্তুত বা মেরামত করিয়ে নেয়। স্কুলের খেলার মাঠ সাধারণেরও

খেলার মাঠ। স্কুলের অবকাশ-সময়ে স্কুলগৃহে বড়দের শিক্ষা-শিবির বসে। একটি স্কুলের গৃহ, আসবাবপত্র, লাইব্রেরি ও শিক্ষোপকরণ-গুলি সময়সূচী-বিন্যাস অনুসারে স্কুলগামী ছাত্র-ছাত্রী এবং তাদের পিতামাতা, অভিভাবক-অভিভাবিকা এবং সাধারণভাবে সকলের কাজেই ব্যবহৃত হয়। স্কুল-গৃহটিই প্রাপ্তবয়স্কদের মিলন ও শিক্ষা-কেন্দ্র। স্কুল-গৃহে সর্বসাধারণকে কাজ ও আমোদপ্রমোদ-উপলক্ষে সমাজ-জীবনের সহিত প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত করে তোলা হয়। শিক্ষা ও সমাজ পরস্পরের পরিপূরক—এই নীতি আজ সর্বজন-স্বীকৃত।

সমাজ-শিক্ষা-পরিকল্পনা ঃ

আমাদের প্রাচীন ইতিহাস ও ঐতিহ্যের শত গৌরব সত্ত্বেও এ-নির্মম সত্য অনস্বীকার্য যে, আমাদের দেশ বহুলাংশে নিরক্ষর ও শিক্ষাহীন। শিক্ষা আজও মুষ্টিমেয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। সমাজ-শিক্ষা-পরিকল্পনায়—

(ক) নিরক্ষরতা-নিরসন,

(খ) স্বাস্থ্যবিদ্যা,

(গ) আর্থিক জীবনের উন্নতি-সাধন,

(ঘ) সমাজ ও রাষ্ট্র-চেতনার উদ্বোধন ও

(ঙ) সুকুমার শিল্প ও কলাদির অনুশীলন ও অবসর-বিনোদন

—এই পাঁচ-দফা কাজের নির্দেশ দেওয়া আছে। কিছুটা মন্থর-গতি হলেও দেশে শিক্ষা আজ স্থিরপদক্ষেপে প্রসার লাভ করছে। সুস্থ ও সুষ্ঠুভাবে মানুষের মতো বেঁচে থাকা, আর স্বাধীন দেশের নাগরিকের পূর্ণ দায়-দায়িত্ব ও মর্যাদা সম্বন্ধে সচেতন হওয়া—এ-দুয়ের জন্যই সর্বজনীন শিক্ষা। জাতীয় শিক্ষা-পরিকল্পনা ও বিশেষ করে সমাজ-শিক্ষা-পরিকল্পনার উপর এই গুরু দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছে ঃ

"I consider every man a traitor who being educated at the expense of the society, does not pay heed to the education of the people."—বলেছেন স্বামী বিবেকানন্দ।

রুশ দেশের সাম্প্রতিক শিক্ষা-প্রসারের কথা অতি বিস্ময়কর। জাতির সর্বশক্তি নিয়োগ করে একটা মধ্যযুগীয়, অনগ্রসর দেশ মাত্র চল্লিশ বৎসর-সময়ের মধ্যেই দুনিয়ার সব চাইতে শক্তিমান দেশকে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ক্ষেত্রে পরাভূত করেছে। আজ রুশ জাতির শিক্ষার মান জগতের আদর্শস্বরূপ।

কার্যক্রম ঃ

(১) বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ে সমাজ-শিক্ষা-কেন্দ্র ও লাইব্রেরি-স্থাপন ও পরিচালনা ;

(২) ছাত্র-শিক্ষকের গ্রাম-সেবার কার্যে আত্মনিয়োগ, যেমন—প্রাথমিক শুশ্রূষা ইত্যাদি ;

(৩) লোক-রঞ্জক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সর্বসাধারণকে স্কুল ও স্কুলের কার্যক্রমের প্রতি অনুরাগী করে তোলা ;

(৪) শিক্ষক-অভিভাবক সম্মেলন ;

(৫) স্কুল-প্রদর্শনী ও খেলাধূলা ইত্যাদি।

(৬) কর্মশিবির পরিচালনা।

শিক্ষকের মামুলী অভিযোগ ঃ

পারিশ্রমিকের স্বল্পতা ও সামাজিক মর্যাদার অভাবজনিত এই দুঃসহ অবস্থা ঘোচাবার প্রয়াস হচ্ছে আজকাল শ্রমিক-মজদুর-আন্দোলনের অনুকরণে শিক্ষক-আন্দোলনের দ্বারা। এর দ্বারা পারিশ্রমিকের হার কিছু বৃদ্ধি পেয়েছে, এবং আরও পাবে, কিন্তু শিক্ষকের সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হবে না। শিক্ষকের সামাজিক মর্যাদা ও প্রতিষ্ঠা আসবে একমাত্র তার কৃতকর্ম ও সেবার উৎকর্ষের ভিতর দিয়ে। পারিশ্রমিকের প্রয়োজন কে না স্বীকার করে ? আজ শিক্ষক-সমাজকে তাঁদের বাঁচবার পথ, উন্নতির পথ ও সম্মানের পথ বেছে নিতে হবে। তাই প্রস্তাব হচ্ছে—পারিশ্রমিকের দাবির সঙ্গে সঙ্গে সেবাব্রতেও শিক্ষক-সমাজকে আত্মনিয়োগ করতে হবে। শিক্ষকের মান সমাজকে দিতেই হবে। শিক্ষা ব্যতীত সমাজের প্রগতি অসম্ভব।

শিক্ষকের সামাজিক মান

কি প্রাথমিক, কি মাধ্যমিক, কি কলেজীয়,—পশ্চিমবঙ্গের সর্বস্তরের শিক্ষকেরাই আজ সঙ্ঘবদ্ধ। সঙ্ঘবদ্ধ বটেন, কিন্তু একতাবদ্ধ নহেন। শিক্ষককুল বিভিন্ন সঙ্ঘে বহুধা-বিভক্ত। কোন কোন ক্ষেত্রে সঙ্ঘগুলি আবার পরস্পর-বিরোধী। একদল স্থির করলেন, প্রকাশ্যে প্রায়োপবেশন করে নিজেদের অধিকার ও দাবি আদায় করে নেবেন; অন্য দল এর বিরোধিতা করে সংবাদপত্রে বিবৃতি প্রকাশ করলেন। একদল সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন পরিচালনা করে নিজেদের অধিকার আদায় করবার জন্য বদ্ধপরিকর, অপর দল সরকারের সহিত সহযোগিতা করতে প্রস্তুত। কিন্তু পন্থা ভিন্ন রকমের হলেও লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য উভয় দলেরই এক। উভয় দলই শিক্ষকের স্বার্থ-সংরক্ষণে সজাগ, উভয় দলই শিক্ষকের স্বার্থ-সংবর্ধনে সচেষ্ট। শিক্ষকের তরফে উভয় দলই দাবিদার। বলা অন্যায় হবে না যে, বর্তমানে দেশে যে-শিক্ষক-আন্দোলন চলছে, তা মুখ্যতঃ দাবি-দাওয়ারই আন্দোলন।

এই আন্দোলনের প্রধান উদ্দেশ্য মোটামুটি তিনটি: শিক্ষকের বেতন-বৃদ্ধি, শিক্ষকের সামাজিক মর্যাদা-প্রতিষ্ঠা, এবং শিক্ষকতা-পেশার পূর্ণ স্বীকৃতিলাভ। প্রথমে বেতন বা পারিশ্রমিকের কথাটাই বিবেচনা করা যাক। পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই শিক্ষক স্বল্প-বেতনভোগী। মুনাফাভোগী ব্যবসা-বাণিজ্য তো বটেই, এমন কি সরকারী চাকুরির পারিশ্রমিকও শিক্ষকের পারিশ্রমিকের অনুপাতে অনেক বেশী। যুদ্ধের বাজারে কর্মসংস্থানের প্রায় ক্ষেত্রেই পারিশ্রমিকের হার বহুগুণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছিল। কিন্তু শিক্ষকের বেতন বড় একটা বাড়ে নাই। যুদ্ধোত্তর কালে অবশ্য শিক্ষকের বেতন কিছু কিছু বেড়েছে। স্বাধীনতার পূর্বে পশ্চিমবঙ্গে একজন ন্যূনতম যোগ্যতাসম্পন্ন প্রাথমিক শিক্ষকের বেতন ছিল মাসিক ১৬৲ টাকা, আজ তা

বাড়িয়ে ৬২॥০ টাকা করা হয়েছে। কিন্তু এ-ও পর্যাপ্ত নয়। তাই এখনও 'শিক্ষকের মাহিনা বাড়াও' আন্দোলন অব্যাহত চলেছে। শিক্ষকের বেতন বেড়েছে, বাড়ছে এবং আশা করা যায়, কালক্রমে আরও বাড়বে। শিক্ষক-আন্দোলনের এই উদ্দেশ্যটি পুরোপুরি না হলেও আংশিক সাফল্য লাভ করেছে। কিন্তু কেবল বেতন-বৃদ্ধি দ্বারাই শিক্ষক-আন্দোলনের পূর্ণ সাফল্য অর্জিত হবে না, হতেও পারে না।

শিক্ষকের মর্যাদা-প্রতিষ্ঠা একটা বড় কথা। মানুষের মন ভোগমুখী। সারা দুনিয়াতেই মানুষ ভোগ-বিলাসের সন্ধানেই ঘুরছে। মানুষের সামাজিক মর্যাদার প্রধান মাপকাঠি হচ্ছে টাকা-কড়ি, অর্থ-সম্পদ। সাদাসিদা সরল জীবনের আদর্শ আজ মুখের কথায় পর্যবসিত। যান্ত্রিক শিল্পমুখ্য সভ্যতা ও সমাজ-ব্যবস্থায় ভোগসর্বস্বতা অপরিহার্য। রাম শ্যাম অপেক্ষা বেশী ধনের মালিক, সুতরাং তার সামাজিক খাতিরও বেশী। যদু মধু অপেক্ষা অধিক বেতনের চাকুরে, সুতরাং যদু মধু অপেক্ষা বেশী সম্ভ্রান্ত। ব্যক্তি ছেড়ে গোষ্ঠীর বেলাতেও সেই একই কথা খাটে। শিক্ষকতায় পয়সা কম, কাজেই সমাজে শিক্ষকের মান কম। যে-পেশায় পয়সা বেশী, সে-পেশার সামাজিক মানও বেশী।

যুদ্ধোত্তরকালের বাজারে ইঞ্জিনীয়ারের চাহিদা খুব বেশী, ইঞ্জিনীয়ারের বেতনও বেশী, তাই ইঞ্জিনীয়রের মানও বেশী। সওদাগরী প্রতিষ্ঠানে, মুনাফার কারবারে ব্যবসায়ীরা আর তাদের সাঙ্গোপাঙ্গরা মুনাফার অংশীদার, মোটা টাকার মালিক—বাড়ী, গাড়ী, টেলিফোন, রেফ্রিজারেটার ইত্যাদি সব-কিছু তাদেরই ভোগ্য। দুনিয়ার রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ সবই তাদের একচেটিয়া ভোগদখলে। এই অর্থসর্বস্ব দুনিয়াদারিতে ইস্কুল-কলেজের মাস্টারের যে-কোন পাত্তাই নাই—সেকথা বলা বাহুল্য। শিক্ষক-আন্দোলনের ফলে মাস্টার মশায়রা বেতন-বৃদ্ধির পথে শম্বুক-গতিতে হাঁটি-হাঁটি-পা-পা এগিয়ে গেলেও

অর্থসর্বস্ব সমাজে প্রবল প্রতিযোগিতায় অন্য বহুজনের বহু পিছনে পড়ে আছেন এবং থাকবেনও। মুনাফাখোর ব্যবসায়ীর সঙ্গে অর্থের পাল্লায় মাস্টার মশায় কোন দিনই সমান হতে পারবেন না।

সুতরাং শিক্ষক-আন্দোলনের অন্যতম মুখ্য উদ্দেশ্য—'সামাজিক মর্যাদা-অর্জন'—বেতন-বৃদ্ধির পথে সহজলভ্য নয়। অন্য পথের কথা ভেবে দেখা প্রয়োজন।

শিক্ষক-সম্মেলন আজকাল হামেশাই হচ্ছে। খবরের কাগজ খুললেই নানা শিক্ষক-সম্মেলনের বিবরণী চোখে পড়ে। সভা-সমিতিতে আজকাল শিক্ষকের দাবি নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। শিক্ষক-সমাজের প্রতি রাষ্ট্র ও জনসাধারণের অবহেলা ও উপেক্ষার কথা জোর গলায় বিঘোষিত হচ্ছে।

ডাক্তার, মোক্তার, উকিল, হিসাব-পরীক্ষক, হাকিম, ইঞ্জিনীয়ার ইত্যাদির পেশায় যে-প্রস্‌পেক্ট ও প্রেস্‌টিজ, তার দশাংশের একাংশ হতেও শিক্ষককুল বঞ্চিত। কথাটা বোধ হয় মিথ্যা নয়। যে-গরু খায় কম, কিন্তু দুধ দেয় বেশী, সে-গরুই গোয়ালার কাম্য। শিক্ষকেরও সেই দশা। ভবিষ্যৎ জাতির স্রষ্টা, জাতির মেরুদণ্ড, সমাজের নেতা ইত্যাদি বহু গালভরা আখ্যায় শিক্ষককুল ভূষিত। শিক্ষকের নিকট হতে সমাজ চায় অনেক কিছু। প্রত্যাশার অবধি নাই।

"Wanted
A young teacher
With the memory of a parrot
The sagacity of an owl
The strength of an eagle
The speed of a hawk
The gentleness of dove
The friendliness of a sparrow;
Up with the lark,

At work with the robin,
And when caged, content with the
Feed of a canary."

Toronto Seminaryর বুলেটিন বোর্ডের উল্লিখিত বিজ্ঞাপনটির মধ্য দিয়ে একটি অতি রূঢ়, কিন্তু বাস্তব সত্যই প্রকটিত হয়েছে। এই বিজ্ঞপ্তির সঙ্গে সমসাময়িক যে-কোন দৈনিক সংবাদ-পত্রে মাস্টারির কর্মখালির বিজ্ঞাপনের কী অদ্ভুত মিল! বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম উপাধি, ট্রেনিং, অভিজ্ঞতা, সাহিত্যানুরাগ, খেলাধূলায় পারদর্শিতা ইত্যাদি নানারকম যোগ্যতার সে-এক অফুরন্ত ফিরিস্তি! পারিশ্রমিক কুল্যে দেড়শত মুদ্রা। হাইস্কুলের একজন বি-এ বি-টি শিক্ষকের মাসিক পারিশ্রমিক দেড়শত টাকা,—ভবিষ্যৎ জাতি-স্রষ্টার যথেষ্ট মূল্য বৈ কি! সমাজ একদিকে শিক্ষককে স্তোকবাক্যে মাথায় তুলবে, আর মূল্য-নিরূপণের ব্যাপারে হবে নির্লজ্জ, অনুদার। চাকুরির বাজারে এমন কতকগুলি বিশেষ বিশেষ চাকুরি আছে, যেগুলির বেতন অন্যান্য চাকুরির অনুপাতে অত্যধিক। এ-সব ক্ষেত্রে সাধারণতঃ যে-অজুহাত বা যুক্তি দেখানো হয় তা হচ্ছে এই যে, এগুলি বিশেষজ্ঞের কাজ, যেমন চার্টার্ড একাউন্ট্যান্ট, ইনকর্পোরেটেড একাউন্ট্যান্ট, ইঞ্জিনীয়ার, ডাক্তার ইত্যাদি। বিশেষজ্ঞতার দোহাই আসলে এক ধাপ্পাবাজি। কৃত্রিম উপায়ে মুনাফাবাজ ব্যবসায়ীরা কতকগুলি কাজের সুযোগ-সুবিধা কয়েকটা মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে প্রতি-যোগিতার ক্ষেত্রকে সংকুচিত করে রেখেছে। তার ফলে অতি অল্প লোকই এ-বিশেষ কাজগুলি পায়, এবং তাই তাদের পারিশ্রমিকের বিরাট পরিমাণটাও বলবৎ থাকে। বিশেষজ্ঞের ছাপ-মারা এমন আরও দশ-বিশটা কাজ আছে। কিন্তু একটু বিশ্লেষণ করে দেখলেই বিশেষজ্ঞতার দাবির অন্তঃসারহীনতা ধরা পড়ে। প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহ্‌রু ঠিকই বলেছেন: একজন ধনী ব্যবসায়ী অপরের

টাকা কৌশলে নিজের পকেটে আনছে—এ হচ্ছে নিছক ব্যক্তিগত বড়মানুষি—এতে সমাজের অহিত ছাড়া হিত নাই। ঠিক তেমনি তথাকথিত কৃত্রিম বিশেষজ্ঞের অত্যধিক বেতনও সমাজের পক্ষে অহিতকারী ; কেননা, উহা জাতীয় ধনের সমবণ্টনের পরিপন্থী। কৃত্রিম উপায়ে কয়েকটি লোকের স্বার্থ-সংরক্ষণের আর একটি কুফল এই যে, এই স্ব-নিযুক্ত বিশেষজ্ঞেরা তাঁদের অপরিমিত পারিশ্রমিকের অনুপাতে সামাজিক দায়িত্ব অতি অল্পই বহন করেন। ধরুন, কোন ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের একজন ম্যানেজার। তাঁর প্রধান দায়িত্ব ব্যবসায়ের লাভ বাড়ান। প্রতিষ্ঠানের লাভে ব্যবসায়ীর ব্যক্তিগত লাভটাই প্রধান। একখানা গাড়ীর জায়গায় পাঁচখানা গাড়ী হ'ল, বাড়ীর সংখ্যা দু'খানার জায়গায় দশখানা হ'ল। সবই তার ব্যক্তিগত সমৃদ্ধি। অবশ্য, দশজন লোক তার ব্যবসায়ে খাটছে—দেশের বেকার-সমস্যা-সমাধানে তার অবদান কিছুটা আছে, কিন্তু সেটা গৌণ। কি জাতিগঠনে, কি সমাজ-কল্যাণে তার দায়িত্ব কতটুকু ? সে-তুলনায় একজন স্বল্প-আয়-বিশিষ্ট চাষীর অবদানের মূল্য কতো বেশী! চাষী খাদ্যোৎপাদন করছে, জাতির মুখের অন্ন জোটাচ্ছে, আর সেই চাষীর হাড়ভাঙ্গা খাটুনির ফলে উৎপন্ন শস্যের কালোবাজারী কারবার চালিয়ে ধনী হচ্ছে ব্যবসায়ীরা। কিন্তু সমাজের হিতকারী চাষী থেকে যাচ্ছে অর্ধাহারী বা প্রায় অনাহারী, আর মুনাফাখোর বিবেক-বিহীন ব্যবসায়ীর স্ফীতোদর আরও স্ফীত হয়ে উঠছে। এ-প্রকার মূল্য-নিরূপণ-ব্যবস্থা অত্যন্ত একদেশদর্শী। শিক্ষক ভাবী সমাজের স্রষ্টা, শিক্ষক শ্রেষ্ঠ সম্মানের অধিকারী, অথচ অনাদৃত ও উপেক্ষিত। একজন শিক্ষককে প্রায় দেবতার আসনে বসিয়ে মৌখিক স্তুতিবাক্যে আপ্যায়িত করা হচ্ছে। অথচ সেই ব্যক্তিটিই আধপেটা খেয়ে ভবিষ্যৎ নাগরিক তৈরি করার গুরু দায়িত্ব বহন করছেন—সে দিকে সমাজের দৃষ্টি বড় একটা পড়ছে না।

সামাজিক মর্যাদা-অর্জনের কথাটা আরও একটু বিশেষভাবে

বিশ্লেষণ করে দেখা যাক। যে যে কারণে বর্তমান যুগের মানুষ সমাজে সম্মান-প্রতিপত্তি লাভ করে তা মোটামুটি এইরূপ ঃ

প্রথমেই হচ্ছে আয় বা আর্থিক সম্ভাবনা। এ-কথার উল্লেখ পূর্বেই করা হয়েছে। আর দশটা পেশার তুলনায় শিক্ষকতা-পেশায় আয় অকিঞ্চিৎকর, কাজেই শিক্ষকের ওজন সামাজিক মানের তুলাদণ্ডে অত্যন্ত লঘু। প্রাথমিক শিক্ষকের তুলনায় মাধ্যমিক শিক্ষক, আর মাধ্যমিক শিক্ষকের তুলনায় কলেজের শিক্ষক বেশী মাহিনা পান—এঁদের মানমর্যাদাও সেই অনুপাতে কিছুটা বেশী। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক আরও বেশী বেতন পান, সুতরাং তাঁর মান আরও বেশী।

দ্বিতীয়তঃ, যে-কোন পেশাদারীর সঞ্চরণশীলতা (mobility)। একজন I. C. S. অফিসার প্রায় এমন কোন কাজ নেই, যার উপযুক্ত বলে বিবেচিত না হতে পারেন। এই শ্রেণীর কর্মচারীরা অনবরতই এক কার্য হতে কার্যান্তরে যাচ্ছেন—তাতে তাঁদের মর্যাদা বৃদ্ধি পাচ্ছে। একজন I. C. S. আজ আছেন হাকিম, কাল হতে পারেন শিক্ষা-বিভাগের পরিচালক। কিন্তু একজন শিক্ষকের বেলায় এমনটা বড় একটা ঘটতে দেখা যায় না। তিনি একবার শিক্ষক হলে বরাবরই শিক্ষক থাকেন।

চাকুরির ক্ষেত্রে স্বাধীনতা বা ইচ্ছাধীন কাজ করবার ক্ষমতা মান-সম্মানের পক্ষে বিশেষ অনুকূল। যে-ব্যক্তিকে আপিসে কাঁটায় কাঁটায় হাজিরা দিতে হয়, যে-ব্যক্তিকে তার প্রতি কাজের জন্য নানাজনের নিকট জবাবদিহি করতে হয়, তার অপেক্ষা যে-ব্যক্তি যখন খুশি তখন কাজে আসতে পারে এবং যাকে যতো কম লোকের কাছে জবাবদিহি করতে হয়, বলা বাহুল্য, তার মর্যাদা ততো বেশী।

সঙ্ঘশক্তি কলৌযুগে। যারা সঙ্ঘবদ্ধ, যারা একতা-সূত্রে আবদ্ধ, তারাই বর্তমান যুগে নিজেদের দাবি আদায় করে নিতে সক্ষম। যে-কোন পেশার সামাজিক মর্যাদা অনেকখানি সঙ্ঘ-সংহতির উপর

নির্ভর করে। শিক্ষকরাও আজ ট্রেড ইউনিয়ন-আন্দোলন দ্বারা নিজেদের স্বার্থ ও সম্মান-সংবর্ধনে সচেষ্ট।

চিকিৎসক, আইনজীবী, সামরিক অফিসার, শাসক, ব্যবসায়ী ইত্যাদি পেশাদারের তুলনায় শিক্ষক মানে-মর্যাদায় নিম্নস্তরের বলেই সাধারণের ধারণা। এর একটা মুখ্য কারণঃ যে যতো মানুষের উপর কর্তৃত্ব করে তার ততো মান। সামরিক অফিসার, বিচারক, ম্যাজিস্ট্রেট প্রভৃতি সেই বিবেচনায় নিরীহ শিক্ষক অপেক্ষা ঢের বেশী খাতির-সম্মান পাবেন, তাতে আর সন্দেহ কি? শিক্ষকের সামাজিক মর্যাদা-স্বল্পতার আর একটি কারণ—সাধারণতঃ শিক্ষককে কেউ বিশেষজ্ঞ বলে মনে করে না। বিশেষজ্ঞ কারা? উকিল, ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, একাউণ্ট্যাণ্ট, স্থপতি প্রভৃতি বিশেষজ্ঞ বলে স্বীকৃত। যে-শিক্ষক হয়তো বিশ্ববিদ্যালয় বা তেমন কোন উচ্চ বিদ্যায়তনে কোন একটা বিশেষ বিষয়ে অধ্যাপনা-গবেষণা করে থাকেন, কেবল মাত্র তাঁকেই বিশেষজ্ঞ শিক্ষক বলে অভিহিত করা হয়। নতুবা অনেকেরই ধারণা, ইচ্ছা করলে যে-কেউ শিক্ষকতা করতে পারেন,—এ আবার তেমন কি কঠিন কাজ? হাজার হাজার ছেলে-মেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ ডিগ্রী পরীক্ষায় পাশ করে। ইচ্ছা করলেই তারা শিক্ষক হতে পারে। শিক্ষকের কাজের ত্রুটি-বিচ্যুতিও যে সে-ই ধরতে পারে। সাধারণ অভিভাবক, উকিল, হাকিম সম্প্রদায়, মায় দোকানদার—রামা-শ্যামা সকলেই মাস্টারের কাজের উপর এক-আধটা মন্তব্য করার অধিকারী, এবং তা করেও থাকে।

শিক্ষককে সাধারণের অবজ্ঞা ও সমাজের বিমাতৃসুলভ মনোভাবের হাত হতে মুক্ত করবার উদ্দেশ্যেই আজকের দিনের শিক্ষক-আন্দোলনের উদ্ভব। শিক্ষকতাকে অন্য দশটা সমাজ-স্বীকৃত প্রফেশন বা বৃত্তির পর্যায়ে উন্নত করতে গেলে যা যা করণীয়, তা মোটামুটি এইরূপঃ

যে-কোন বৃত্তি বা পেশার প্রধান লক্ষণ এই যে, তা জীবিকার্জনের বিশেষ পন্থারূপে স্বীকৃত। খেয়াল বা শখের কাজকে বৃত্তি বা পেশা বলা অন্যায়। পেশাদার অভিনেতা আর শখের অভিনেতা, পেশাদার খেলোয়াড় আর শখের খেলোয়াড়—এই দু'য়ের পার্থক্য সর্বজনবিদিত।

দ্বিতীয় লক্ষণ—পেশামাত্রেই বিশেষজ্ঞের একচেটিয়া অধিকারভুক্ত। যেমন ডাক্তার, নার্স, ইঞ্জিনীয়ার, উকিল, কারিগর ইত্যাদি। আবার, পেশার মধ্যেও আছে নানা শাখা-পেশা এবং উপ-পেশা। ডাক্তারি সাধারণ পেশা। চক্ষু-চিকিৎসা ডাক্তারির উপ-পেশা। চোখের অসুখে চোখের ডাক্তারের, কান-নাক-গলার অসুখে কান-নাক-গলার (ENT)-বিশেষজ্ঞের এবং অনুরূপ ব্যাপারে অপরাপর বিশেষজ্ঞের শরণাপন্ন হওয়াই যুক্তিযুক্ত।

তৃতীয় লক্ষণ—'এ্যামেচার' (amateur) ও পেশাদারের (professional) মধ্যে নির্ণয়যোগ্য প্রভেদ। যেমন ধরুন, একজন 'এ্যামেচার' সমাজ-কর্মী (social worker) হয়তো প্রয়োজন-মতো ফার্স্ট-এড্ (first aid) দিতে পারে, কাটা ঘা পরিপাটিরূপে ব্যাণ্ডেজ করতে পারে এবং এমন কি, ভাঙ্গা হাড় পুনঃসংস্থাপন পর্যন্তও করতে পারে, কিন্তু তাই বলে অ্যাপেন্ডিক্স বা টন্‌সিল-অপারেশন বা হৃদ্‌যন্ত্রের অবস্থা-নির্ণয় একজন পেশাদার বিশেষজ্ঞ ডাক্তারই করতে পারেন,—এ্যামেচারের হাতে এ-কাজের ভার কেউ দিতে চাইবে না।

উল্লিখিত লক্ষণসমূহের প্রয়োগ দ্বারা শিক্ষকতাকে ঠিক কোন পেশা বা বৃত্তির পর্যায়ে ফেলা একটু কঠিন। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে কতকগুলি বিশেষ বিশেষ বিষয়ে যাঁরা অধ্যাপনা-গবেষণা করেন, একমাত্র তাঁরাই বিশেষজ্ঞ বলে বিবেচিত হন। নতুবা, সাধারণ স্কুল-শিক্ষককে বিশেষজ্ঞ বলে কেউ বড় একটা আমল দিতে চায় না।

যতদিন অবধি শিক্ষকতা একটা পুরোপুরি পেশার পর্যায়ে উন্নীত না হচ্ছে, ততদিন অবধি শিক্ষকের আর্থিক মূল্য আর দশটা পেশার সমতুল্য হবে না। সমাজও শিক্ষককে একজন অপরিহার্য বিশেষজ্ঞ বলে মনে করবে না। আজ পাশ্চাত্ত্য দেশগুলিতে শিক্ষক-সম্প্রদায় সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছেন এবং নানাবিধ ট্রেনিং-এর ভিতর দিয়ে শিক্ষককে বিশেষজ্ঞ করে তোলবার প্রয়াস চলছে। কিন্তু কেবল বিশেষজ্ঞ-রূপে স্বীকৃত কিংবা আর্থিক-মূল্যায়নে অন্য পেশাদারগণের তুল্য বিবেচিত হলেই শিক্ষকের প্রাপ্য সামাজিক মর্যাদা ষোল আনা অর্জিত হবে না। অপরাপর অর্থকরী পেশার সঙ্গে শিক্ষকতার একটা অতি মৌলিক পার্থক্য চিরদিন আছে এবং থাকবে।

উকিল ফী-এর বদলে মামলায় মক্কেলের সপক্ষে সওয়াল করেন। ডাক্তার তাঁর দক্ষিণার বদলে রোগীর চিকিৎসা করেন। উভয়েই পর-সেবায় নিয়োজিত,—কিন্তু এ-দু'য়েরই কর্মফল ব্যক্তি-কেন্দ্রিক ও সাময়িক। শিক্ষকের কর্ম ও প্রভাব দূরফলপ্রসূ, দীর্ঘস্থায়ী ও সমাজ-কেন্দ্রিক। সমাজের ও জাতির প্রকৃতি ও প্রগতি নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে স্বল্পবেতনভুক্ শিক্ষকের দ্বারা, মোটা টাকাওয়ালা পেশাদার উকিল-ডাক্তার-ইঞ্জিনীয়ারদের দ্বারা নয়। তাই শিক্ষকের চারিত্রিক উৎকর্ষের এত দাম। শিক্ষকের প্রকৃত মর্যাদাও নির্ণীত হয় শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র-মাহাত্ম্যে

স্কুল-পরিদর্শকের ভূমিকা

স্কুল-পরিদর্শককে সাধারণতঃ বিদ্যালয়-পরিচালনার তত্ত্বাবধায়ক-রূপে গণ্য করা হয়। তিনি বিদ্যালয়ের হর্তাকর্তা এবং নিঃসন্দেহে সর্বাগ্রগণ্য কর্তা। পরিদর্শকের কর্তব্যসমূহ কোন কোন ক্ষেত্রে শিক্ষা-সংবিধান-গ্রন্থে বিশেষভাবে উল্লিখিত, আবার বহুলাংশে অনিরূপিত বলেই ব্যাপক ও গুরুত্বপূর্ণ। প্রভুত্ব ও কর্তৃত্বের মৌলিক ধারণা থেকেই এর উদ্ভব। 'ইন্সপেক্টার'—এই কথাটি-উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই স্কুলের কাজ খুঁটিনাটি ভাবে পরীক্ষার ভারপ্রাপ্ত এক পদস্থ ও ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তির ছবি চোখের সামনে ভেসে ওঠে। মামুলী অর্থে স্কুল-পরিদর্শন বলতে দোষান্বেষণের কার্যই বুঝায় এবং এই জন্য বিদ্যালয়-গোষ্ঠীও * একে ভীতির চক্ষেই দেখেন। পরিদর্শন-কার্য স্বভাবতঃই গঠনমূলক না হয়ে ছিদ্রানুসন্ধানী হয়ে পড়েছে। কাজেই পরিদর্শকের প্রতি বিদ্যালয়ের সাধারণ মনোভাব প্রতিকূল।

সর্বজাগতিক পরীক্ষাঃ

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের শিক্ষা-বিজ্ঞান-সংস্কৃতি-সংস্থার উদ্যোগে বর্তমান স্কুল-পরিদর্শন-ব্যাপারে একপ্রকার সর্বজাগতিক ভিত্তিতেই অনুসন্ধান-কার্য সম্পন্ন হয়েছিল। 'স্কুল-পরিদর্শনের তুলনামূলক আলোচনা'-নামক এক বিবৃতিতে এই অনুসন্ধান-কার্যের ফলাফল সন্নিবেশিত হয়েছে। এরূপ অনুসন্ধান-কার্য সম্পূর্ণ অভিনব—সম্ভবতঃ এরূপ অনুসন্ধান-কার্য এই সর্বপ্রথম অনুষ্ঠিত হয়েছে। বললে অত্যুক্তি হবে না যে, এই বিবৃতিতে 'চীন দেশ হতে পেরু'

---

* বিদ্যালয়-গোষ্ঠী বলতে বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ এবং বিদ্যালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সমস্ত ব্যক্তিকে, যথা—বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ, পরিচালক-মণ্ডলী ও অভিভাবকবৃন্দকে বুঝানো হয়েছে।

পর্যন্ত পৃথিবীর বিভিন্নস্থানে প্রচলিত এই প্রয়োজনীয় শিক্ষা-ব্যবস্থার নানা উদ্দেশ্য, প্রণালী ও পদ্ধতি সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে। ৬৬টি দেশে প্রচলিত স্কুল-পরিদর্শন-পদ্ধতির ধারা এই আলোচনার অন্তভু র্ক্ত হয়েছে ; ফলে এই বিবৃতি খুবই চিত্তাকর্ষক ও অনুপ্রেরণা-প্রদ হয়েছে।

বিভিন্ন দেশে স্কুল-পরিদর্শকের কাজ ঃ

এই অনুসন্ধান-ব্যাপারে মূলনীতি ও অনুশীলনের ক্ষেত্রে যে-ব্যাপক বৈসাদৃশ্য ও প্রায়-অগণিত প্রকারভেদ প্রদর্শিত হয়েছে, তার কথা চিন্তা করলে পরিদর্শকের কর্তব্য ও কার্যাবলীর ধারাবাহিক শ্রেণী-বিভাগের চেষ্টা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। স্কুলের ছাত্রগণের উপ-স্থিতির হারের বৃদ্ধিকরণ থেকে আরম্ভ করে পাঠপ্রদান পর্যন্ত নানা ধরনের অগণিত দায়িত্বের কথা এর মধ্যে বিবৃত হয়েছে। বিদ্যালয়ের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ ও বৃত্তিবিষয়ক উপদেশ-দানের মধ্যে প্রায়শঃই তেমন কোন বাঁধাধরা গণ্ডি নাই। একটি বিষয় অন্যটির উপর গিয়ে পড়ে এবং প্রায়ই এক বিষয়ের প্রাধান্য অন্য বিষয়ের উপর ন্যস্ত হয়। যাহোক, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের শিক্ষা-বিজ্ঞান-সাংস্কৃতিক সংস্থার পরীক্ষা-কার্য সমগ্র জগতে স্কুল-পরিদর্শনের ক্ষেত্র ও প্রকৃতি-বিষয়ে এক অতি চিত্তাকর্ষক বিষয়ের অবতারণা করেছে।

উদাহরণ-স্বরূপ বলতে পারা যায়, ইউক্রেন প্রদেশে স্কুল-পরিদর্শকগণ প্রয়োজন মনে করলে ছাত্রগণের পিতামাতা (এঁরা বিদ্যালয়ের সামাজিক ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে যোগদান করে থাকেন), স্থানীয় সোভিয়েট, কমিউনিস্ট-সঙ্ঘ ও শ্রমিক-সঙ্ঘের সভ্যগণের সহযোগে অনুপস্থিত ছাত্রগণের গৃহও পরিদর্শন করে থাকেন। অধিকাংশ দেশে শিক্ষক-মণ্ডলীর পরিচালনায় হস্তক্ষেপও স্কুল-পরিদর্শকের কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত। ভারতে শিক্ষক-গণের বদলি, পদচ্যুতি ও নিয়োগের ক্ষমতা স্কুল-পরিদর্শকগণের হাতে

ন্যস্ত। ভিয়েৎনামে স্কুল-পরিদর্শক শিক্ষকগণের জন্য পুরস্কার ও সম্মানসূচক খেতাব অনুমোদন করেন। কিউবাতে শিক্ষকগণ যাতে বিদ্যালয়ের সম্প্রসারণ-কার্যে যোগদান করেন, স্কুল-পরিদর্শকগণকে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হয়, এবং জনসাধারণের শিক্ষা-বিধান-কল্পে শিক্ষকগণকে পৌরবিজ্ঞান, অর্থনীতিশাস্ত্র ও সামাজিক বিষয়ে সহজ-বোধ্য ভাষায় বক্তৃতা দিতে হয়। স্কুল-পরিদর্শকগণ বিদ্যালয়গুলির রাজনৈতিক ও ধর্মনৈতিক কার্যাবলীর বিষয় প্রদেশের শিক্ষা-বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের গোচরীভূত করেন।

মেক্সিকোতে স্কুল-পরিদর্শকের কর্তব্য কেবল বিদ্যালয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, তাঁকে জনগণের স্বাস্থ্য ও পারিবারিক জীবনের উন্নতি-কল্পে এবং স্বদেশানুরাগাত্মক ভাব-প্রদর্শন, জাতীয় ভাষার বিশুদ্ধিকরণ, সংক্ষেপে জাতীয় চরিত্রের উৎকর্ষ-বিধানের জন্যও কাজ করতে হয়। ব্রেজিলে স্কুল-পরিদর্শক তিন সপ্তাহ পর পর বিদ্যালয় পরিদর্শন করেন এবং বিদ্যালয়ে পরীক্ষা, রেজিস্ট্রেশান, শিক্ষকের বদলি প্রভৃতি বিষয় পরিচালনা করে থাকেন।

ইংলণ্ড, হল্যাণ্ড ও সুইডেনে স্কুল-পরিদর্শন-কার্য অপেক্ষাকৃত বিলম্বে হয়ে থাকে। ইংলণ্ডে মহামান্যা রাণীর ইন্সপেক্টারগণকে লক্ষ্য রাখতে হয় যে, জনসাধারণের অর্থ যে-সকল উদ্দেশ্যে মঞ্জুর করা হয়, সেই-সকল উদ্দেশ্যেই যেন যথাযথভাবে ব্যয়িত হয়, শিক্ষকগণকে নূতন নূতন বিষয়ে উপদেশ দিয়ে সাহায্য করতে হয় এবং শিক্ষকগণের শিক্ষানবিশি-ব্যবস্থাকে পরিচালনা করতে হয়। অধিকন্তু পরিদর্শক-গণকে স্থানীয় সমস্যা সম্বন্ধে মন্ত্রিপরিষদকে উপদেশ দিতে এবং নূতন শিক্ষা-পদ্ধতি ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্বন্ধে সংবাদ সরবরাহ করতে হয়। শিক্ষা-সংক্রান্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকা ও সরকারী বিবরণী-প্রণয়নের দায়িত্বও তাঁদের।

১৯৪৪ খৃষ্টাব্দের শিক্ষা আইন অনুসারে ইংলণ্ডে পরিদর্শক-বিভাগ পুনর্গঠিত হয়েছে। পরিদর্শকের পদগুলির জন্য নর-নারী উভয়কেই

প্রবেশাধিকার দেওয়া হয়েছে। স্কুল-পরিদর্শকগণের চাকুরি বদলি-সাপেক্ষ, কিন্তু তাঁদের ঘন ঘন বদলি করা হয় না।

মন্ত্রিপরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত সাধারণ নীতি অনুসরণ করে, বিশেষতঃ স্থানীয় শিক্ষা-বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আচরণের ব্যাপারে স্কুল-পরিদর্শকগণ বাহিরের হস্তক্ষেপ এবং রাজনৈতিক বা দলগত প্রভাব হতে বহুল পরিমাণে মুক্ত থেকে কাজ করে থাকেন।

পশ্চিম-জার্মানী প্রজাতন্ত্র রাষ্ট্রে স্কুল-পরিদর্শকগণকে রাষ্ট্রের বিধানগুলি যাতে প্রতিপালিত হয়, তদ্বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হয়। বিদ্যালয়ের পাঠ্যবিষয়বস্তু, পাঠ্যতালিকা ও পাঠন-পদ্ধতির পরিচালনা-বিষয়ে তাঁরা শিক্ষকগণকে উপদেশ দিয়ে থাকেন।

জার্মানীর স্কুল-পরিদর্শন-পদ্ধতির সঙ্গে ফ্রান্সের পদ্ধতির অনেকটা সাদৃশ্য আছে। ফ্রান্সে স্কুল-পরিদর্শকগণ শিক্ষা-সংক্রান্ত সর্বপ্রকার সমস্যা-সমাধানে শিক্ষকগণকে উপদেশ দেন এবং সাহায্য করে থাকেন।

কানাডার স্কুল-পরিদর্শন-পদ্ধতি সাধারণ পদ্ধতি থেকে কতকটা স্বতন্ত্র। সেখানে স্কুল-পরিদর্শককে ক্রমেই প্রশাসনিক দায়িত্ব থেকে নিষ্কৃতি দিয়ে যাতে তিনি শিক্ষকগণের উপদেশ-দানে ও পরিচালনায় অধিক সময় ব্যয় করতে পারেন, তার জন্য উপযোগী করে তোলা হচ্ছে।

অস্ট্রেলিয়ার এক বিবরণী থেকে জানতে পারা যায় যে, সেখানে বিদ্যালয়ে পরিদর্শকের আগমন শিক্ষকগণের মনে এক বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। স্কুল-পরিদর্শক কোন বিদ্যালয়ে এত বেশী সময় থাকেন না যে, সে-সময়ের কধ্যে তিনি তাঁর লব্ধ অভিজ্ঞতার ফল সকলের মধ্যে সঞ্চারিত করতে পারেন। স্কুল-পরিদর্শন-পদ্ধতির এটি অন্যতম প্রধান ত্রুটি। তত্ত্বাবধান-কার্য অপেক্ষা যাতে অধিক উপদেশ প্রদান ও নূতন নূতন বিষয়ে আভাস দান করা হয়, শিক্ষক মশায়গণ তা-ই চান।

ভারতীয় পদ্ধতিঃ

ভারতীয় স্কুল-পরিদর্শন-পদ্ধতি ইংরেজী শিক্ষা-পদ্ধতির আনু-ষঙ্গিকরূপেই গণ্য। এ যাবৎ স্কুল-পরিদর্শন পুরোপুরি শিক্ষা-সম্বন্ধীয় বিষয় না হয়ে সাধারণ প্রশাসনিক ব্যাপারের সংশ্লিষ্ট বিষয়-রূপেই গণ্য হয়ে আসছিল। অনতিকাল পূর্বেও একজন স্কুল-পরিদর্শককে জেলা বা বিভাগীয় শাসকের নিকট হতে উপদেশ নিতে হ'ত। অনেক ক্ষেত্রেই স্কুল-পরিদর্শককে জেলা-ম্যাজিস্ট্রেটের অধীন না হলেও অনুগত থাকতে হত এবং তাঁর বহাল ও বদলি ম্যাজিস্ট্রেটের নির্দেশেই সাধিত হত।

স্কুল-পরিদর্শক প্রশাসন-সংক্রান্ত সাধারণ নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করেই তাঁর বিশেষ দায়িত্ব পালন করবেন, তাঁর কাছ থেকে এই প্রত্যাশাই করা হ'ত। এমন কি, বিদ্যালয়ের আর্থিক সাহায্য এবং শিক্ষকগণের নিয়োগের অনুমোদন প্রভৃতি নিছক বিভাগীয় ব্যাপারেও স্কুল-পরিদর্শককে রাজনৈতিক অথবা প্রশাসনিক প্রয়োজনের কথা বিবেচনা করে চলতে হ'ত। উদাহরণস্বরূপ বলতে পারা যায় যে, যদি কোন বিদ্যালয় ২৬শে জানুয়ারি ত্রিবর্ণ-রঞ্জিত কংগ্রেস-পতাকা-উত্তোলনের দুঃসাহস করত, তাহলে শিক্ষা-বিষয়ক গুণাগুণের কথা চিন্তা না করেই সেই বিদ্যালয়ের নাম সরকারী সাহায্য-তালিকা থেকে নির্বিচারে কেটে দেওয়া হ'ত। যে-সকল শিক্ষক ও ছাত্র জাতীয় আন্দোলনে আগ্রহের সঙ্গে সহানুভূতি দেখাত অথবা যোগদান করত তাদের দুষ্কৃতকারী-রূপে চিহ্নিত করা হ'ত এবং সরকারী চাকুরি বা স্বীকৃতি থেকে বঞ্চিত করা হ'ত। এই অবস্থা বৈদেশিক শক্তি-শাসিত দেশে ছিল অপরিহার্য।

এখনও সেই প্রাচীন ধারা ও পদ্ধতি একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। সরকারী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা-ব্যাপারে পদাধিকার-বলে নির্বাচিত কোন সরকারী কর্মচারীকে প্রধানরূপে থাকতে হবে—

পারতপক্ষে শাসন-বিভাগীয় কর্মচারী থাকাই অধিক বাঞ্ছনীয়। শাসন-ব্যাপারের দিক্ দিয়ে এতে কিছু সুবিধা থাকতে পারে। বর্তমান কণ্ট্রোলের যুগে বেসরকারী কর্মচারী অপেক্ষা পরিচালনা-সমিতির ম্যাজিস্ট্রেট-চেয়ারম্যান শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের প্রসারকল্পে ভূমি অথবা গৃহ-নির্মাণের সরঞ্জাম-সংগ্রহের ব্যাপারে প্রতিষ্ঠানকে অধিকতর সাহায্য করতে পারেন, এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের উপর অধিক প্রভাব বিস্তার করতে পারেন। জেলা-পর্যায়ে স্কুল-ইন্‌স্‌পেক্টার অথবা শিক্ষা-বিভাগীয় কর্মচারী জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট অপেক্ষা নিম্নতর পদে অধিষ্ঠিত। ইচ্ছা করলে শাসনকর্তা শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের ব্যাপারে হস্তক্ষেপও করতে পারেন। স্কুল-পরিদর্শকের ব্যক্তিত্ব স্বাধীনভাবে বর্ধিত ও বিকশিত হবার সুযোগ অপেক্ষাকৃত কম। তিনি পরিপূর্ণ আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে স্বীয় প্রভাব বিস্তার করতে পারেন না।

পরিদর্শন-ব্যাপারে ত্রুটি ঃ

পরিচালনামূলক বিষয়ের উপর অত্যধিক জোর দেওয়ার ফলে স্কুল-পরিদর্শনের গঠনমূলক ও শিক্ষা-বিষয়ক দৃষ্টিভঙ্গীর মূল্য উপেক্ষিত হয়। মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের মামুলী পরিদর্শন-রিপোর্টের নমুনা প্রধানতঃ দুইটি বিষয় সংক্রান্ত ঃ

(১) কোন নব-প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের মঞ্জুরি-দান অথবা পূর্ব-প্রদত্ত অস্থায়ী স্বীকৃতির পুনর্মঞ্জুরি-প্রদান এবং (২) সরকারী সাহায্য (গ্রাণ্ট-ইন্-এড্)-প্রদান অথবা উহার পুনর্মঞ্জুরি। স্কুল-পরিদর্শনের ফরম্‌গুলি সচরাচর হিসাব-নিকাশের খুঁটিনাটিতেই পূর্ণ। স্কুলের ম্যানেজিং কমিটীর গঠন-প্রণালী পরীক্ষা করা হয়, শিক্ষক-মহাশয়-গণের গুণবত্তার বিষয় লক্ষ্য করা হয়, হিসাব-নিকাশ যাচাই করা হয় এবং পরিদর্শন-রিপোর্টের শেষভাগে বিদ্যালয়ের অসংখ্য রকমের বাস্তব বা কল্পিত দোষ-ত্রুটি সাড়ম্বরে দেখানো হয়।

এই-সকল দোষ-ত্রুট অধিকাংশ স্থলেই মামুলী ধরনের, একঘেয়ে

এবং কখনও কখনও বা বান্তর ও অপ্রযোজ্য। বৎসরের পর বৎসর একই ধরনের শর্তের উল্লেখ করা হয়। কলিকাতার তিনটি নির্দিষ্ট বালিকা-বিদ্যালয়ের কয়েক বৎসরের পরিদর্শন-রিপোর্ট নমুনাস্বরূপ গ্রহণ করা যেতে পারে। এই-সকল বিদ্যালয় বালকদের দিবাভাগের বিদ্যালয়ের ভাড়া-বাড়ীতে অধীনস্থ ভাড়াটিয়া-রূপে প্রাতঃকালীন ক্লাস বসিয়ে থাকে। প্রতি বৎসরের আরোপিত শর্তগুলি নিম্নরূপ ঃ

১। শ্রেণী-কক্ষগুলি আরও অধিক প্রশস্ত হতে হবে, যাতে প্রতি ছাত্রীর জন্য মেঝেতে দশ বর্গফুট স্থান-সঙ্কুলান হয়।

২। স্বাস্থ্যবিধি-বিষয়ক ব্যবস্থা উন্নত করতে হবে। ছাত্রীদের জন্য আরও কয়েকটি শৌচাগারের ব্যবস্থা করতে হবে।

৩। যাতে খেলাধূলা ও ব্যায়ামের যথাযথ ব্যবস্থা করা যায়, তজ্জন্য বিদ্যালয়ের একটি নিজস্ব খেলার মাঠ থাকবে।

৪। সব শিক্ষকের স্থলেই অবিলম্বে শিক্ষিকা নিয়োগ করতে হবে।

৫। সঙ্গীত ও ব্যায়ামে শিক্ষাপ্রাপ্ত একজন উপযুক্ত শিক্ষিকা নিয়োগ করতে হবে।

৬। বিদ্যালয়ের পাঠাগারে শিক্ষাদান-বিধি-বিষয়ক আরও অধিক গ্রন্থ রাখতে হবে।

৭। প্রত্যেক শ্রেণীর জন্য একটি করে শ্রেণীগতভাবে স্বতন্ত্র পাঠাগার থাকবে।

৮। বিদ্যালয়ের সর্বশেষ হিসাব-পরীক্ষার রিপোর্টে যে-সকল দোষ-ত্রুটি দেখানো হয়েছে, সেইগুলি, বিশেষ করে যে-সকল শিক্ষক প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডে টাকা জমা দেন, তাঁদের খতিয়ানের হিসাবরক্ষা-ব্যাপারে প্রদর্শিত ত্রুটিগুলি সংশোধন করতে হবে।

এর মধ্যে ৬ষ্ঠ থেকে ৮ম দফা অবশ্য সহজসাধ্য। কিন্তু আরগুলি বিদ্যালয়ের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অর্থহীন নির্দেশ।

প্রশ্ন হচ্ছে, ভাড়া-বাড়ীর কক্ষগুলির সম্প্রসারণ আদৌ সম্ভবপর কিনা এবং সম্ভবপর হলেও তা কতদূর সম্ভবপর? মিউনিসিপ্যালিটি-শাসিত নগরীর ভাড়া-বাড়ীতে অতিরিক্ত শৌচাগার-নির্মাণের সঙ্গে জড়িত আছে উপযুক্ত স্থান, পরিকল্পনা-অনুমোদন এবং মিউনিসিপ্যালিটি-কর্তৃপক্ষের মঞ্জুরি এবং সর্বোপরি দালান-নির্মাণের ব্যাপারে জমির মালিকের সম্মতির প্রশ্ন।

উল্লিখিত মন্তব্যগুলি কয়েকটি নির্দিষ্ট বিদ্যালয় সম্পর্কে লিখিত হলেও প্রকৃতপক্ষে ও-ই হচ্ছে পরিদর্শন-পদ্ধতির সাধারণ ধারা। প্রশাসনিক বিষয় অথবা হিসাবপত্র-নিরূপণ, নথিপত্র-পরীক্ষা, সময়-তালিকার সংশোধন প্রভৃতি নিছক মামুলী কাজেই স্কুল-পরিদর্শকের সময় ও মনোযোগ প্রধানতঃ নিবদ্ধ থাকে। পরিদর্শন-কার্যের শিক্ষমূলক দিক্‌টি প্রায়ই বাদ পড়ে যায়। যদিও বা কিছু চেষ্টা করা হয়, সেই সামান্য চেষ্টা একরকম অনিচ্ছাকৃত ও দায়সারা ভাবেই করা হয়। লিখিত পরিদর্শন-মন্তব্যে প্রায়ই এই ধরনের অস্পষ্ট উক্তি করতে দেখা যায়, যথা—"ইংরেজী যথাযথ-ভাবে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে না। ব্যকরণ-শিক্ষা-বিষয়ে অধিক মনোযোগ দিতে হবে, বাড়ীর জন্য নির্দিষ্ট গণিতের অনুশীলনীগুলি ঠিকভাবে শুদ্ধ করে দেওয়া হয় নাই, ইতিহাস-পাঠনের সময় মানচিত্র দেখাতে হবে" ইত্যাদি। ছাত্রগণকে যথেচ্ছভাবে কতকগুলি প্রশ্ন করে স্কুল-পরিদর্শক অধ্যাপনার গুণাগুণ সম্বন্ধে ধারণা করতে চেষ্টা করেন। ছাত্ররাও আবার স্কুল-পরিদর্শকের উপস্থিতিতে সন্ত্রস্ত হয়ে হয় নীরব থাকে, নয়তো উদাসীন ভাবে উত্তর দেয়। যদিও বা তারা ক্ষিপ্রতার সঙ্গে ও বুদ্ধিমানের মতই উত্তর দেয় তবু স্কুল-পরিদর্শক বিদ্যালয়ে এত অল্পক্ষণ থাকেন যে, এই স্বল্প সময়ের মধ্যে শিক্ষাদান-পদ্ধতির গুণাগুণ ও মান-নির্ধারণ, অথবা শিক্ষকগণের সঙ্গে সংযোগ-স্থাপন, কিংবা বিদ্যালয় সম্পর্কে কোন যথার্থ গঠনমূলক উপদেশ-দান—কোনোটাই সম্ভবপর হয় না।

বিদ্যালয় একটি সজীব প্রতিষ্ঠান-বিশেষ এবং সজীব দেহযন্ত্রের মতই এর ক্ষয় ও বৃদ্ধি আছে। এর শক্তি ও দুর্বলতা সম্বন্ধে প্রকৃত ধারণা লাভ করতে হলে এর উৎপত্তি ও অগ্রগতির স্বাভাবিক ধারার সঙ্গে পরিচিত হতে হবে। বিদ্যালয়-গোষ্ঠী সম্বন্ধে বিশেষ ধারণা থাকার প্রয়োজন। বিদ্যালয়-গোষ্ঠী বলতে বুঝায় পরিচালক-মণ্ডলী, শিক্ষকগণ, ছাত্রগণ ও তাদের পিতামাতা। কেবল যে-কোন একটি স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট দল বা সম্প্রদায়ের যোগ্যতা অথবা আন্তরিকতার উপর কোনো শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের উন্নতি ও মঙ্গল নির্ভর করে না। সহযোগিতা ও সংহতি প্রয়োজন। স্কুল-পরিদর্শকের কর্তব্য হচ্ছে—তিনি বিদ্যালয়ের গঠনক্ষম বিভিন্ন অংশের মধ্যে সহযোগিতা ও সংহতি আনয়ন করতে সাহায্য করবেন। কাজেই পরিদর্শক তাঁদের সহিত প্রত্যক্ষ-ভাবে মেলামেশা করবেন এবং জনসাধারণের সঙ্গে সংযোগ-রক্ষাকল্পে যথেষ্ট সময় নিয়োগ করবেন। এক কথায়, তিনি যে-বিদ্যালয় পরিদর্শন করবেন, তার শিক্ষকমণ্ডলী ও ছাত্রগণের মনে নূতন নূতন ভাব ও উৎসাহবর্ধক চিন্তাধারার প্রেরণাও যোগাবেন তিনি। ইন্‌স্‌পেক্টারের স্কুল-পরিদর্শনের মাধ্যমে বিভিন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে তাঁদের ভাবধারা ও অভিজ্ঞতার প্রত্যক্ষ বিনিময় কেবল সম্ভবপরই নয়, পরন্তু একান্ত বাঞ্ছনীয়।

সমগ্র জগতে শিক্ষার ক্ষেত্রে যে-বিরাট্ পরিবর্তন ঘটছে, তার সঙ্গে সামঞ্জস্য-রক্ষায় স্কুল-পরিদর্শকের ভূমিকাও অভিনব রূপে রূপান্তরিত হচ্ছে। শিক্ষা আজ সমাজতান্ত্রিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। শিক্ষা আজ আর কতকগুলি নির্দিষ্ট শ্রেণী বা দলের একচেটিয়া অধিকার নয়, সামাজিক অথবা অর্থনৈতিক শ্রেণীবিন্যাস-নির্বিশেষে প্রত্যেকেই শিক্ষালাভের অধিকারী। শিক্ষা মানবের অন্যতম মৌলিক অধিকাররূপে বিশ্বজনীন ভাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। স্কুল-পরিদর্শকের কাজ ও দৃষ্টিভঙ্গী সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য

পরিবর্তন অনিবার্যরূপে ঘটছে। তাঁকে এখন কর্তৃত্ব-সূচক শাসনের পরিবর্তে যুক্তিধর্মী পরিচালনার দিকে এবং নিছক নির্দেশ-দান ও ক্ষমতা-প্রয়োগের পরিবর্তে পরামর্শ ও উপদেশ-প্রদানের প্রতিই অধিক মনোযোগ দিতে হবে। বিদ্যালয়-পরিচালনার ব্যাপারে স্কুল-পরিদর্শক এখন আর নিছক তত্ত্বাবধায়ক নন, তাঁকে এখন শিক্ষকগণের বন্ধু, গুরু ও উপদেষ্টা-রূপে উন্নততর ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। স্কুল-পরিদর্শকের প্রধান কর্তব্য দু'টি :

(১) শিক্ষাদান-পদ্ধতির মানোন্নয়ন ও (২) শিক্ষাব্রতীদের মনোবল-সংবর্ধন।

এই কর্তব্য-পালনে স্কুল-পরিদর্শক ও শিক্ষকের মধ্যে একটি অংশীদারত্বের সম্বন্ধ মেনে নিতে হবে। স্কুল-পরিদর্শক ও শিক্ষকের মধ্যে কর্তা ও তাঁবেদার-ধরনের যে-সনাতন সম্পর্ক বিদ্যমান আছে, তার স্থলে সহযোগিতা ও সহায়তার নূতন বোধ জাগ্রত করতে হবে। স্কুল-পরিদর্শকের পদে অধিষ্ঠিত বলে প্রারম্ভিক প্রচেষ্টা তাঁকেই করতে হবে। পরিদর্শকের যদি পদোপযোগী যোগ্যতা থাকে এবং তিনি যদি কর্তৃসুলভ মনোবৃত্তি পরিত্যাগ করে যুক্তিমূলক উপদেশাদি দান করেন, তা হলে শিক্ষক ও তাঁর ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের মধ্যে যে-স্বাভাবিক অপ্রীতিকর ভাব আছে, তা সহজ হয়ে আসতে ও হ্রাসপ্রাপ্ত হতে পারে। শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব স্বতন্ত্র রকমের হতে পারে, এমন কি তাঁর অন্তর্নিহিত শক্তি অনেক ক্ষেত্রে স্কুল-পরিদর্শকের চেয়ে উন্নততরও হতে পারে। পরিদর্শক শিক্ষকগণের উৎকর্ষ-বিধানে উৎসাহ দান করে তাঁর নূতন ভূমিকার গৌরব বাড়াতে পারেন। পরিদর্শকের দৃষ্টিভঙ্গী একান্ত সহানুভূতিপরায়ণ, গঠনমূলক ও বিবেকসম্মত হতে হবে। যিনি শিক্ষকগণের অন্তরে ভীতি ও বিরক্তি সৃষ্টি করেন, তিনি কখনই শ্রেষ্ঠ পরিদর্শক নন। পরন্তু যিনি

শিক্ষকগণকে তাঁদের কার্যের সদুদ্দেশ্য ও গুরুত্ব উপলব্ধি করবার জন্য অনুপ্রাণিত করতে ও তাঁদের কর্তব্য-পালনে প্রকৃত সাহায্য করতে পারেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ পরিদর্শক। এইরূপ গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গীর সাধারণ পটভূমিকায় স্কুল-পরিদর্শনের সমস্যা প্রধানতঃ ছ'টি ভাগে বিভক্ত, যথা—পরিচালনামূলক ও শিক্ষাবিষয়ক।

বর্তমান পরিদর্শন-পদ্ধতির প্রধান গলদ এই যে, এ-পদ্ধতি বিদ্যালয়সমূহের পক্ষে অধিক প্রয়োজনীয় শিক্ষাবিষয়ক দিক্‌টি উপেক্ষা করে পরিচালনামূলক বিষয়ে অধিক মনোযোগ দিয়ে থাকে। নথিপত্র, হিসাব-নিকাশের বিবরণী ও আয়-ব্যয়ের হিসাবপত্র দেখে কোন বিদ্যালয়ের উৎকর্ষের বিচার করা চলে না। মানুষের চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব-গঠনে শিক্ষা কতখানি সহায়ক, তার দ্বারাই শিক্ষার মূল্য ও গুরুত্ব উপলব্ধি করতে হবে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান-গুলিকে যদি ঠিক ঠিক এইভাবেই কাজ করতে হয়, তা হলে শিক্ষার পদ্ধতি ও বিষয়বস্তুর উপরেই সমস্ত মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করতে হবে। শিক্ষকগণ যাতে তাঁহাদের শিক্ষা-পদ্ধতির উৎকর্ষ-বিধান, জ্ঞানের পরিসর বৃদ্ধি এবং বুদ্ধিবৃত্তির দিক দিয়ে ও আধ্যাত্মিক ভাবে নিজেদের উন্নত করতে পারেন, তদ্বিষয়ে তাঁদের সাহায্য ও উৎসাহ দান করতে হবে।

সংগঠনধর্মী পরিদর্শন ঃ

নির্দিষ্ট বিষয়ে শিক্ষা-দানের কথা চিন্তা করলে দেখা যায়, একজন পরিদর্শক সমস্ত বিষয়ে পারদর্শী, এক কথায় সর্ববিদ্যাবিশারদ—না-ও হতে পারেন। স্কুলপাঠ্য সমস্ত বিষয়ের শিক্ষাদান-কার্যের উৎকর্ষ বিধানে সাহায্য করবার মত যোগ্যতা তাঁর না-ও থাকতে পারে। ইংলণ্ড, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড ও অন্যান্য দেশের প্রচলিত পদ্ধতি এই যে, সে-সকল দেশে নিম্নপদস্থ স্কুল-পরিদর্শকগণের একটি কমিটী থাকে এবং প্রধান

স্কুল-পরিদর্শক তার সভাপতি হন। কোন বিদ্যালয়ে একজন স্কুল-পরিদর্শকের পূর্ণাঙ্গ পরিদর্শন দুই, তিন, এমন কি চার দিন পর্যন্ত চলতে পারে। স্কুল-পরিদর্শকের সঙ্গে থাকেন সঙ্গীত, ব্যায়াম, শিক্ষা, খেলাধূলা, কৃষিকার্য প্রভৃতি বিষয়ের বিশেষজ্ঞগণ। তাঁরা যে কেবল বিভিন্ন বিষয়ে পাঠন-পদ্ধতিই নিপুণভাবে লক্ষ্য করেন তা নয়, উপরন্তু আদর্শ-শিক্ষাদান-পদ্ধতিও প্রদর্শন করেন এবং প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি সম্বন্ধে ব্যাপক আলোচনা করেন। সংক্ষেপে পরিদর্শনকার্য একটি সহযোগিতামূলক প্রচেষ্টা। এতে পরিদর্শক ও শিক্ষক উভয়েই সম-অংশীদার।

স্কুল-পরিদর্শকের একটি প্রধান কাজ হ'ল ছাত্রদের অভিভাবক ও জনসাধারণের প্রতিনিধিগণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা। এই-সকল সভা বিদ্যালয় কর্তৃক আহূত এবং বিদ্যালয়েই অনুষ্ঠিত হয়। নতুবা স্কুল-পরিদর্শক স্বয়ংই এর ব্যবস্থা করেন। তিনি ঘুরে-ফিরে বিদ্যালয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এই দেখা-সাক্ষাতের ফলে বিদ্যালয়ের সঙ্গে জনসাধারণের সম্পর্কের উন্নতি-বিধান হয়। ফলে স্কুল-পরিদর্শকও বিদ্যালয় সম্পর্কে জন-সাধারণের মতামত সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ ধারণা লাভ করতে এবং নানা দল বা সম্প্রদায়ের প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারেন। এরূপ মতামত-বিনিময় সর্বসময়েই সুফলপ্রদ। কোন বিদ্যালয়ই বিচ্ছিন্ন অবস্থায় বিকাশ লাভ করতে পারে না। জনসাধারণের সঙ্গে সম্পর্ক ও জনগণের সেবার মাধ্যমেই শিক্ষার সমাজোন্নয়নমূলক উদ্দেশ্যগুলি পুরোপুরি সফলতা লাভ করতে পারে।

ভারত গভর্নমেণ্ট কর্তৃক নিযুক্ত ম্যাধ্যমিক শিক্ষা-কমিশন তাঁদের মনোজ্ঞ রিপোর্টে বিদ্যালয়সমূহের তত্ত্বাবধান ও পরিদর্শনের সমস্যা সম্বন্ধে দুইপৃষ্ঠা-ব্যাপী মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেছেন। কমিশনের মতে একজন স্কুল-পরিদর্শকের প্রকৃত কর্তব্য হ'ল প্রত্যেকটি বিদ্যালয়ের সমস্যাসমূহ অনুধাবন করা, তার সমুদয় কার্য ব্যাপক-

ভাবে লক্ষ্য করা এবং শিক্ষকগণ যাতে তাঁর উপদেশ ও যুক্তি-পরামর্শ অনুসারে কাজ করেন, সে-বিষয়ে তাঁদের সাহায্য করা। এই অভিপ্রায় অনুসারে কমিশন 'স্কুল-পরিদর্শক'-সংজ্ঞার স্থলে 'শিক্ষাবিষয়ক উপদেষ্টা'—এই নামই অধিক পছন্দ করেন। কমিশন ব্যায়াম-শিক্ষা, সঙ্গীত, শিল্পকলা, গার্হস্থ্য বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ের জন্য বিশেষজ্ঞ-নিয়োগের সুপারিশও করেছেন।

কমিশনের মতে যিনি স্কুল-পরিদর্শক নির্বাচিত হবেন, তাঁকে গভীর বিদ্যাবত্তার অধিকারী হতে হবে, অথবা তাঁর প্রায় দশ বৎসর কাল বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকা চাই, অথবা তাঁকে তৎপূর্বে অন্ততঃ তিনবৎসর কোন উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষকের পদে থাকতে হবে। শিক্ষকগণের ট্রেনিং কলেজসমূহের যোগ্য শিক্ষকও স্কুল-পরিদর্শকের পদের যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। শিক্ষা-কমিশন প্রধানশিক্ষক ও ট্রেণিং কলেজের শিক্ষকমণ্ডলীর জন্য স্কুল-পরিদর্শক-রূপে স্বল্প-মেয়াদী কাজেরও সুপারিশ করেছেন। কারণ, এতে তাঁরা স্কুল-পরিদর্শকের অবস্থা উপলব্ধি করতে পারবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের নিজ নিজ অভিজ্ঞতা থেকে বাস্তব অবস্থা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান নিয়ে বিদ্যালয়-পরিচালনা ও শিক্ষাদান-পদ্ধতির সমস্যাসমূহ-সমাধানেও অগ্রণী হতে পারবেন।

স্কুল-পরিদর্শকগণ কিভাবে চলবেন, সে-সম্বন্ধে ধরা-বাঁধা নিয়ম ও পদ্ধতি স্থির করে দেওয়া প্রায় অসম্ভব এবং ততোধিক অবাঞ্ছনীয়। পরিদর্শকের কার্যাবলী কোন নীতি বা উপদেশের একটি সঙ্কীর্ণ গণ্ডির মধ্যে নির্দিষ্ট করে দেওয়াও সম্ভবপর নয়। মোটের উপর, এই কথা বললেই যথেষ্ট হবে যে, বাস্তবধর্মী দৃষ্টিভঙ্গী ও গঠনমূলক প্রয়োগবিধি-সহকারেই পরিদর্শন-কার্য চালান বিধেয়।

কল্যাণকামী রাষ্ট্র

রঘুবংশজ পরমকীর্তিমান মহারাজ দিলীপের গুণবর্ণনাপ্রসঙ্গে মহাকবি কালিদাস 'রঘুবংশ' কাব্যের প্রথম সর্গে বলেছেন ঃ

"প্রজানাং বিনয়াধানাদ্ রক্ষণাদ্ ভরণাদপি।
স পিতা পিতরস্তাসাং কেবলং জন্মহেতবঃ॥"

রাজাই প্রজার পিতা। নিজ পিতা কেবলমাত্র জন্মদাতা। প্রজাপুঞ্জের শিক্ষা, রক্ষণাবেক্ষণ এবং ভরণ-পোষণ ইত্যাদি সবকিছুরই ভার রাজা বা রাষ্ট্র-শক্তির উপর। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনের প্রতিক্ষেত্রে প্রজার কল্যাণের ভার গ্রহণ করেছেন রাষ্ট্রশক্তি। 'ওয়েলফেয়ার' স্টেট বা কল্যাণধর্মী রাষ্ট্রের এই একটি সুস্পষ্ট আদর্শ মহাকবির কাব্যে সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে। আরও একটি পৌরাণিক কাহিনী এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

মহামুনি অগস্ত্যের পরিণীতা পত্নী ছিলেন বিদর্ভ-রাজকন্যা লোপামুদ্রা। বিবাহের পর পাতিব্রত্য-ধর্ম-পালনের জন্য রাজদুহিতা লোপামুদ্রা চীরবাস-পরিধানপূর্বক, নিরালঙ্কারা হয়ে সানন্দে পতির সঙ্গে বনে গমন করলেন এবং আরণ্য আশ্রম-জীবনের যাবতীয় কৃচ্ছ্রতা স্বচ্ছন্দচিত্তে পালন করতে লাগলেন। পরে একদিন নারী-সুলভ বসনভূষণ-প্রিয়তাহেতু পতির নিকট মহার্ঘ বস্ত্রালঙ্কারাদির অভিলাষ জ্ঞাপন করায় মহর্ষি অগস্ত্য বললেন ঃ "প্রিয়ে, আমি দরিদ্র বনবাসী, কোথা থেকে এবং কিরূপে তোমার এই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করব ?" লোপামুদ্রা সবিনয়ে বললেন ঃ "আর্য, আপনি রাজার কাছ থেকে আমার প্রার্থিত দ্রব্যাদি সংগ্রহ করে আনুন।" অগস্ত্য তখন রাজার শরণাপন্ন হলেন। রাজা অগস্ত্য মুনিকে রাজ্যের সমুদয় হিসাব দেখতে দিয়ে নিবেদন করলেন ঃ রাষ্ট্রের তহবিল থেকে আপনি যা গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচনা করেন, তা-ই গ্রহণ করুন। অগস্ত্য রাজ্যের হিসাব-নিকাশ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করে

দেখলেন যে, রাজকোষের একটি কপর্দকও প্রজার কল্যাণ ভিন্ন অন্য কোনও প্রয়োজনে ব্যয়িত হয় না। তখন তিনি সন্তুষ্টচিত্তে অন্যত্র তাঁর প্রার্থিত বস্তুর সন্ধানে গমন করলেন। এই পৌরাণিক আখ্যানের ঐতিহাসিকতা নিয়ে তর্ক তুলে লাভ নাই। কল্যাণ-রাষ্ট্রের স্বরূপ কি, তা বুঝবার পক্ষে এই কাহিনী মূল্যবান।

শাসনসৌকর্য বলে একটা কথার খুব প্রচলন আছে। ভারতে ব্রিটিশ শাসনের কথাই ধরা যাক। জনহিতকর কোন কাজ যে ব্রিটিশ আমলে এদেশে সম্পন্ন হয় নাই এমন নয়। বহুবিধ জনহিতকর কাজ ব্রিটিশ আমলে অনুষ্ঠিত হয়েছিল, কিন্তু সব কিছুরই মূল উদ্দেশ্য ছিল শাসনসৌকর্য। যেমন, যে-রেলপথ নির্মিত হ'ল, তার মূল উদ্দেশ্য ছিল দেশ-প্রতিরক্ষার্থে অকুস্থলে সৈন্যবাহিনীর গমনাগমনের সুবিধা। নূতন ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্তন হ'ল, মূল উদ্দেশ্য হ'ল দেশ-শাসনে ইংরাজী-নবিশ কর্মচারী-নিয়োগ ইত্যাদি। যাবতীয় সরকারী নীতি ও পদ্ধতির মূলে ঐ একই উদ্দেশ্য নিহিত থাকত—শাসনসৌকর্য। কল্যাণধর্মী রাষ্ট্রেও শাসনব্যবস্থা ও শাসকমণ্ডলীর প্রয়োজন আছে। রাষ্ট্র ও গভর্নমেন্ট এক ও অচ্ছেদ্য সত্তা, একটি ভিন্ন অপরটির স্থিতি সম্ভব নহে। শাসনধর্মী ও কল্যাণধর্মী রাষ্ট্রের মূলপার্থক্য এই যে, শেষোক্ত রাষ্ট্রের যাবতীয় শক্তি ও সম্পদ নিয়োজিত হয় প্রজাপুঞ্জের কল্যাণে। যাবতীয় প্রচেষ্টার মূলে থাকে প্রজাপুঞ্জের কল্যাণসাধনেচ্ছ। জন্ম হতে শুরু করে জীবনের প্রতি পদক্ষেপেই রাষ্ট্রানুগত প্রজা রাষ্ট্রের আশ্রয়, রক্ষণ ও সাহায্যের অধিকারী।

বিজ্ঞান-শিল্পের দ্রুত উন্নতির ফলে মানব-সমাজের গড়নে আমূল বিপ্লব ঘটেছে। আরণ্য জীবন ও কৃষি-প্রধান গ্রামীণ সভ্যতার স্থান অধিকার করেছে নগর-জীবন ও শিল্প-সভ্যতা। গ্রামীণ সমাজে যৌথ পরিবার-প্রথা ও সামন্ততন্ত্র এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করত। সামন্ত বা ভূম্যধিকারীই ছিলেন পল্লীসমাজের

শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি। মহানুভব জমিদার ছিলেন তাঁর প্রজার আশা-ভরসার স্থল, বিপদে-আপদে রক্ষাকর্তা ও অবলম্বন। জমিদারই প্রজার জলকষ্ট-নিবারণের জন্য পুষ্করিণী বা কূপ খনন করে দিতেন, অন্নাভাব ঘটবার আশঙ্কায় ধর্মগোলা স্থাপন করতেন, অতিথির জন্য অতিথিশালার দ্বার অবারিত রাখতেন, পীড়িতের জন্য চিকিৎসালয় স্থাপন করতেন, আর নির্মাণ করে দিতেন ধর্মমন্দির, বিদ্যালয়-গৃহ ইত্যাদি। জমিদার বা তৎশ্রেণীর কোন-না-কোন ব্যক্তিকে কেন্দ্র করেই গ্রাম্য সমাজজীবন গড়ে উঠত। জমিদারই প্রকৃত-পক্ষে ছিলেন পল্লীসমাজের ধারক ও নিয়ন্ত্রক। সেই জমিদার যেদিন গ্রাম ছেড়ে শহরে এলেন, সেই দিন থেকেই গ্রাম্য সমাজ-জীবনের প্রধান অবলম্বনের অভাব ঘটল এবং গ্রাম্য জীবনের অধঃপতনেরও সূত্রপাত হ'ল। এই ঘটনা কেবল যে এদেশেই ঘটেছে তা নয়, পরন্তু পৃথিবীর সর্বত্রই অনুরূপ ঘটনা ঘটেছে। ব্যক্তিগত দান-দাক্ষিণ্যের উৎকর্ষ কাব্য ও ধর্মগ্রন্থাদিতে বহুল কীর্তিত হয়েছে। ইসলামীয় শাস্ত্রে আয়ের এক-চল্লিশাংশ আবশ্যিক দান করবার বিধি আছে। জাকৎ ও ফেত্‌র ইসলাম-ধর্মের বিশেষ অনুশাসন। ত্যাগ ও দান পুণ্যার্জনের পন্থা হিসাবে সনাতন হিন্দুধর্মের আদর্শ। খৃষ্টানধর্ম, বৌদ্ধধর্ম, জৈনধর্ম ইত্যাদি সভ্য মানুষের ধর্মমাত্রই ব্যক্তিগত দান-দাক্ষিণ্যের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে থাকে। দাতা ও গ্রহীতা উভয়েই দয়াধর্মের যথাযথ পালনে ধন্য হয়।

ব্যক্তিগত দান-দাক্ষিণ্যের ক্ষেত্রই সম্প্রসারিত হয়ে সংঘ বা প্রতিষ্ঠানগত সেবাকার্যের অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে। খৃষ্টীয় মিশন, ভারতীয় রামকৃষ্ণ মিশন, ভারত সেবাশ্রম সংঘ প্রভৃতি বহু খ্যাত বা অল্প-খ্যাত জনসেবামূলক প্রতিষ্ঠানসমূহ নানাভাবে আর্ত, পীড়িত, দুর্গত ও বঞ্চিতের সেবায় আত্মনিয়োগ করে এবং সেবাধর্ম-পালনের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে সমাজের ধন্যবাদার্হ হয়েছে। দয়া, দান, সেবা

ইত্যাদি সদ্‌গুণ মানুষের চরিত্রের উৎকর্ষসাধন করে, মানুষকে দেবত্বের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে।

কিন্তু ব্যক্তিগত বা সংঘগত দান ও সেবার ক্ষেত্র স্বাভাবিক কারণেই সীমাবদ্ধ। জ্ঞান-বিজ্ঞান-শিল্পের প্রসারের ফলে মনুষ্য-সমাজের বিবর্তন ও প্রগতি সংঘটিত হয়েছে, মানুষের ব্যক্তিগত ও সমাজ-জীবনের সমস্যা বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং জটিল হয়ে উঠেছে। সেই স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্বল্পে তুষ্ট গ্রামীণ মানুষ অপেক্ষা বর্তমান নগরবাসীর জীবন অধিকতর সমস্যাসংকুল। আজ শুধু সেবা আর দান-খয়রাত দ্বারাই মানুষের সব সমস্যার সমাধান সম্ভব হয় না। মানুষকে আজ আত্মশক্তিতে নির্ভরশীল ও স্বাবলম্বী করে তোলাই মুখ্য উদ্দেশ্য। সমাজসেবাই আজ আর যথেষ্ট নয়, সামাজিক নিরাপত্তা (Social Security) এবং সামাজিক সাম্য (Social Justice)-বিধানই যে-কোন সভ্য রাষ্ট্রের লক্ষ্য। রাষ্ট্র ও সমাজ-জীবনের ব্যাপক ক্ষেত্রে নিরাপত্তা ও সাম্যের নীতি সার্থক করে তুলবার শক্তি কোন ব্যক্তি বা সংঘের নাই, থাকাও সম্ভব নয়। রাষ্ট্রকেই এই গুরু দায়িত্ব বহন করতে হয়। বর্তমান যুগের কল্যাণরাষ্ট্রের এই হ'ল লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। এখন প্রশ্ন হ'ল—কি নীতি ও পদ্ধতি অবলম্বন করে বর্তমান যুগের কল্যাণধর্মী রাষ্ট্রগুলি (Welfare States) তাদের প্রজাপুঞ্জের সামাজিক নিরাপত্তা ও সাম্য বিধান করছে? কি সমাজতান্ত্রিক (Socialistic), কি ধনতান্ত্রিক (Capitalistic)—প্রত্যেক প্রকারের রাষ্ট্রই সামাজিক নিরাপত্তা ও সাম্য-বিধানের বিপুল ব্যবস্থা করছে। কল্যাণধর্মী রাষ্ট্ররূপে বিঘোষিত দেশগুলির সমাজসেবা-ব্যবস্থা অনুধাবনযোগ্য।

ব্রিটিশ কমন্‌ওয়েলথ-ভুক্ত কতকগুলি দেশ, স্কান্‌দিনাভীয় (Scandinavian) রাষ্ট্রসমূহ, যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট রাশিয়া প্রভৃতি দেশ এই বিষয়ে অগ্রগণ্য। খুঁটিনাটি বিষয়ে নানা প্রভেদ-পার্থক্য

থাকলেও সাধারণভাবে বলা যেতে পারে যে, মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনের প্রায় প্রতি ক্ষেত্রেই নানা সমস্যা-সমাধানের গুরু দায়িত্ব রাষ্ট্র নিজে বহন করছে।

শিশু ভূমিষ্ঠ হবার পূর্ব হতেই তার আশু কল্যাণের প্রতি রাষ্ট্রের সজাগ দৃষ্টি। আসন্ন মাতৃত্বের আনুষঙ্গিক সমস্যাগুলির যথাযথ সমাধানের জন্য রাষ্ট্র হতে সন্তানসম্ভবা নারী নানা সাহায্যলাভের অধিকারিণী। প্রাক্-প্রসব প্রতিষ্ঠানে বা সাধারণ চিকিৎসালয়ে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ও শুশ্রূষাকারিণীর উপদেশ ও যত্ন তার প্রাপ্য। প্রসবকালীন যাবতীয় বিধিব্যবস্থা সাধারণ প্রসবাগারেই করা হয়। উপরন্তু, কোন কোন দেশে নবজাত প্রতিটি শিশুর জন্য জন্মদাত্রী মাতা রাষ্ট্র-তহবিল থেকে নগদ আর্থিক সাহায্যও পেয়ে থাকে। এই বিশেষ সাহায্য সব দেশেই যে সমানহারে দেওয়া হয় না, সে-কথা বলাই বাহুল্য। ব্রিটিশ কমনওয়েল্থের অন্তর্ভুক্ত অস্ট্রেলিয়া মহাদেশটি জনবিরল। এর আয়তন অখণ্ড ভারতের দ্বিগুণ, অথচ লোকসংখ্যা এক কোটিরও অনূর্ধ। জনবাহুল্যের পরিবর্তে জনবিরলতাই সেখানকার সমস্যা। সেই জন্যই সেখানে Maternity benefit বা মাতৃত্ব-সাহায্য বেশ উদারতার সঙ্গেই প্রদত্ত হয়।

প্রথম নবজাত শিশুর জন্য জননীকে নগদ দশ পাউণ্ড এবং যুগপৎ দুই বা ততোধিক শিশুর জন্ম হলে দ্বিতীয়, তৃতীয়—প্রতিটি শিশু-বাবদ অতিরিক্ত পাঁচ পাউণ্ড করে সাহায্য দেওয়া হয়ে থাকে।

শিশু ভূমিষ্ঠ হবার পর তার যথাযথ লালন-পালনের জন্যও রাষ্ট্রের তহবিল থেকে পিতামাতা বা অভিভাবক-অভিভাবিকা সাহায্য পায়। ষোল বৎসর বয়স পূর্ণ না হওয়া অবধি রাষ্ট্রের প্রতিটি সন্তান এই সাহায্য পাবার অধিকারী। এই সাহায্যকে Child Endowment বা সন্তান-বৃত্তি বলা যেতে পারে। এই সাহায্যের হার বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রকমের।

উল্লিখিত দেশসমূহের প্রত্যেকটিতেই সর্বজনীন ও অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। প্রায় সর্বত্রই ছয় থেকে ষোল বৎসর বয়স পর্যন্ত প্রত্যেকটি বালক ও বালিকাকে স্কুলে শিক্ষালাভ করতে হয়। অন্যথায় পিতামাতা বা অভিভাবক-অভিভাবিকা আইনতঃ দণ্ডনীয়। বিকলাঙ্গ বা অপরিণতমস্তিষ্ক বালক-বালিকারাও বিশেষ বিশেষ প্রতিষ্ঠানের ও বিশেষজ্ঞের ব্যবস্থাপনায় শিক্ষালাভের সুযোগ লাভ করে থাকে। ফলতঃ, শিক্ষালাভের সুযোগ থেকে কেউই বঞ্চিত হয় না।

আবশ্যিক শিক্ষা-সমাপনান্তে যোগ্যতা ও প্রবণতা-অনুযায়ী বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষানবিশি, বৃত্তিমূলক শিক্ষা, কারিগরী শিক্ষা, বাণিজ্যিক শিক্ষা, শিল্প-বিজ্ঞান অথবা সাধারণ কলেজী ও বিশ্ববিদ্যালয়ী শিক্ষা ইত্যাদি বিভিন্ন পথে ও বিভিন্ন ধারায় ছাত্র-ছাত্রীদের পরিচালনা করা হয়। প্রাথমিক শিক্ষা-সমাপনান্তে ছাত্র-ছাত্রীগণের বেশির ভাগই উচ্চতর শিক্ষার দিকে না গিয়ে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করে এবং রুজি-রোজগারের পথ দেখে। শিল্পকেন্দ্রিক সমাজের অসংখ্য বৃত্তি, আর অসংখ্য চাহিদা। সমাজে নানা কাজে নিয়োজিত হয় এরা। ভিন্ন ভিন্ন রকমের কাজে চাই ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের ট্রেনিং। বৈজ্ঞানিক প্রগতির যুগে সর্বত্রই ট্রেনিংপ্রাপ্ত কর্মীর প্রয়োজন। সেই ট্রেনিং দেওয়া হয় শিক্ষানবিশির প্রতিষ্ঠানগুলিতে (Apprenticeship Schools)। কথায় বলে 'জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ'—হেন বিষয় নাই শিক্ষানবিশি-বিদ্যালয়ে যাতে ট্রেনিং দেওয়া হয় না। গৃহস্থালির কাজ, দোকানদারি, ক্ষেত-খামারের কাজ, সেলাই-ফোঁড়াই, গান-নাচ-বাজনা, টাইপ-রাইটিং, রান্না-বান্না, আরো কতো কি বিষয়েই না হাতে-কলমে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে এইজাতীয় প্রতিষ্ঠান-গুলিতে।

লর্ড উইলিয়ম বেভারিজ (William Beveridge) তাঁর

'Full Employment in a Free Society' নামক গ্রন্থে যে-কথাটা প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন, তা হচ্ছে এই যে, রাষ্ট্র বা সমাজকেই প্রতিটি কর্মক্ষম নাগরিকের কর্ম-সংস্থানের ভার গ্রহণ করতে হবে। বহুক্ষেত্রে হচ্ছেও তা-ই। এম্প্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ ও এম্প্লয়মেণ্ট ব্যুরো ইত্যাদি সংস্থাগুলি কর্মসংস্থান-সংক্রান্ত সংবাদ-আদান-প্রদান করে এবং কর্মপ্রার্থীর সঙ্গে নিয়োগকর্তার যোগাযোগ স্থাপন করিয়ে দেয়।

দৈব দুর্ঘটনা অথবা দৈহিক অপটুতা অথবা অন্য কোন ন্যায়সঙ্গত কারণে সাময়িক বা স্থায়িভাবে কর্মচ্যুতি ঘটলে, বেকার-ভাতার ব্যবস্থা আছে। বে-আইনী ধর্মঘটে যোগদান করার জন্য কর্মচ্যুতি ঘটলে অবশ্যই উক্ত সাহায্যের অধিকার থেকে বঞ্চিত হতে হয়। আইনবিরুদ্ধ কার্যকলাপে লিপ্ত হওয়াও বেকার-ভাতা লাভের পরিপন্থী। ব্রিটিশ কমন্‌ওয়েল্‌থ ও ইউরোপের বহু দেশেই পুরুষমাত্রেরই পঁয়ষট্টি এবং স্ত্রীলোকের ষাট বৎসর বয়স পূর্ণ হলেই কর্মান্তিক বৃত্তি (age-pension) দেওয় হয়। কেবল যে সরকারী কর্মচারীরাই এই বৃত্তি পেয়ে থাকে তা নয়, পরন্তু সরকারী বে-সরকারী সকলেই এই বৃত্তিলাভের অধিকারী। এই-সকল আর্থিক সাহায্য-দানের পূর্বে প্রত্যেক গ্রহীতার আর্থিক সঙ্গতির বিষয় ভালভাবেই অনুসন্ধান করা হয়। ব্যক্তিগত বিষয়-সম্পত্তি ও অন্য প্রকারের সঙ্গতি অনুসারে সাহায্যের হার নির্ধারিত হয়। বিত্তশালী, মধ্যবিত্ত ও স্বল্পবিত্ত লোক—কেউই নির্দিষ্ট হারের অধিক সাহায্য পেতে পারে না। বহুবিত্ত ব্যক্তি বহুক্ষেত্রেই আর্থিক সাহায্য-লাভে অনধিকারী বলে বিবেচিত হয়।

পেন্সন-ভোগী বহু বৃদ্ধ-বৃদ্ধাই ওল্ডমেনস্ হোমে (Old Men's Home) বাস করে। ও-সকল দেশের পারিবারিক কাঠামোতে স্বামী-স্ত্রী ও অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তান ভিন্ন অপর আত্মীয়-স্বজনের স্থান নেহাত গৌণ। প্রাপ্তবয়স্ক ছেলে-মেয়েরা নিজেরাই বধূ বা বর

বাছাই করে বিয়ে করে। আর বিয়ের পরেই স্বামী-স্ত্রী পৃথক ভাবে স্বাধীন বাসা বাঁধে। বৃদ্ধ পিতামাতার সঙ্গে সংস্রবটা প্রায়শঃই শিথিল লৌকিকতায় পর্যবসিত হয়ে পড়ে। শহর ও শিল্লাঞ্চলে মধ্যবিত্ত ও স্বল্পবিত্ত লোকের নিজের বাড়ী না থাকাটাই সাধারণ নিয়ম। এমন গৃহহীনের সংখ্যা প্রচুর। পুত্র-পুত্রবধূর সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন গৃহহীন বৃদ্ধ-বৃদ্ধা ওল্ডমেন্‌স্ হোমে আশ্রয় নেয়। বার্ধক্যের বারাণসী না হলেও, ওল্ডমেন্‌স্ হোমগুলির বাসিন্দারা রাষ্ট্রের অনুকম্পায় খাওয়া-পরা, হাতখরচা ইত্যাদি প্রাত্যহিক জীবনের বিবিধ প্রয়োজন মিটাবার দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত।

আত্মীয়-স্বজন-বিহীন দীন-দরিদ্রের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াদির আনুষঙ্গিক ব্যয়ও রাষ্ট্রের তহবিল থেকে বহন করা হয়। এই সাহায্যকে বলা হয় 'ফিউনারেল বেনিফিট' (Funeral Benefit)। অতএব দেখা যাচ্ছে যে, জন্ম থেকে আ-মৃত্যু মানুষের জীবনের যাবতীয় প্রয়োজন মিটাবার ভারই রাষ্ট্র নিজ স্কন্ধে বহন করছে।, বর্তমান সময়ের যে-কোন কল্যাণধর্মী রাষ্ট্রের সমাজসেবা-ব্যবস্থাই উল্লিখিত ব্যবস্থার অনুরূপ।

এই প্রসঙ্গে একটা খুব বড় প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে। কল্যাণধর্মী রাষ্ট্রে প্রজাপুঞ্জের সেবার্থে যে-বিবিধ ব্যবস্থা করা হয়, এর জন্য যে-প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয়, তা কোথা থেকে ও কিরূপে সংগৃহীত হয়? কল্যাণকামী রাষ্ট্র যেমন প্রজাপুঞ্জের হিতসাধনে নিয়োজিত, তেমনি অপরপক্ষে রাষ্ট্রের প্রত্যেক নাগরিককেই হতে হবে রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত ও কর্তব্যপরায়ণ। সমাজসেবায় অথবা সামাজিক নিরাপত্তা-সাধনে যে-বিপুলপরিমাণ অর্থের প্রয়োজন, তা প্রজাগণেরই দেয়। কল্যাণধর্মী রাষ্ট্রের যাবতীয় কল্যাণ-প্রচেষ্টা মূলতঃ সঞ্চারিত হয় জনগণের আগ্রহ ও উদ্যম থেকে। কল্যাণধর্মী রাষ্ট্রগুলির জাতীয় কল্যাণ-তহবিলে প্রত্যেক নাগরিককেই স্ব স্ব আয়ের কিছুটা অংশ আবশ্যিক ট্যাক্স-

হিসাবে দান করতে হয়। মোট রাজস্ব, যা নানারূপ কর ও ট্যাক্স-রূপে আদায় করা হয়, কোন কোন প্রগতিশীল কল্যাণধর্মী রাষ্ট্রে তার শতকরা চল্লিশভাগ পর্যন্ত সমাজসেবার খাতে ব্যয়িত হয়। সমাজসেবা বা সমাজের নিরাপত্তা-বিভাগের যাবতীয় ব্যয়ভার এই তহবিল থেকে বহন করা হয়। এ থেকে অতি সহজেই অনুমান করা যেতে পারে যে, একটি আধুনিক, প্রগতি-পরায়ণ কল্যাণধর্মী রাষ্ট্র কি বিপুলপরিমাণ অর্থ সমাজসেবায় ব্যয় করে থাকে। এই অর্থের সবটাই জনগণ কর্তৃক প্রদত্ত। যাঁরা ধনবান, তাঁরা উচ্চহারে ট্যাক্স দিয়ে থাকেন। আর যাঁরা মধ্যবিত্ত অথবা স্বল্পবিত্ত, তাঁরা অপেক্ষাকৃত কম ট্যাক্স দিয়েও সমাজসেবা-বিভাগের সুযোগ-সুবিধাগুলি সমভাবেই ভোগ করবার অধিকারী। স্ক্যান্‌দিনাভীয় দেশগুলিতে, বিশেষ করে ডেনমার্ক, সুইডেন ও নরওয়ে প্রভৃতি দেশে সমাজসেবা-বিভাগের কাজ অতি সুষ্ঠু ও ব্যাপকভাবে পরিচালিত হয়। ধনী-নির্ধন-নির্বিশেষে রাষ্ট্রের প্রত্যেকটি নাগরিকই শৈশবে লালন, কৈশোরে শিক্ষা, যৌবনে কর্ম-সংস্থান, পীড়িতাবস্থায় শুশ্রূষা ও চিকিৎসা, কর্মান্তিক পেন্‌সন এবং বার্ধক্যে পরিচর্যা নানবিধ অসংখ্য নাগরিক অধিকার উপভোগ করে থাকে। সর্বজনীন সামাজিক নিরাপত্তা-বিধানের ভিতর দিয়ে উল্লিখিত রাষ্ট্রগুলি সামাজিক সাম্যের এক সুন্দর আদর্শ স্থাপন করেছে। রক্তাপ্লুত বিপ্লবকে এড়িয়ে সাম্যবাদ নিজের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। কল্যাণরাষ্ট্রের স্বরূপ এই-সকল দেশের সমাজসেবা-বিভাগের কার্যাবলীর ভিতর দিয়ে সার্থকতা লাভ করেছে।

শিক্ষার সামাজিক লক্ষ্য

আজকের দিনে ভারতবর্ষে শিক্ষার বহুবিধ সমস্যার মধ্যে মাধ্যমিক শিক্ষাই বোধ হয় সবচেয়ে বেশী আলোচিত হচ্ছে। বর্তমান ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সমালোচনা যেমন বহুমুখী, তার সংস্কার ও পুনর্গঠন-বিষয়ে পরামর্শও তেমনি বহুবিধ। মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থার দিকে এত বেশী মনোযোগ কেন আকৃষ্ট হচ্ছে, তার কারণ অবশ্য খুবই স্পষ্ট। কোন জাতি শিক্ষার দিক থেকে যতই অগ্রসর, অর্থ-নৈতিক জীবনে যতই সু-প্রতিষ্ঠিত এবং সাংস্কৃতিক প্রগতিতে যতই উন্নত হোক না কেন, এ-কথা অস্বীকার করা যাবে না যে, তার শিক্ষার্থী-সাধারণের একটা বড় অংশকে মাধ্যমিক স্তর অবধি এসেই শিক্ষা শেষ করতে হয়। তাদের আর সামনে এগিয়ে যাবার সুযোগ থাকে না।

সামান্য কয়েকজনমাত্র উচ্চতর শিক্ষা-দীক্ষার সন্ধানে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের স্তরে পৌঁছাতে পারে। মাধ্যমিক শিক্ষাকে তাই জাতির বৃহত্তম সংখ্যার জ্ঞানস্পৃহা মেটাতে হয় এবং মাধ্যমিক শিক্ষাই প্রকৃতপক্ষে জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার ভিত্তিস্বরূপ। মাধ্যমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও ভাবধারা নাগরিক জীবনের বিন্যাসকে রূপায়িত করে এবং জাতির সাংস্কৃতিক প্রবণতাগুলিকেও প্রভাবিত ও পরিচালিত করে।

বর্তমান পরিস্থিতি ঃ

বোধ হয়, একমাত্র দিল্লী রাজ্য ছাড়া পশ্চিমবঙ্গ সহ ভারতের সমস্ত রাজ্যেই মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলি একই ছকে গঠিত। পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যালয়গুলিকে দু'ভাগে ভাগ করা যায় ঃ উচ্চবিদ্যালয় ও নিম্নতর উচ্চবিদ্যালয় (Junior High School)। এর সঙ্গে আরও দুই ধরনের বিদ্যালয়ের নাম যোগ করা যেতে পারে ঃ উচ্চ-বুনিয়াদী

বিদ্যালয়—যা নিম্নতর উচ্চবিদ্যালয়ের সমগোত্রীয় এবং অধুনাতন এগার বৎসরের সর্বার্থসাধক উচ্চবিদ্যালয় বা উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়। পশ্চিমবঙ্গে সব ধরনের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৫০০-এর কিছু বেশী এবং এগুলিতে ছাত্র রয়েছে মোটামুটি ৭ লক্ষ ৬৫ হাজারের মত। সারা ভারতের গণনায় সব ধরনের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় ৩২,৫০০ আর এগুলিতে পড়াশুনা করে ৮৫,২৬,৫০৯জন ছাত্র। সরকারী সূত্র থেকে মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য ভারতে ব্যয় হয় ৫৩,০১,৯৪,৬১৯ টাকা। দেশবিভাগের পর থেকে পশ্চিমবঙ্গে মাধ্যমিক শিক্ষার প্রচলন ও প্রসার উভয়ই বেড়ে গেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও জনসাধারণের বাস্তব চাহিদার তুলনায় এই-সব বিদ্যালয়ে শিক্ষার যা সুযোগ রয়েছে, তা অপ্রচুর। মোটামুটি হিসাব করলে বলা যায়ঃ পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষার দাবি মেটাতে এখনকার চেয়ে অন্ততঃ তিনগুণ বেশী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রয়োজন। সংখ্যা দিয়ে বলতে গেলে বলা উচিত যে, ১৪ বৎসর বয়স পর্যন্ত সকলের শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হলে ৮০০০ থেকে ৯০০০ মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে জনসংখ্যাবৃদ্ধির দিকটাও মনে রাখতে হবে। যতদূর বোঝা যাচ্ছে, নিকট ভবিষ্যতে দ্বিতীয় ও তার পরবর্তী পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাগুলির মারফৎ শিক্ষার প্রসার হবে সর্বব্যাপক। দেশের সব অংশই কম্যুনিটি ডেভেলপমেন্ট-কর্মপদ্ধতির আওতায় আনা যাবে বলে স্থির করা হয়েছে। পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক ব্যয়বরাদ্দের উপর গুরুতর বিধিনিষেধ আরোপ সত্ত্বেও শিক্ষাখাতে মোট ৩২০ কোটি টাকা বরাদ্দের ভিতর ৬৭ কোটি টাকা মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য কেন্দ্রীয় সাহায্য হিসাবে দেওয়া হয়েছে। রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের খরচের পরিমাণ একত্র করলে তা এতকাল পর্যন্ত শিক্ষার জন্য যা পাওয়া গিয়েছে তার চেয়ে বহুগুণ বেশী হবে। এক পশ্চিমবঙ্গেই শিক্ষাখাতে ব্যয়বরাদ্দ ১৩ কোটি টাকা ছাড়িয়ে গিয়েছে

—যা দেশবিভাগের আগের অখণ্ড বাংলা দেশে শিক্ষা-খাতে খরচের চেয়ে চারগুণ বেশী। এ-সমস্ত ঘটনা অত্যন্তই আশাজনক। এতে তৃপ্তি বোধ করা চলে, এমন কি আশাবাদীও হওয়া চলে।*

কিন্তু উৎকর্ষের দিক দিয়ে দেখলে মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার ও পুনর্গঠন আজকের দিনের চেয়ে আর কখনও এত জরুরী হয়ে ওঠে নাই। মাধ্যমিক শিক্ষার কি সুফল, আর কি গলদ এ-সবের খুঁটিনাটি বিচারের মধ্যে না গিয়েও এক কথায় বলা চলে যে অতীতকে বিদায় দিতে হবে। যে-শিক্ষাব্যবস্থা পরিবর্তনশীল সমাজব্যবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখতে পারে না, তা শিক্ষা-নামেরই অযোগ্য।

সমাজের চাহিদার সঙ্গে মানিয়ে চলতে পারাই শিক্ষা-ব্যবস্থার আসল চরিতার্থতা। যে-মাধ্যমিক শিক্ষার গোড়াপত্তন ঘটেছিল এক শতাব্দী আগের বৃটিশ শাসনব্যবস্থার কতকগুলি চাহিদা মেটাতে, তাকে আগাগোড়া ঢেলে সেজে নতুন ভাবে গড়ে তোলা দরকার। এ-বিষয়ে আর দ্বিতীয় মতের অবকাশ নেই।

ভারতে ইংরেজী শিক্ষার ইতিহাস:

গত শতাব্দীর তৃতীয় দশকে লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্কের আমলে এক সরকারী সিদ্ধান্তের ফলে এদেশে ইংরেজী শিক্ষার সূত্রপাত ঘটে। সরকারের বিজ্ঞপ্তিতে নীতিগত উদ্দেশ্য হিসাবে বর্ণিত হয়েছিল: "ভারতের অধিবাসীদের মধ্যে ইউরোপীয় সাহিত্য ও বিজ্ঞানের অনুশীলনই বৃটিশ সরকারের মহান্ আদর্শহিসাবে গৃহীত হওয়া উচিত।"

এই নীতির গ্রহণ ও প্রয়োগের ফলে দেশে যে-সব

* উপরোক্ত সংখ্যাগুলি ১৯৫৫-৫৬ আর্থিক বৎসর সংক্রান্ত।

বিদ্যালয় স্থাপিত হয়, সেগুলির জনপ্রিয়তা বেড়ে চলে, বিশেষ করে এই কারণে যে, ঐ-সব বিদ্যালয়ে শিক্ষিত ব্যক্তরা অচিরেই যথেষ্ট সুযোগ-সুবিধার অধিকারী হতে সক্ষম হন। তাঁরা একাধারে সরকারী স্বীকৃতি ও সামাজিক সম্মান পেতে লাগলেন এবং সরকারী বা বেসরকারী সমস্ত চাকরিতেই অগ্রাধিকার অর্জন করলেন।

এ-দেশে ইংরেজী শিক্ষার প্রসারে দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য পর্যায় হ'ল ১৮৫৭ সালে তিনটি প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা। বিশ্ববিদ্যালয়গুলির উদ্দেশ্যও ছিল একই ধরনের অর্থাৎ, ইউরোপীয় সাহিত্য ও বিজ্ঞানের অনুশীলন। আর এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ছাত্র যোগান দেওয়াই ছিল, এবং আজও রয়ে গেছে মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির উদ্দেশ্য। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের পরীক্ষার জন্য ছাত্রদের তৈরি করানই সেগুলির অস্তিত্বের প্রধান যুক্তি। ফলে মাধ্যমিক শিক্ষা এদেশে কখনই সমগ্রতা বা স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করতে পারেনি।

বর্তমান ব্যবস্থা :

(১) প্রচলিত মাধ্যমিক শিক্ষার বিরুদ্ধে গোড়াতেই আপত্তি ওঠে এই যে, বাস্তব জীবনের সঙ্গে এর যোগসূত্র অতি ক্ষীণ। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচী আগাগোড়াই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার দিকে লক্ষ্য রেখে রচিত। উচ্চ বিদ্যালয়ের মুষ্টিমেয় ছাত্রই যে উচ্চতর শিক্ষার যোগ্য অধিকারী, এই মোটা কথাটাই বেমালুম এড়িয়ে যাওয়া হয়। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্ররা আত্মবিশ্বাস ও দক্ষতার সঙ্গে ভবিষ্যৎ জীবনের সম্মুখীন হওয়ার মত শিক্ষা-দীক্ষা পাচ্ছে—এমন দৃষ্টান্ত খুবই বিরল।

(২) বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা প্রধানতঃ পুঁথি ও পরীক্ষা-কেন্দ্রিক হওয়ার ফলে ছাত্রদের চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের বিকাশের দিকে সামান্যই গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

(৩) এই শিক্ষাব্যবস্থা একটি মাত্র উদ্দেশ্যের পরিপোষক। শিক্ষার্থীর সুপ্ত সম্ভাবনার অনুশীলন ও বিকাশের কোন সুযোগ এতে থাকে না। একমাত্র ঝোঁক দেওয়া হয় মুখস্থ বিদ্যার দিকে, যাতে পাঠ্যপুস্তকে যে-সমস্ত খবরাখবর থাকে, সেগুলি মুখস্থ করে নিয়ে পরীক্ষার খাতায় উদ্গিরণ করে আসা যায়।

(৪) যৌথভাবে এবং পরস্পরের সহযোগিতায় উন্নতি-সাধনের চেয়ে বেশী মনোযোগ দেওয়া হয় প্রতিযোগিতামূলক কৃতিত্বের দিকে।

(৫) পরীক্ষার উপরেই একমাত্র গুরুত্ব-আরোপের ফলে অন্য সমস্ত বিষয় সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হয়, এবং শিক্ষক ও ছাত্রদের সর্বাধিক উদ্যোগ ও মনোযোগ ঐ একটি উদ্দেশ্যের দিকেই নিবদ্ধ থাকে। সাধারণ ছাত্রেরা পরীক্ষার আতঙ্কে শঙ্কিত থাকে আর শিক্ষা-জীবন আনন্দজনক একটি ব্যাপার না হয়ে বিভীষিকায় পরিণত হয়। শিক্ষা-পদ্ধতিও হয়ে পড়ে যেমন একঘেয়ে, তেমনি গতানুগতিক।

(৬) বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার বিরুদ্ধে সবচেয়ে জোরালো যুক্তি বোধ হয় এই যে, এতে নতুন সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির চাহিদা মেটে না। ভারতবর্ষ আজ প্রাণপণে সবকিছুর ভিতর শৃঙ্খলা আনতে চাইছে। পৃথিবীর অগ্রগামী দেশগুলির সঙ্গে তাল রেখে এগিয়ে যাওয়াই তার সাধনা। তার কঠিন সংকল্প এই যে, চল্লিশ কোটি দেশবাসীর প্রত্যেকেই চারটি মৌলিক স্বাধীনতার অধিকার লাভ করে :

(ক) ভাষা ও ভাব-প্রকাশের স্বাধিকার।

(খ) ধর্মাচরণের স্বাধীনতা।

(গ) অভাব হতে মুক্তি।

(ঘ) শঙ্কা হতে ত্রাণ।

স্বাধীন, ধর্মনিরপেক্ষ এবং গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসাবে ভারতবর্ষ তার ভবিষ্যৎ-গঠনের দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। এই নূতন পরিস্থিতিতে নতুন সমস্যাও দেখা দিয়েছে।

নতুন পরিস্থিতিঃ

এক আমূল পরিবর্তিত পটভূমিতে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা, বিশেষ করে মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থা, নতুন পরিকল্পনায় নতুন করে ঢেলে সাজার আশু প্রয়োজন আছে।

(ক) সর্বপ্রথম প্রয়োজন—প্রাথমিক স্তরে জনসাধারণের মধ্যে যে-ধরনের শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে, তার সঙ্গে মাধ্যমিক শিক্ষা-ব্যবস্থার যোগাযোগ-স্থাপন। মাধ্যমিক ও বুনিয়াদী বা প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে মিল থাকা চাই।

(খ) মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বিচিত্র বিবিধ-বিষয়ক পাঠক্রমের ব্যবস্থা থাকা উচিত, যাতে প্রত্যেক ছাত্রই তার পছন্দ ও যোগ্যতা অনুসারে এগিয়ে যেতে পারে। বর্তমান একমুখী ব্যবস্থার ফলে শিক্ষার ক্ষেত্রে যে ভয়াবহ অপচয় ঘটে, তা সর্বপ্রযত্নে বন্ধ করা দরকার। এই জটিল সমস্যার কার্যকর সমাধানের একমাত্র উপায় হচ্ছে মাধ্যমিক স্তরেই বহুবিধ পাঠক্রম ও সুযোগ-সুবিধার বন্দোবস্ত রাখা।

(গ) ছাত্রদের সবচেয়ে বড়ো অংশই ১৪, ১৫, কিংবা বেশী হলে ১৬ বছর বয়সে বিদ্যালয়ের পড়াশুনা শেষ করে। কাজেই মাধ্যমিক পাঠ্যসূচী সুসমঞ্জস এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়া দরকার। বিদ্যালয়ের পড়াশুনা শেষ করার পর ছাত্ররা যেন শিক্ষা ও আত্মবিশ্বাসের বলে সংসারে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে।

(ঘ) চারু ও কারুশিল্প, ব্যবসায় ও বৃত্তিমূলক বিষয় এবং সাহিত্য ও ললিতকলা—সমস্ত রকম শিক্ষারই সুবন্দোবস্ত থাকা দরকার। শিক্ষার পাঠক্রম এমন হওয়া উচিত, যাতে নীতি ও আদর্শ, প্রাত্যহিক জীবন, সমাজ ও বহির্বিশ্ব—সব-কিছুর চাহিদার স্বীকৃতি থাকে, এবং আদর্শ ও বাস্তবের মধ্যে যেন সমতা রক্ষিত হয়।

(ঙ) বিদ্যালয় হবে গণতান্ত্রিক শিক্ষার অনুশীলন-ক্ষেত্র। প্রতি-

যোগিতামূলক মনোভাবের চেয়ে সহযোগিতামূলক কর্মোদ্যোগেরই আদর বেশী হওয়া উচিত। ছাত্ররা যাতে নিজের নিজের কর্মক্ষেত্রে নেতৃত্বের দায়িত্ব নিতে পারে. মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সেইভাবেই শিক্ষা দেওয়া দরকার।

সহিষ্ণুতা ও মানিয়ে চলার মনোভাবকে উৎসাহিত করে সুস্থ সমষ্টিগত জীবনযাত্রার ভিতর দিয়ে গণতন্ত্রকে গ্রহণ ও ব্যবহার করার শিক্ষা ব্যাপকতর অর্থে বিদ্যালয়েই শুরু হওয়া আবশ্যক। জীবনের প্রারম্ভেই বিদ্যালয়ের আওতায় পঞ্চশীলের মহান্ আদর্শ সাফল্যের সঙ্গে কাজে লাগান যেতে পারে।

(চ) প্রয়োজনীয় বিষয়ে জ্ঞান, অনুসন্ধিৎসা, সামাজিক বৃত্তি-অনুশীলন, সৌন্দর্যোপলব্ধি, রুচিজ্ঞান ও সৃজনী প্রতিভার ক্রম-বিকাশের মারফৎ বর্তমান পুঁথিগত, একপেশে শিক্ষাকে বিদায় দিয়ে ছাত্রদের ব্যক্তিত্বের বিকাশের দিকে মনোযোগ দেওয়া উচিত।

সামাজিক লক্ষ্যের অভাবঃ

পুনরাবৃত্তির মত শোনালেও বলা দরকার যে, প্রাথমিক পর্যায় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত আমাদের সমস্ত শিক্ষালয়ই একটি মাত্র উদ্দেশ্যেই পরিচালিত—পরীক্ষা আর পরীক্ষার জন্য মগজ বোঝাই করা। শিক্ষাকে নিছক পরীক্ষার জন্য তৈরী হওয়ার উপায় হিসাবে না ভেবে জীবনের জন্য তৈরী হওয়ার সুযোগ বলে গ্রহণ করা আশু প্রয়োজন। সারা পৃথিবীতে আজ যে সংকীর্ণ বস্তুতান্ত্রিকতা এবং উচ্চপদ, পুরস্কার আর ক্ষমতা-লাভের জন্য মত্ততা প্রবল হয়ে উঠেছে, আর জীবনের বৃহত্তর লক্ষ্যের প্রতি যে ঔদাসীন্য দেখা দিয়েছে, তাকে বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার বিরুদ্ধে সব-চেয়ে গুরুতর অভিযোগ বলে ধরা চলে। সামাজিক লক্ষ্যের অভাব মনুষ্যত্ব-বিকাশের পক্ষে এক নিদারুণ প্রতিবন্ধক। কিন্তু ভোগসর্বস্ব জীবনের প্রভাব শিক্ষার উপর পূর্ণ আধিপত্য বিস্তার করে রয়েছে।

আমাদের চরিত্রের উপর এই মনোভাবের প্রতিক্রিয়া হয়েছে অত্যন্ত অবাঞ্ছনীয়। এর ফলে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই আমাদের মনে যেমন আসে নঞর্থক দৃষ্টিভঙ্গী, এবং প্রায়ই জনসাধারণের ক্রিয়াকাণ্ডের প্রতি যেমন অবজ্ঞা আর অবিশ্বাস দেখা দেয়, তেমনি সামাজিক দায়দায়িত্ব-পালনের প্রতিও চরম ঔদাসীন্য জাগে।

এমন শিক্ষার দিকে আজ আমাদের লক্ষ্য দেওয়া উচিত, যাতে বিদ্যালয় থেকে গৃহ, গৃহ থেকে সমাজ এবং সমাজ থেকে সারা বিশ্বে তার প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে। চাকরি বা ব্যবসায়ের জন্য প্রস্তুতি শিক্ষার বহুবিধ উদ্দেশ্যের মধ্যে একটিমাত্র।

জীবনের ব্যবহারিক, মানবিক ও আত্মিক চাহিদার মধ্যে সমন্বয়সাধন করে যে শিক্ষাব্যবস্থা, তাকেই বলা চলে আদর্শ শিক্ষা।

বিদেশের লাইব্রেরি

লাইব্রেরিগুলিকে কিভাবে জনশিক্ষার প্রকৃত ধারক ও বাহক-রূপে কাজে লাগানো হচ্ছে, তার সুন্দর দৃষ্টান্ত দেখতে পেলাম অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ডে। সুদূর শ্বেতদ্বীপবাসী ঔপনিবেশিকেরা কিঞ্চিদধিক দেড়শত বৎসরের মধ্যেই এই দুই দেশে বসবাস স্থাপন করে এক সমৃদ্ধিশালী সভ্যতা ও সংস্কৃতির বনিয়াদ রচনা করেছেন। ঐতিহাসিকতার দিক দিয়ে বিচার করলে উভয় দেশই বিশ্বের জাতিসঙ্ঘের অপেক্ষাকৃত তরুণবয়স্ক সদস্য। কিন্তু বয়সের তারুণ্য সত্ত্বেও এরা শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সমাজ-সেবায় পৃথিবীর প্রগতিশীল দেশসমূহের অন্যতম। এ-দেশের পাঠাগারগুলির পরিকল্পনা, সংগঠন ও পরিচালনা এই বহুমুখী প্রগতির এক নির্ভুল নিদর্শন।

অস্ট্রেলিয়ার ছয়টি রাজ্যের প্রধান শহরগুলির প্রত্যেকটিতেই রয়েছে স্টেট লাইব্রেরি। কমনওয়েলথ-রাজধানী ক্যানবেরা শহরে স্থাপিত হয়েছে সেণ্ট্রাল ন্যাশনাল লাইব্রেরি। এই লাইব্রেরিটি অনেকটা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন শহরের বিখ্যাত কংগ্রেস-লাইব্রেরির অনুরূপ। উচ্চতর গবেষণা, রেফারেন্স ও কপিরাইট লাইব্রেরি হিসাবেই এই প্রতিষ্ঠানটির বৈশিষ্ট্য।

ভিক্টোরিয়া রাজ্যের রাজধানী মেলবোর্ণ শহরে থাকাকালে প্রায়ই সেখানকার স্টেট লাইব্রেরিতে গিয়ে পড়াশুনা করবার সুযোগ পেয়েছি। তারপর নিউ সাউথ ওয়েল্‌সের সিড্‌নি শহরে ও নিউজিল্যাণ্ডের রাজধানী ওয়েলিংটনে থাকার সময়েও সেখানকার বড় বড় লাইব্রেরি দেখবার সুযোগ হয়েছিল। স্টেট লাইব্রেরিগুলি সর্বতোভাবেই সরকারী। গ্রন্থাগারগুলি সর্বত্রই নিজস্ব গৃহে অবস্থিত। গ্রন্থাগার-গৃহগুলি সুদৃশ্য ও সুপ্রশস্ত। গৃহগুলির ভাস্কর্য ও বহিঃসজ্জা অনেকটা প্রাচীন গ্রীকপন্থী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধুনালুপ্ত

সেনেট-হাউসের মতো। গৃহটির মধ্যভাগে একটা বিরাট হল-ঘর সাধারণের পাঠগৃহ হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

পাঠগৃহটির সাজসজ্জা সুরুচিসম্পন্ন ও পারিপাট্যপূর্ণ। একসঙ্গে প্রায় চার শত পাঠক-পাঠিকার বসবার বন্দোবস্ত রয়েছে। চারদিকের দেয়াল ঘিরে তিন স্তরে অসংখ্য গ্রন্থরাজি সাজানো আছে। প্রথম স্তরের বই মেঝেতে দাঁড়িয়েই হাত বাড়িয়ে নেওয়া যায়। দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরের বই পেতে হলে সিড়ি বেয়ে উপরে উঠতে হয়। বইগুলি সবই রাখা হয় খোলা শেল্‌ফে।

ছোট, বড়, মাঝারী সর্বসাধারণের এবং বহু স্কুল-কলেজের লাইব্রেরিও দেখেছি। লক্ষ্য করেছি যে, সর্বত্রই লাইব্রেরির বই রাখা হয় খোলা তাকে। আলমারি ও তালা-চাবির বালাই কোথাও নেই। পাঠক-পাঠিকারা স্বচ্ছন্দে যে-কোন বই শেল্‌ফ থেকে পেড়ে নিতে পারেন। খুব দামী ও বিরল বই-পুস্তক গ্রন্থাগারিকের হেফাজতে রাখা হয় এবং তা পেতে হলে তাঁর কাছে আবেদন করতে হয়। সাধারণতঃ বড় বড় গ্রন্থাগারের কাজ নিম্নরূপ কয়েকটি বিভাগে বিভক্ত ঃ

(ক) লেণ্ডিং সেক্‌শন
(খ) রীডিং রুম
(গ) বক্স্ সার্ভিস
(ঘ) ট্রেণিং কোর্স
(ঙ) রিসার্চ অ্যাণ্ড রেফারেন্স সেক্‌শন
(চ) চিল্‌ড্রেন্‌স সেক্‌শন
(ছ) মাইক্রো-ফিল্ম্ ডিপার্টমেণ্ট
(জ) অ্যাক্‌সেসন, ক্যাটালগিং অ্যাণ্ড ক্লাসিফিকেশন।

গ্রন্থাগার-গৃহের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত বড় হল-ঘরটি সর্বসাধারণের পাঠগৃহ। সকাল সাড়ে আটটায় লাইব্রেরির দরজা খোলা হয়,

আর বন্ধ হয় রাত্রি আটটায়। সারাদিন এখানে বসে পড়াশুনা করা যায়। বিরাট হল-ঘরটায় বহুসংখ্যক মেয়ে-পুরুষ বসে পড়াশুনা করছে। বসবার ব্যবস্থাও বেশ আরামদায়ক। প্রত্যেকটি টেবিলের সঙ্গে আছে মোটা গদি-আঁটা চেয়ার। টেবিলের উপর সুদৃশ্য বিজলী বাতির ডোম্। সারা ঘরটার মেঝে পুরু ও মসৃণ লিনোলিয়মের আচ্ছাদনে ঢাকা। কোথাও টুঁ-শব্দটি হবার জো নেই। একটা নিবিড়-নৈঃশব্দ্য ও শান্ত পরিবেশ বিরাজমান। অধ্যয়নের অনুকূল আবহাওয়ায় পাঠকের মন স্বতঃই পাঠানুরাগী হয়ে ওঠে। অল্প কয়েকদিনেই মেলবোর্ণ ও সিড্‌নির স্টেট লাইব্রেরির পাঠগৃহের একটি কোণ যেন একান্ত আপনার হয়ে উঠেছিল। কতো অজস্র বই, আর অধ্যয়নের কি সুবর্ণসুযোগ!

খোলা তাক থেকে যেটা খুশি এবং যতো খুশি বই নেওয়া যায়; কিন্তু নিয়ম হচ্ছে এই যে, বইগুলি আবার শেল্‌ফে তুলে না রেখে হলঘরের প্রবেশ-পথে রক্ষিত বড় টেবিলে রেখে আসতে হবে। পাঠকেরা শেল্‌ফে তুলে রাখতে গিয়ে ক্রমিক নম্বর অনুসারে সাজ্জত বই এদিক-ওদিক করে ফেলতে পারেন, তারই জন্য এই সতর্কতা।

'ইণ্ডেক্স-কার্ড-সিস্টেম'-এ বইগুলির শ্রেণীবিন্যাস। বিষয়বস্তু এবং রচয়িতার নামানুসারে শ্রেণীবিভাগ করা হয়। যে-কোন বই পেতে বেশী দেরি হয় না। তা ছাড়া, শিষ্ট, তৎপর ও ওয়াকেফ্‌হাল গ্রন্থাগার-কর্মীরা সদাই পাঠক-পাঠিকাকে সাহায্য করবার জন্য সচেষ্ট। প্রায় সব বইয়েরই সাত-আট বা তারও বেশী কপি আছে, কাজেই একই সময়ে একাধিক পাঠক একই বই ব্যবহার করতে পারে। ছোট-বড় প্রায় সকল লাইব্রেরিতেই এক বইয়ের একাধিক কপি রাখবার রেওয়াজ দেখেছি।

শহর ও আধা-শহরগুলিতে ও লাইব্রেরির অভাব নেই। তাছাড়া, সরকারী ও বেসরকারী শিক্ষা বা সমাজ-সেবামূলক প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের

সঙ্গেই আছে একটি করে লাইব্রেরি। অবশ্য, এগুলি সব সময়ে সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য নির্দিষ্ট নয়। মিউনিসিপ্যাল আইনানুসারে প্রত্যেকটি পৌরপ্রতিষ্ঠানকে লাইব্রেরি ও সাধারণের পাঠগৃহ পরিচালনা করতে হয়। যে-কোন জায়গার স্থানীয় লোকেরা উদ্যোগী হয়ে একটি সাধারণের গ্রন্থাগার স্থাপন ও পরিচালনা করলে সরকার হতে পরিচালনা বাবদ খরচের অর্ধেক দেওয়া হয়ে থাকে। এইরকম নানাভাবে গ্রন্থাগার-আন্দোলন ও-সব দেশে একটা সক্রিয় জনশিক্ষা-প্রসারী আন্দোলনে পরিণত হয়েছে। দেশের শতকরা নিরানব্বই জন শিক্ষিত নর-নারীর চাহিদা মেটাবার দায়িত্ব এই গ্রন্থাগারগুলির উপর ন্যস্ত রয়েছে।

শহর থেকে বহু দূরে যে-সকল জনবিরল স্থানে লাইব্রেরি-প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে পারে না, সে-সকল স্থানের অধিবাসীদের সুবিধার জন্য স্টেট লাইব্রেরিগুলি 'বক্স-লাইব্রেরি-সার্ভিস' প্রবর্তন করেছে। ইস্পাতের বা কাঠের ছোট ছোট বাক্সে সুনির্বাচিত ১৫।১৬ খানা বিভিন্ন বিষয়ের বই সাজিয়ে প্রত্যেকটি বইয়ের সঙ্গে আবার তার টাইপ-করা সংক্ষিপ্তসার পাঠিয়ে দেওয়া হয় দূরবর্তী পাঠক বা পাঠক-গোষ্ঠীর কাছে।

পাঠকেরা বইগুলির সদ্ব্যবহার করে, ও অন্য বই চেয়ে বাক্সটি ফেরত পাঠিয়ে দেয় একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে। উভয় দিকের ডাক-খরচ বহন করে স্টেট লাইব্রেরি।

প্রতিটি স্টেট লাইব্রেরির সংলগ্ন 'মাইক্রো-ফিল্ম ডিপার্টমেন্ট'-এর কাজটিও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দামী ও দুর্লভ গ্রন্থ—যা সর্বসাধারণকে নিয়ে যেতে দেওয়া হয় না, সেই-সব গ্রন্থের অংশ-বিশেষ ফটোস্টাট করে প্রয়োজন-মত সরবরাহ করা হয়।

বড় বড় লাইব্রেরির প্রায় প্রত্যেকটিতেই শিশু-বিভাগ আছে। স্থানীয় স্কুলের ছেলে-মেয়েরা নির্দিষ্ট দিনে লাইব্রেরিতে বই পড়তে পায়। তাদের বয়স ও শিক্ষার মান-অনুযায়ী নির্বাচিত বই-পত্রিকা

ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে রাখা হয়। লাইব্রেরি থেকে স্কুলগুলিতে একসঙ্গে অনেক বই ধার দেওয়া হয় ছেলে-মেয়েদের ব্যবহারের জন্য।

যে-সব বিদ্যালয় পরিদর্শন করতে গিয়েছি, তার প্রত্যেকটিতেই ছাত্র-ছাত্রীদের উপযোগী লাইবেরির ব্যবস্থা নজরে পড়েছে। পাঠ-গৃহ, খোলা তাকে নির্বাচিত বই আর বিশেষজ্ঞ শিক্ষকদের তত্ত্বাবধান —এই তিনটি জিনিসের যথাযথ ব্যবস্থা সর্বত্রই রয়েছে। লাইব্রেরি-গুলি যাতে সহজেই পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারে, তার জন্য সুসম্পাদিত লাইব্রেরি-বুলেটিন, ছবি, নূতন বইয়ের আকর্ষণীয় ও সুদৃশ্য প্রচ্ছদপটের প্রদর্শনী ইত্যাদির ব্যবস্থাও খুব যত্নের সঙ্গেই করা হয়।

দেশব্যাপী লাইব্রেরি-আন্দোলনকে সার্থক করে তুলতে সুশিক্ষিত গ্রন্থাগার-কর্মীর অবদান অবশ্যস্বীকার্য। স্টেট লাইব্রেরি-গুলিই ট্রেণিং-এর ব্যবস্থা করে। ট্রেণ্ড্ লাইব্রেরিয়ানদের আর্থিক ও সামাজিক পদমর্যাদাও যথেষ্ট উচু। সেদিক দিয়ে যোগ্য ব্যক্তির পক্ষে লাইব্রেরিয়ানের বৃত্তি-অবলম্বনে আগ্রহের অভাব হয় না।

নানা শাখা-প্রশাখায় বিস্তৃত গ্রন্থাগার-আন্দোলনই ও-সব দেশের সর্বজনীন জনশিক্ষার প্রধান বাহন। কিসে লোকে বই পড়বে, কিভাবে নানা জ্ঞাতব্য বিষয়ে জনসাধারণের কৌতূহল বাড়বে, কি উপায়ে ভাল ভাল বই পাঠকের দৃষ্টিপথে আনা যাবে—এইসব ব্যাপার নিয়ে গ্রন্থাগারিকেরা রীতিমতো মাথা খাটিয়ে নানা উপায় উদ্ভাবন করেন।

সাধারণ লোকের মধ্যে বই পড়বার আগ্রহও যথেষ্ট। দৈনিক ও সাময়িক পত্রিকার গ্রাহক এবং নূতন বইয়ের ক্রেতার সংখ্যা মোট জনসংখ্যার অনুপাতে তুচ্ছ জ্ঞান করবার মতো নয়। প্রত্যেকেই নিজে খবরের কাগজ কিনে পড়ে—আড়চোখে

অন্যের কাগজের দিকে তাকিয়ে থাকা, অথবা "দেখি মশায়, আপনার কাগজখানা" বলে অপরের খবরের কাগজখানা টেনে নিয়ে বিনা পয়সায় পড়া—ভদ্রতা-বিরুদ্ধ বলেই এরা মনে করে।

সাধারণ লোকের চলাফেরা ও আচার-ব্যবহারে যে-জিনিষটা সর্বাগ্রে চোখে পড়ে, সেটা হচ্ছে একটা সংযম ও সৌজন্যের ভাব। জাতীয় চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্য গড়ে উঠেছে সর্বজনীন শিক্ষার ভিত্তির উপরে এবং সেই ভিত্তিভূমির শোভাবর্ধন করছে জাতীয় গ্রন্থাগারের সুরম্য সৌধ।

পাঠাগার ও প্রগতি

পাঁচশালা পরিকল্পনার কথা আজ আর কে না জানে? এই পরিকল্পনা অনুসারেই দেশে শিক্ষা, শিল্প ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রসার এবং দেশের আর্থিক অবস্থার উন্নতিসাধনের জন্য চেষ্টা হচ্ছে। নূতন নূতন পাঠাগার-স্থাপন এবং পাঠাগারগুলির উন্নতি-বিধানের ব্যবস্থাও এই পাঁচশালা পরিকল্পনার ভিতরে রয়েছে। দেশের উন্নতি বা অগ্রগতির জন্য পাঠাগারের প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত বেশী। মানুষের আর্থিক অবস্থা যতো ভালই হোক না কেন, মানুষের সম্পদ ও সমৃদ্ধি যতই বাড়ুক না কেন, সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মনের যদি উন্নতি না হয়, তবে তার সমস্ত টাকা-পয়সা, ধন-সম্পদ ও ক্ষমতা কোন কিছুই তার প্রকৃত কল্যাণের কারণ না হয়ে, অকল্যাণ ও সর্বনাশের কারণ হয়ে দাঁড়ায়! একথা কোন একজন মানুষের পক্ষে যেমন সত্য, একটা সমাজ বা জাতির পক্ষেও তেমনি ঠিক। মনের উন্নতি কিভাবে সাধিত হতে পারে? মানুষ কি ভাবে নিত্য নূতন বিষয়ে জ্ঞানলাভ করতে পারে? মানুষ কিভাবে সমাজের ও রাষ্ট্রের প্রতি নিজ কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন থাকতে পারে? কি উপায়ে মানুষ জগতের নানা খবর রাখতে পারে? এই প্রশ্নগুলি খুব গভীরভাবে ভেবে দেখবার বিষয়। যুগ যুগ ধরে মানুষ যে নানা বিষয়ে নূতন নূতন জ্ঞান সঞ্চয় করে আসছে, সে-সব সযত্নে সঞ্চিত আছে বইয়ের পৃষ্ঠায়।

লাইব্রেরি বা পাঠাগারের কাজ হচ্ছে নানা বিষয়ের বই সংগ্রহ করে সর্বসাধারণকে সেই-সব বই পড়বার সুযোগ দেওয়া। লাইব্রেরি মানুষের অক্ষয় জ্ঞান-ভাণ্ডার। অতীত ও বর্তমানের কথা, দেশ ও বিদেশের কথা, সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান, এ-হেন বিষয় নেই, যে-বিষয়ের বই লাইব্রেরিতে না থাকতে পারে। সব বয়সের ও সকল শ্রেণীর মানুষের জন্যই লাইব্রেরির দুয়ার খোলা।

স্কুল-কলেজে বয়স হিসাবে ও কেবলমাত্র যোগ্যতা অনুসারেই ছাত্র-ছাত্রীরা প্রবেশাধিকার পেতে পারে। কিন্তু লাইব্রেরিতে তেমন কোন বাধা-নিষেধ নাই। সেখানে সবারই সমান প্রবেশাধিকার। লাইব্রেরি সত্যিকারের সর্বজনীন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান।

দেশে গত কয়েক বৎসরে শিক্ষার বেশ আশাপ্রদ প্রসার ঘটেছে। বহু নূতন নূতন স্কুল, কলেজ ও উচ্চতর শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। এই-সকল শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যাও বছরের পর বছর দ্রুত বেড়ে চলেছে। দশ বৎসর পূর্বে দেশে লেখা-পড়া-জানা মানুষ ছিল শতকরা মাত্র ১৬ জন, আজ শতকরা প্রায় ৪০ জন মানুষ লিখতে পড়তে শিখেছে। এ দিক দিয়ে দেশের অগ্রগতি মন্দ হয়নি বলতে হবে। তবে সঙ্গে সঙ্গে এ-কথাও স্বীকার করতে হবে এবং মনে রাখতে হবে যে, শিক্ষায় দুনিয়ার অন্যান্য প্রগতিশীল দেশগুলির সমান হতে গেলে আমাদের দেশে শিক্ষার আরও প্রসার চাই।

দেশের সকল মানুষকেই শিক্ষালাভ করতে হবে। কারুরই বাদ থাকা চলবে না। আর শিক্ষা-প্রসারই একমাত্র নয়, সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার মান ও উৎকর্ষ বাড়াতে হবে। তবেই হতে পারে জাতির প্রকৃত কল্যাণ, তবেই সম্ভব হবে জাতির প্রকৃত উন্নতি।

কেবল স্কুল-কলেজের সংখ্যা বাড়িয়ে আর বেশী সংখ্যায় বিভিন্ন পরীক্ষায় ছাত্র-ছাত্রী পাশ করানকেই শিক্ষা-প্রসার বললে ভুল হবে। আমাদের সারাজীবনই শিক্ষার প্রশস্ত ক্ষেত্র। স্কুল-কলেজে যে-শিক্ষাটুকু পেলাম, স্কুল-কলেজ ছেড়ে যদি কোন চর্চা না রাখা যায়, তবে সে-শিক্ষাও অনেকাংশে অকেজো বা নষ্ট হয়ে যায়। সাধারণ যন্ত্রপাতি যেমন সদা সর্বদা যত্নে ও ব্যবহারে চক্চকে ও চালু থাকে, আমাদের শিক্ষাও তেমনি অনুশীলনে বা চর্চায় সজীব ও সার্থক হয়ে ওঠে। অনেক সময় দেখা যায় যে, সাধারণ চাষাভুষো মানুষ হয়তো এককালে স্কুলে দু'-তিন শ্রেণী অবধি

পড়েছিল, কিন্তু স্কুল ছেড়ে দেবার পর সুযোগ-সুবিধার অভাবে আর পড়াশুনার সঙ্গে সম্বন্ধ রাখতে পারেনি, এবং তার ফলে নিরক্ষরের সামিল হয়ে পড়েছে। এ হচ্ছে শিক্ষার ক্ষেত্রে একটা মস্ত বড় অপচয় বা লোকসান। এই অপচয় বন্ধ করতে হলে এবং সকল মানুষকে তাদের রুচি ও প্রয়োজনমত পড়বার, জানবার ও বোঝবার সুযোগ-সুবিধা দিতে হলে চাই সর্বসাধারণের জন্য দেশব্যাপী লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠান এবং তার সুপরিচালনা। জাতির মানসিক উন্নতি ও পরিপুষ্টি এবং আনন্দের জন্য চাই লাইব্রেরি।

খাদ্য মিটায় দেহের ক্ষুধা, আর বই মিটায় মানুষের মনের ক্ষুধা। কবি বলেছেন ঃ

"জোটে যদি মোটে একটি পয়সা
খাদ্য কিনিও ক্ষুধার লাগি,
দু'টি যদি জোটে, তবে অর্ধেকে
ফুল কিনে নিও হে অনুরাগী।
বাজারে বিকায় ফল তণ্ডুল,
সে শুধু মিটায় দেহের ক্ষুধা,
হৃদয়-প্রাণের ক্ষুধা নাশে ফুল,
দুনিয়ার মাঝে সেই ত' সুধা।

কবির কথার একটু পরিবর্তন করে ফুলের জায়গায় বই-শব্দটা বসালে কিছুমাত্র অন্যায় হবে না।

পাঁচসালা পরিকল্পনার নানা কাজের মধ্যে লাইব্রেরি-স্থাপন ও লাইব্রেরির উন্নতিসাধনের কাজও মন্দ হয়নি। গত পাঁচ বৎসরে পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রীয় সাহায্য ও সমর্থনে—

(১) একটি কেন্দ্রীয় রাজ্য-গ্রন্থাগার,

(২) জেলায় জেলায় ১৯টি জেলা-গ্রন্থাগার,

(৩) নির্বাচিত বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে ২৪টি আঞ্চলিক গ্রন্থাগার এবং

(৪) পল্লী-অঞ্চলে থানায় থানায় ৪৬৪টি পল্লী-গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়েছে। এই গ্রন্থাগারগুলির সঙ্গে যুক্ত আছে গ্রন্থ-যান, যার সাহায্যে দূর দূর অঞ্চলে পাঠক-পাঠিকাদের ব্যবহারের জন্য বই সরবরাহ করা হয়।

এ-সব ছাড়াও জনসাধারণের উদ্যোগে ও অর্থানুকূল্যে স্থাপিত গ্রন্থাগারের সংখ্যাও পশ্চিমবঙ্গে আনুমানিক আড়াই হাজার। এ-গুলির মধ্যে প্রায় এক হাজার লাইব্রেরি প্রতি বৎসর কম-বেশী সরকারী সাহায্য পায়। লাইব্রেরি-সংগঠন-পরিকল্পনার কাজ বেশ সন্তোষজনকভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। জনসাধারণও লাইব্রেরিগুলিকে খুব সাদরে গ্রহণ করেছেন। নিত্য-নূতন লাইব্রেরি স্থাপিত হচ্ছে। লাইব্রেরিতে সংগৃহীত পুস্তক-পত্রিকার সংখ্যা বহুগুণে বেড়েছে। আর বেড়েছে লাইব্রেরির পাঠক-পাঠিকার সংখ্যা।

আগামী তৃতীয় পাঁচশালা পরিকল্পনায় লাইব্রেরি-সংগঠনের কাজ আরও বাড়ান হবে বলে স্থির হয়েছে। কলকাতা মহানগরীতে, প্রতি মহকুমা-শহরে এবং প্রতি আঞ্চলিক পঞ্চায়েতে লাইব্রেরি-স্থাপন ও পরিচালনার কথা ভাবতে হচ্ছে এবং তার জন্য যথোপযুক্ত অর্থবরাদ্দের ব্যবস্থাও করা হবে। মোটকথা, আশা করা যায়, অদূর ভবিষ্যতে দেশের প্রত্যেকটি মানুষ যাতে লাইব্রেরিতে পড়ার সুযোগ ও সুবিধা পায়, সেইরূপ ব্যাপক ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভবপর হবে।

গ্রন্থজগতের গহনে

বই-পড়ায় অশেষ গুণ—এ-কথা কে অস্বীকার করে? ইস্কুলের মাস্টার, কলেজের অধ্যাপক, শিক্ষাবিদ্ সবাই তারস্বরে বই পড়ার নানা গুণকীর্তন করছেন। ছাত্রসম্প্রদায়ের উপর পাইকারী উপদেশ বর্ষিত হচ্ছে, "পড় পড়, বই পড়। যত পার বই পড়।" পরীক্ষা-সমুদ্র উত্তীর্ণ হবার একমাত্র নির্ভরযোগ্য তরী হচ্ছে বই। পাণ্ডিত্য জাহির করবার সহজ উপায় হচ্ছে বই। তাই বইয়ের এতো কদর।

আধুনিক মুদ্রাযন্ত্রের প্রসাদে রাশি রাশি বই বাজার ছেয়ে ফেলেছে। কতো চটকদারী বিজ্ঞাপন, কতো রসাল সমালোচনা, কতো চিত্তাকর্ষক দোকানদারি। রাশি রাশি বই, বইয়ের ছড়াছড়ি! কতো রঙীন মনোহারী মলাট, আর কতো কৌতূহলোদ্দীপক শিরোনামা—বইগুলো যেন পড়ুয়াদের দুর্নিবার আহ্বান জানাচ্ছে।

পৃথিবী আজ বাড়তির মুখে। পৃথিবীর লোক-সংখ্যা বেড়েছে। লেখাপড়া-জানা মানুষের সংখ্যা বেড়েছে। বই-পড়ুয়ার সংখ্যাও বেড়েছে।

ইংরাজী ভাষায় লিখিত বইয়ের কথাই ধরা যাক। আজ ইংরাজীই হচ্ছে বিশ্বের ভাষা। দুনিয়ায় সব চাইতে বেশীসংখ্যক বই ছাপা হয় ইংরাজীতে, সব চাইতে বেশী লোক ইংরাজী বই পড়ে। ইংরাজী ভাষা-চর্চার প্রধান পীঠস্থান অবশ্যই গ্রেটব্রিটেন। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড ও কমনওয়েলথ্ভুক্ত অন্যান্য দেশও ইংরাজী ভাষানুশীলনে অগ্রগণ্য। তা ছাড়া ইউরোপীয় দেশগুলিতেও ইংরাজীর কদর দ্রুতবর্ধমান। দুনিয়ার হাটে, ব্যবসায়-বাণিজ্যের লেন-দেনে ও জাতিপুঞ্জের নানা প্রতিষ্ঠানের বাক্-বিতর্কে ইংরাজীর ব্যবহার প্রায় অপরিহার্য। দুনিয়ার প্রতি দশ জন মানুষের মধ্যে একজন ইংরাজী-ভাষী

গত লড়াইয়ের প্রাক্কালে অর্থাৎ ১৯৩৯ সনে কেবল গ্রেট-ব্রিটেনেই বছরে যে-সংখ্যক নূতন বই ছাপা হ'ত, আর এখন যা হয়, তার তুলনামূলক খতিয়ান দেখে বইয়ের বাজারের উঠতি-পড়তি-অবস্থার একটা বেশ আভাস পাওয়া যায়।

১৯৩৯ সনে নূতন প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা ছিল ৯,২০০। স্কুল-কলেজের নির্ধারিত পাঠ্যপুস্তক এই তালিকায় ধরা হয়নি। যুদ্ধের হাঙ্গামায় বইয়ের বাজারে মন্দা দেখা দিল। দুনিয়া-জোড়া যুদ্ধে বোমা-বন্দুকের পসার বাড়ল। বই দিয়ে তো আর লড়াই ফতে করা চলেনা, তাই বই-প্রকাশনের পরিমাণ যথেষ্ট হ্রাস পেল।

১৯৪০ সনে	নূতন প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা—	৬,৫০০
১৯৪১ „	„ „ „ „ —	৩,৩৫০
১৯৪২ „	„ „ „ „ —	২,৯০০

তারপর কয়েক বছরের কোন হিসাব পাওয়া যায় না। কিন্তু ১৯৫০ সনের এক হিসাবে দেখা যায় যে, মন্দা কেটে গিয়ে বইয়ের বাজার আবার বাড়তির মুখে পা বাড়িয়েছে। ১৯৩৯ সনের সংখ্যার উপর শতকরা কুড়ি ভাগ, অর্থাৎ মোট প্রায় ১১,০৩০ খানি নূতন বই গ্রেটব্রিটেনে প্রকাশিত হয়েছে ১৯৫০ সনে। আর গত ছয় বছরে এই সংখ্যার যে আরও বৃদ্ধি ঘটেছে, তাতে কোন সন্দেহই নেই। প্রতিটি বইয়ের হাজার হাজার কপি অসংখ্য সংস্করণে মুদ্রিত হয়ে পৃথিবীর নানা দেশে ছড়িয়ে পড়ছে।

গ্রেট বৃটেনের পলিটিক্যাল ও ইকনমিক প্ল্যানিং নামধেয় সংস্থা (Political and Economic Planning) একটি হিসাব প্রকাশ করেছে। এই হিসাবে গ্রেট বৃটেনের বই-পড়ুয়াদের পাঠস্পৃহার একটা বিষয়ভিত্তিক পরিচয়-প্রদানের চেষ্টা করা হয়েছে—ইংরেজ জাতি আজ কি পড়তে চায়, তাদের পাঠের রুচি আজ কি, কোন্ বিষয়ের বইয়ের চাহিদা বেড়েছে, আর কোন্ বিষয়ের বইয়ের চাহিদা বা কমেছে ইত্যাদি। ১৯৩৯ সনকে স্ট্যাণ্ডার্ড ধরে নেওয়া

হয়েছে। আর সেই স্ট্যাণ্ডার্ডের অনুপাতে ইংরাজী ভাষায় লিখিত ও মুদ্রিত যে যে বিষয়ের বইয়ের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে তার হিসাব—

প্রাক-১৯৩৯ সনের তুলনায় শতকরা

(ক)	শিল্প ও ব্যবসায় বাণিজ্য-বিষয়ক বই—			৮%
(খ)	বৃত্তি-বিষয়ক বই	”	”	৩%
(গ)	চারুশিল্প ও স্থাপত্য	”	”	২%
(ঘ)	সাহিত্য-উপন্যাস ইত্যাদি	”	”	০%

উক্ত হিসাব থেকে এ-কথা মনে করা অনুচিত নয় যে, যুদ্ধোত্তর জগতের মানুষের বিষয়বুদ্ধি প্রখরতর হয়ে উঠেছে। কাব্য-উপন্যাসের কল্পনা-বিলাস ছেড়ে মানুষের মন যেন বাস্তবধর্মী ও অর্থকরী বিদ্যার দিকেই ঝুঁকেছে। মানুষের পাঠ-রুচির বেশ একটা পরিবর্তন ঘটেছে বলে মনে হয়। নাটক-নভেল-কবিতার কারবারে যেন মন্দা পড়েছে। কথাটা নেহাত মিথ্যাও নয়। টমাস হার্ডি, জন গলস্‌ওয়ার্দি, বার্নাড শ’ ইত্যাদি সাহিত্য-ধুরন্ধরগণের তিরোভাবে ইংরাজী সাহিত্যে যে-শূন্যতা দেখা দিয়েছে, সে-শূন্যতা সহজে পূর্ণ হবার নয়। বোধ হয়, ভার্জিনিয়া উল্‌ফ (Virginia Woolfe)-এর কথাই যথার্থ: “An age of genius is always followed by an age of mediocres.” রবীন্দ্রোত্তর বাংলা সাহিত্য-ক্ষেত্রেও এই উক্তি বহুলাংশে প্রযোজ্য।

ইংরাজীর মত অতটা না হলেও বাংলা বইয়ের বাজারও আজকাল বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠেছে। একটা নেহাত আনুমানিক হিসাবে বছরে বাংলা ভাষায় লিখিত ও মুদ্রিত বইয়ের সংখ্যা ন্যূনকল্পে সাড়ে তিন হাজার।

বিয়াল্লিশ সনের মন্বন্তর, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা, স্বাধীনতা ও দেশবিভাগ এতগুলি মহাবিপর্যয় দুর্ভাগা বাংলাদেশের বুকের উপর সংঘটিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণের অব্যবহিত পরে

বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে যে-সাময়িক কালোছায়া নেমে এসেছিল, আজ সেই অন্ধকার কেটে গিয়ে আবার নূতন আলোকচ্ছটার আভাস দেখা যাচ্ছে। অন্ততঃ পরিমাণের দিক দিয়ে বাংলা সাহিত্যের ফলন অপ্রচুর নয়। প্রতি সপ্তাহে এবং প্রতি মাসে যতো নূতন বই ছাপা হচ্ছে তার একটা যথাযথ হিসাব রাখাও বড়ো সোজা কথা নয়। দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও মাসিক পত্রিকাগুলির প্রতি সংখ্যাতেই কিছু না কিছু নূতন বইয়ের আবির্ভাব-সংবাদ বিঘোষিত হচ্ছে। কয়েকটি বিশেষ বিশেষ প্রকাশ-প্রতিষ্ঠান নূতন নূতন বইয়ের সংবাদ-পরিবেশনকল্পে সুদৃশ্য ও সুপাঠ্য প্রচারপুস্তিকা মুদ্রণ ও প্রচার করছেন। বইয়ের বিজ্ঞাপনের ভাষায় ও ভঙ্গীতেও বেশ অভিনবত্ব দেখা যাচ্ছে।

আজ বাংলা সাহিত্যে এমন অনেক লেখকের আবির্ভাব ঘটেছে, যাঁদের বিরামহীন লেখনী নিয়তই নূতন সৃষ্টি করে যাচ্ছে। এঁদের সৃষ্টির প্রাচুর্য দেখে কখন কখন তাক লেগে যায়। একবার গুণে দেখলাম জনৈক লেখক এক বছরের মধ্যে ১২খানা গ্রন্থ লিখেছেন অর্থাৎ গড়ে মাসে এক খানা করে। গ্রন্থগুলির কলেবরও নেহাত উপেক্ষণীয় নয়। পূজা-সংখ্যার খান কুড়ি পত্রিকায় একজন লেখক একাই ২০টি গল্প লিখেছেন। উপন্যাস, বড়গল্প, ছোটগল্প, ভ্রমণকাহিনী আর তথাকথিত রম্যরচনার আধিক্যই বেশী। সঙ্গে কিছুসংখ্যক জীবনী, সমালোচনা-সাহিত্য, কবিতা ইত্যাদিও আছে। বহু লেখকেরই ঝোঁক হচ্ছে বৃহদাকার বই লেখার দিকে। প্রকাশকেরাও তা-ই চায়। বাজারে যে-সকল লেখকের কিছুটা প্রতিষ্ঠা আছে তাঁদের লেখা বড় বই মন্দ কাটে না। বইয়ের দাম হয় বেশ চড়া। অনেকে আবার একাধিক খণ্ডে একই কথার জাবর কাটেন। অতিকায় বইগুলির দৌলতে লেখক ও প্রকাশকের আয়ের অঙ্কটা মন্দ হয় না বটে, কিন্তু পাঠকের হয় প্রাণান্ত। একই কথার অন্তহীন পুনরাবৃত্তি পাঠকের মনকে বহুক্ষেত্রে

পীড়িত ও ভারাক্রান্ত করে তোলে। তবু বইয়ের কাটতি হয় মন্দ না। সরকারের শিক্ষাপ্রসার-পরিকল্পনায় লাইব্রেরিগুলিকে পুষ্ট ও উন্নত করবার চেষ্টা হচ্ছে এবং নূতন লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা দ্বারা দেশ-ব্যাপী বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে সুসাহিত্য-পাঠে জনসাধারণকে অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত করার চেষ্টাও চলছে। বই বিক্রীত হয় প্রধানতঃ লাইব্রেরিগুলিতে এবং সরকারী সাহায্যপুষ্ট শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে। উৎকৃষ্ট সাহিত্য-রচনা এবং উৎকৃষ্ট মুদ্রণে উৎসাহদানকল্পে সরকার নানা পুরস্কার-প্রদানের ব্যবস্থাও করেছেন। ভালো বই-ছাপানর খরচ ক্ষেত্রবিশেষে সরকার বহন করে থাকেন। কোন কোন ক্ষেত্রে ভাল ভাল বই ক্রয় করে শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানে বিতরণ করাও সরকারী পরিকল্পনার বিষয়ীভূত।

নানা দিক দিয়েই বাংলা সাহিত্যিকগণের আজ সুসময়।

জননী বঙ্গভাষা, এ জীবনে
চাহি না অর্থ, চাহি না মান,
যদি তুমি দাও তোমার ও দু'টি
অমল কমল চরণে স্থান।
জান কি জননী, জান কি গো কত
আমাদের এই কঠোর ব্রত,
হায় মা, যাহারা তোমার ভক্ত
নিঃস্ব কি গো মা তারাই তত!

কবির এই খেদোক্তি আজ প্রায় অর্থহীন। মোটামুটি প্রতিষ্ঠাবান সাহিত্যিকের দৈন্যদশা ঘুচে গিয়ে সুদিনের সন্ধান মিলেছে। সাহিত্য-সেবার মাধ্যমে অর্থাগম বোধ হয় এক রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের ভাগ্যেই কিছুটা ঘটেছিল। বর্তমান সময়ে সাহিত্যসেবাকে অবলম্বন করে বহু লেখক বেশ দু'পয়সা রোজগার করছেন। সাহিত্যের দৌলতে বালীগঞ্জে বাড়ী আর একখানা গাড়ি আজ নিতান্ত অলীক স্বপ্ন নয়। উপরন্তু আর্থিক সমর্থন দিচ্ছে

সিনেমার ব্যবসা। বাংলা উপন্যাস প্রায় সবই সিনেমার ঢংয়ে লেখা হচ্ছে। লেখক ও প্রকাশক উভয়েরই উদ্দেশ্য—কিভাবে বইটাকে ফিল্মে রূপান্তরিত করা যায়, আর তা হলেই রাতারাতি বেশ দু'পয়সা-রোজগার হয়।

রাতারাতি বড়লোক হওয়ার নেশায় যেন পেয়ে বসেছে বাংলার ঔপন্যাসিক ও গল্প-লেখকদের! বেশ কয়েকজন উদীয়মান সম্ভাবনা-পূর্ণ সাহিত্যিক তাঁদের সাহিত্য-প্রতিভাকে সিনেমার যূপকাষ্ঠে বলি দিয়ে ফিল্ম-ডিরেক্টর সেজেছেন। উপন্যাস ও গল্প-রচনার আঙ্গিকও হয়েছে সিনেমাধর্মী ও সিনেমাগন্ধী। দুর্গম তীর্থ-ভ্রমণের একখানা কাহিনীর সম্প্রতি বেশ নামডাক হয়েছে। অল্পদিনের মধ্যেই একাধিক সংস্করণও বেরিয়েছে—খ্যাতনামা কতিপয় ব্যক্তি লম্বা লম্বা সার্টিফিকেটও দিয়েছেন। ভাষার উপর দখল এবং রচনা-শৈলীর উৎকর্ষ অবশ্যই স্বীকার্য, কিন্তু লেখক প্রচলিত সিনেমা-ধর্মকে অতিক্রম করতে পারেন নি। অধিকাংশ আধুনিক নাটক-নভেলই অতি-যৌনতার দোষে দুষ্ট, কারণ, অতিযৌনতা ভিন্ন ফিল্ম জমে না। আধুনিক সাহিত্য একদিকে ব্যবসায়বুদ্ধি-প্রণোদিত আর অপরদিকে ফিল্ম-ব্যবসায়ীর আজ্ঞাবহ।

তাই সাহিত্যসৃষ্টির প্রাচুর্য সত্ত্বেও যে-সমস্যাটা আজ প্রকট হয়ে উঠেছে, সেটা হচ্ছে পাঠ্যনির্বাচন-সমস্যা। প্রবল বন্যার জলে সার-অসার বহু পদার্থই ভেসে আসে। আজ সাহিত্য-বন্যার বিপুল উচ্ছ্বাসে তেমনি বহু অসার—হয়তো বা আপাত-মনোহর—জিনিস প্রতিনিয়ত পাঠকচিত্তকে প্রলুব্ধ বা বিভ্রান্ত করছে। কি পড়ি, কোন্ জিনিস পড়ি, বা কি পড়া উচিত—এই প্রশ্ন বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন পাঠকের মনে উদিত হওয়াই স্বাভাবিক। বিপুল গ্রন্থ-প্রাচুর্যের মধ্যে সু-গ্রন্থটি বেছে নেওয়া বড় কম কথা নয়। পুস্তকনির্বাচনে পাঠকের মন কতকগুলি প্রভাবের অধীন হয়ে পড়ে। বাজারে যে-সকল বই বিক্রীত হয়, তার পিছনেও কতকগুলি প্রভাব ক্রিয়াশীল। ইংলণ্ডের

বিখ্যাত প্রকাশন-সংস্থা হরাপ লিমিটেড (Harrap Ltd.) এই বিষয়ে একটা বিশেষ রকমের অনুসন্ধান পরিচালনা করেছিলেন। সেই অনুসন্ধানের ফল এখানে উদ্ধৃত করা গেল ঃ

সমালোচনার গুণে	শতকরা ৫০%	বই	বিক্রীত	হয়
বিজ্ঞাপনের চটকে	„ ২০%	„	„	„
ক্যাটালগের দৌলতে	„ ১২%	„	„	„
ক্যানভাসিং-এর কেরামতিতে	„ ১১%	„	„	„
অন্য বিবিধ কারণে	„ ৭%	„	„	„
	১০০			

সমালোচনা, বিজ্ঞাপন, ক্যাটালগ, ক্যানভাসিং—সব কিছুই কম-বেশী পাঠক-মনকে বইয়ের দিকে আকৃষ্ট করে।

লাইব্রেরি-আন্দোলন-সম্প্রসারণের ফলে ব্যক্তিগত পুস্তকসংগ্রহ আর গৃহ-গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা অনেকটাই হ্রাস পেয়েছে। যুদ্ধোত্তর কালে অন্য পাঁচটা জিনিসের মতো পুস্তকের মূল্যও বেড়েছে অত্যধিক। যাঁরা গ্রন্থরসিক তাঁরাও এই চড়া বাজারে গাঁটের কড়ি দিয়ে বই কিনতে বড় একটা পারেন না। তাই বইয়ের কাটতি হচ্ছে বেশির ভাগ লাইব্রেরিতে, ইস্কুল কলেজ, ক্লাব ও কম্যুনিটি সেণ্টারে। ধনীর গৃহে অন্য দশটা আসবাব পত্রের ন্যায় কয়েক আলমারি বইও সংগৃহীত ও সযত্নে রক্ষিত হয়ে থাকে। কিন্তু জনসাধারণের মধ্যে পুস্তক-পরিবেশনের ভার পড়েছে লাইব্রেরির উপর। সুগৃহিণী যেমন স্বাস্থ্য ও রুচি অনুসারে পরিবারস্থ বিভিন্ন ব্যক্তির জন্য ভিন্ন ভিন্ন ধরনের আহারের ব্যবস্থা করেন, লাইব্রেরিকেও তেমনি বিভিন্ন রুচিসম্পন্ন পাঠকের চাহিদা মিটাবার দায়িত্ব নিতে হবে। একদিকে পাঠকের রুচির সন্তোষবিধান, অপরদিকে সুরুচির সৃষ্টি—উভয়ই লাইব্রেরির কাজ। জ্ঞান-বিজ্ঞানের যুগে লাইব্রেরির দায়িত্ব বেড়েছে অনেকখানি, অবসর-বিনোদনের মালমশলার যোগানদারিই লাইব্রেরির একমাত্র কাজ নয়। পরিবর্তন ও প্রগতিশীল তুনিয়ার বিষয়ে মানুষকে অবহিত

রাখা, নূতন জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে আজকের দিনের মানুষকে পরিচিত করিয়ে দেওয়া, মানুষকে ভাবতে শেখান এবং মানুষকে মনুষ্যত্বের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার গুরু দায়িত্বভার এসে পড়েছে লাইব্রেরির উপর। মানুষের শিক্ষা-সংস্কৃতির ধারক ও বাহকরূপে লাইব্রেরিকে এক অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হচ্ছে। কেবল বই সংগ্রহ আর সরবরাহ করেই লাইব্রেরির করণীয় শেষ হচ্ছে না।

লাইব্রেরিতে কি বই সংগ্রহ করতে হবে, কি ভাবে সেই বই রাখতে হবে, আর কি ভাবে সে-বই পাঠকের মানসিক উৎকর্ষসাধনে সক্রিয় সহায়তা করবে—এগুলি আজ লাইব্রেরি আন্দোলনের বড় বড় প্রশ্ন। কেউ কেউ মনে করেন যে, বইমাত্রকেই লাইব্রেরিতে স্থান দিতে হবে—তা একশো বছরের পুরোনো পঞ্জিকা হ'তে আধুনিকতমা চিত্রাভিনেত্রীর জীবনের রোমাঞ্চকর প্রেম-কাহিনী পর্যন্ত সব কিছুই। লাইব্রেরিমাত্রই আজ স্থানাভাব-সমস্যার সম্মুখীন। লাইব্রেরির কলেবর কতদূর পর্যন্ত বাড়ান যেতে পারে—সে-বিষয়ে নানা গবেষণা হচ্ছে। জেমস ডাফ্ ব্রাউন (James Duff Brown) নামক জনৈক লাইব্রেরি-বিশেষজ্ঞের মতে কোন সর্বসাধারণের বৃহত্তম লাইব্রেরিতে বিশেষ বিশেষ পুস্তকের একাধিক কপি সহ মোট পঞ্চাশ হাজারের অধিক পুস্তক থাকা অবাঞ্ছনীয়। তাঁর এই অভিমত আরও জোরালো কথায় ব্যক্ত হয়েছে। ইংরাজী সাহিত্যের কথাই ধরা যাক। সত্যিকারের পাঠোপযোগী এবং স্থায়িমূল্য-সম্পন্ন বইয়ের সংখ্যা কুড়ি হাজারের বেশী হতে পারে না। বাছা বাছা পাঁচ হাজার বইয়ের একখানা তালিকা প্রণয়ন করতে গেলেই এই উক্তির সত্যতা নিরূপণ করা যায় এবং এই কাজটিও যে খুব সহজ নয়, তা-ও বুঝা যায়। যে-কোন লাইব্রেরিতে গেলেই দেখা যায় যে, এমন কতকগুলি বই আছে, যেগুলি কেবলমাত্র শেলফের স্থান অধিকার করেই নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখছে, কিন্তু পাঠকবর্গের কোন বাস্তব প্রয়োজনেই আসছে না। এমন ক্ষেত্রে সেই অব্যবহৃত ও অকেজো

বইগুলিকে সরিয়ে চলতি ও ব্যবহার্য বইয়ের জন্য জায়গা করায় কোন দোষ নেই। অবশ্য এ-বিষয়ে কিছু সতর্কতাও আবশ্যক। যেমন, যে-বইকে আমরা ক্লাসিক (Classic) বলি, অনেক সময় সেই-সব বইয়ের নিত্য-চাহিদা যে-কোন বেস্ট-সেলার (best-seller) অপেক্ষা অনেক কম। কলকাতার যে-কোন লাইব্রেরিতে যাওয়া যাক—অবশ্যই গীতা অপেক্ষা সিনেমা-সাহিত্যের চাহিদা বহুগুণে বেশী দেখা যাবে। কিন্তু গীতা শাশ্বত, এরমূল্য কালের নিকষে পরীক্ষিত হয়ে গেছে। গীতা রোমাঞ্চকর প্রেম-কাহিনী নয়, সাময়িক কৌতূহল নিবৃত্ত করা-ও গীতার উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু গীতোক্ত বাণী মানবাত্মার চিরন্তন বাণী। কাজেই গীতাকে আবর্জনার মতো অপসারিত করে যৌন সাহিত্য-সংস্থাপনের প্রশ্ন অবান্তর। সৎসাহিত্য কালজয়ী। কালের পরীক্ষায় অপকৃষ্ট সাহিত্য দু'দিন বাদেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়! সেই অপকৃষ্ট সাহিত্যের বোঝা লাইব্রেরির শেল্‌ফ গুলিকে যেন অকারণ ভারাক্রান্ত করে না রাখে।

লাইব্রেরিতে কি জাতীয় বই রাখা উচিত? পুস্তক-নির্বাচনের মাপকাঠি কি? লাইব্রেরি-বিশেষজ্ঞদের গবেষণায় যে-কোন সজীব ও সক্রিয় সাধারণ গ্রন্থাগারের পুস্তকসংগ্রহ-বিষয়ে নিম্নোক্ত ফরমূলাটি (formula) অনুধাবন-যোগ্য:

দর্শন	...	শতকরা	৪	ভাগ
ধর্ম	...	”	৫	”
সমাজবিজ্ঞান	...	”	৭	”
ভাষাতত্ত্ব	...	”	৪	”
বিজ্ঞান	...	”	৯	”
শিল্প	...	”	৯	”
সুকুমার শিল্প	...	”	৭	”
উপন্যাস, গল্প ও কাব্য-সাহিত্য	...	”	২৮	”

ইতিহাস	....	শতকরা	৮	ভাগ
জীবনী	...	"	৮	"
ভ্রমণ	...	"	৮	"
বিবিধ	...	"	৩	"
			১০০	

উল্লিখিত তালিকা অবশ্য কোনোমতেই পুস্তকনির্বাচন-ব্যাপারে অলঙ্ঘ্য অথবা অমোঘ অনুশাসন বলে স্বীকৃত হয় না। পুস্তক-নির্বাচন-নীতি হবে সময়োপযোগী ও পরিবর্তন-সাপেক্ষ। গ্রন্থাগারে গ্রন্থনির্বাচন যেন ফুলবাগিচায় ফুলের চাষ। ফার্সী প্রবচনঃ "বই যেন একখানা বাগান, যা পকেটে বহন করে নেওয়া যায়।" কথাটা অতি সত্য। আগাছা দূর করেই ফুলের চাষ হয়। অপাঠ্য, অবাঞ্ছিত বইয়ের বোঝা সরিয়ে সুপাঠ্য বইয়ের সংগ্রহ ও সরবরাহ দ্বারাই গ্রন্থাগারের উদ্দেশ্য সাধিত হতে পারে।

বই-পড়া ভাল কথা। কিন্তু বই-পড়াই বড় কথা নয়। বই-পড়া নানা রকমের হতে পারে। কেউ বই পড়েন নিছক অবসর-সময় যাপনের জন্য, কারো কারো বই-পড়া নানা প্রাত্যহিক প্রয়োজনের তাগিদে, আবার কেউ বই পড়েন সত্যানুসন্ধানের অনুপ্রেরণায়। কোন বই যোগায় উত্তেজনা ও কৌতূহলের খোরাক, কোন বই পরিবেশন করে নানা সংবাদ ও জ্ঞান, আর কোন বই সঞ্চার করে মহত্ত্বের অনুপ্রেরণা।

গান্ধীজীর জীবনে এমনি অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল খানকয়েক বই। রাসকিনের 'আন টু দিস্ লাস্ট' ('*Unto This Last*' by Ruskin) গ্রন্থখানা তিনি পাঠ করেছিলেন এক দীর্ঘ বিনিদ্র রেল-যাত্রায়। গ্রন্থখানা গান্ধীজীর জীবনে প্রথম যে-অনুপ্রেরণা দিয়েছিল, তারই ক্রম-পরিণতি দেখা যায় তাঁর পরবর্তী জীবনের মহতী কর্ম-প্রচেষ্টায়। রাসকিন ও লিওঁ টলস্টয়ের লেখা বইগুলি গান্ধীজীর জীবনে ঘটিয়েছিল এক মহাবিপ্লব। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর আমূল পরিবর্তন-

সাধন করেছিল কয়েকটি মাত্র বই। গান্ধীজী কোনদিনই গ্রন্থ-কীট ছিলেন না। কিন্তু খানকয়েক বই ছিল তাঁর জীবনের নিত্য-সঙ্গী। 'গীতা' ও 'রামচরিত-মানস' বই দু'খানা আলো-বাতাস-জলের মতোই ছিল গান্ধীজীর জীবনের অপরিহার্য উপাদান। অন্তর দিয়ে তিনি গীতার মর্মবাণীকে উপলব্ধি করেছিলেন এবং গ্রহণ করেছিলেন। গীতার আলোকে এই মহাযোগীর জীবন উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল।

গান্ধীজীর মতোই হার্বার্ট স্পেন্সার, প্যাস্ক্যাল, ডেকার্টিস, রুশো প্রমুখ যুগপ্রবর্তকগণের জীবনীতেও দেখা যায় যে, এঁরা পড়তেন কম, কিন্তু ভাবতেন বেশী। প্রচলিত অর্থে এঁরা কেউই গ্রন্থকীট ছিলেন না। এঁদের পাঠের পরিধি ছিল সঙ্কীর্ণ, পঠিত পুস্তকের সংখ্যাও ছিল নগণ্য। লর্ড মর্লি এঁদের সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন:

"Among other innocent conventions that Herbert Spencer resisted, he read a few books. There is something no doubt to be said for this in one aspiring to found a system. There are men who have lost themselves by reading too much. They find that everything has been said. 'It is after all the ignorant like Pascal, like Descartes, like Rousseau, who had read little, but who thought and dared'—those are the men who make the world go."

সেরূপ গ্রন্থপাঠই সার্থক, যা মানুষকে মহৎ কাজ ও মহতী চিন্তায় অনুপ্রেরণা দেয়।

জন-সাহিত্যের সংজ্ঞা

চাষী ক্ষেতে চালাইছে হাল,
তাঁতি বসে তাঁত বোনে, জেলে ফেলে জাল—
বহুদূর প্রসারিত এদের বিচিত্র কর্মভার,
তারি 'পরে ভর দিয়ে চলিতেছে সমস্ত সংসার।
মাঝে মাঝে গেছি আমি ও পাড়ার প্রাঙ্গণের ধারে,
ভিতরে প্রবেশ করি সে শক্তি ছিল না একেবারে।
জীবনে জীবন যোগ করা
না হ'লে কৃত্রিম পণ্যে ব্যর্থ হয় গানের পশরা।

—রবীন্দ্রনাথ

সুদীর্ঘ জীবনের শেষপ্রান্তে দাঁড়িয়ে কবি যে-আক্ষেপোক্তি করলেন, তার ভিতর দিয়ে এক অতি অকাট্য সত্য ব্যক্ত হয়ে উঠেছে। কবি আর সাহিত্যিক নিজের খেয়ালের বশে যে-কাব্য, সাহিত্য রচনা করে যান, যে-আনন্দের খোরাক তাঁরা পরিবেশন করেন, তার গ্রহীতা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই শিক্ষিত ও বিদগ্ধ জন।

"অরসিকেষু রসস্য নিবেদনম্
শিরসি মা লিখ"...

কাব্য ও সাহিত্যরস-স্রষ্টার মনের গোপনে এই ভাবটি বহু ক্ষেত্রেই প্রচ্ছন্ন থাকে। আমার লেখা গুণজ্ঞ, রসজ্ঞ জন কর্তৃক সমাদৃত হোক—লেখকমাত্রেরই এই হচ্ছে পরম কাম্য। মহাকবি কালিদাস বিক্রমাদিত্যের রাজসভার গুণিজনের মনোরঞ্জনে যে-কাব্যের সৃষ্টি করেছিলেন, সে-কাব্যসুধা যুগে যুগে মানুষের রসতৃষ্ণা পরিতৃপ্ত করেছে। রাজা-রাজড়া, ধনী ও অভিজাত মহলের পৃষ্ঠপোষকতার উপর নির্ভর করতেন সেকালের কবি, সাহিত্যিক ও শিল্পী। তাই বলে তাঁদের সৃষ্ট কাব্য ও সাহিত্যে সব সময়েই যে রাজা-রাজড়া ও সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায়ের স্তুতিগাথামাত্রেই পর্যবসিত হ'ত, তা ঠিক

নয়। পরন্তু 'রাজাসভার' বহু কবির কাব্যই মানুষের শাশ্বত মানস-সম্পদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তাঁদের কালজয়ী রসোত্তীর্ণ সৃষ্টি যাবচ্চন্দ্রদিবাকর অমরত্ব অর্জন করেছে। সে-দিক দিয়ে 'রাজসভার' সাহিত্যের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই। কিন্তু একটা প্রশ্ন বা অভিযোগ হচ্ছে এই যে, কালিদাস, সেক্সপীয়র ও রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি প্রকৃত জনসভার সাহিত্য কিনা? যে-বৃহত্তর জনসমাজের অবস্থান শিক্ষা-সংস্কৃতির উচ্চ সৌধশীর্ষের বহু নীচে, তাদের কাছে কালিদাস, সেক্সপীয়র ও রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যরসের আবেদন কতটুকু—এই প্রশ্নটাই রবীন্দ্রনাথের সংবেদনশীল চিত্তকে ক্ষুব্ধ ও আন্দোলিত করেছে। সাহিত্যিক জীবনের এত বড় অপূর্ণতার বেদনায় তিনি বললেন:

কৃষাণের জীবনের শরিক যে জন
কর্মে ও কথায় সত্য আত্মীয়তা করেছে অর্জন,
যে আছে মাটির কাছাকাছি,
সে কবির বাণী লাগি কান পেতে আছি

* * *

এসো কবি, অখ্যাত জনের
নির্বাক মনের
মর্মের বেদনা যত করিয়া উদ্ধার
প্রাণহীন এ দেশেতে গানহীন যেথা চারিধার,
অবজ্ঞার তাপে শুষ্ক নিরানন্দ সেই মরুভূমি
রসে পূর্ণ করি দাও তুমি।

রবীন্দ্রনাথের মর্মোপলব্ধি ভারতের বর্তমান পরিস্থিতিতে এক অত্যন্ত জরুরী জাতীয় তাগিদের রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। ভারত আজ সার্বভৌম স্বাধীন রাষ্ট্র। ভারতের প্রত্যেক নাগরিক পূর্ণ রাজনৈতিক ও সামাজিক অধিকারের অধিকারী। জাতীয় পুনর্গঠন-পরিকল্পনায় জনসাধারণের মধ্যে অতি দ্রুতগতিতে শিক্ষা

প্রসার লাভ করছে। প্রাথমিক, বুনিয়াদী, মাধ্যমিক, বিশ্ববিদ্যালয়ী এবং আরও উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্র আজ চতুর্দিকেই বিস্তারিত হচ্ছে। ভারতীয় সংবিধানের এক আবশ্যিক শর্ত অনুসারে ছয় হতে চৌদ্দ বৎসর বয়স পর্যন্ত প্রত্যেক বালক-বালিকার শিক্ষা-ব্যবস্থার দায়িত্ব রাষ্ট্র গ্রহণ করেছে। বিগত দশ বৎসরের মধ্যেই এই শর্ত পুরোপুরি না হইলেও অনেকাংশেই পূরণ হয়েছে। ভারতের আপামর জনসাধারণের মধ্যে আজ সর্বজনীন শিক্ষার প্রসার কেবল নীতি হিসাবেই গৃহীত হয় নাই, বাস্তবরূপেই কার্যকর করে তোলা হচ্ছে। নিরক্ষরতার কলঙ্কমোচন জাতীয় অগ্রগতির প্রথম পদক্ষেপস্বরূপ। আজ এই বিরাট্ জাতীয় সমস্যা-সমাধানের উদ্যোগ শুরু হয়েছে।

শিক্ষার প্রসার ও নিরক্ষরতা-নিরসনের সঙ্গে সঙ্গে যে-সমস্যাটা খুব গুরুতর রূপেই আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়, সেটা হচ্ছে সদ্যলব্ধ শিক্ষার স্থায়িত্ববিধান, নবার্জিত অক্ষর-পরিচয়কে বৃহত্তর শিক্ষার উপায়রূপে ব্যবহার। সেই জন্যই আজ নতুন-পড়ুয়াদের পাঠোপযোগী সাহিত্যের এত প্রয়োজন। বিশেষ বিশেষ বৃত্তি-মূলক শিক্ষার শেষে হাতে-কলমে শিক্ষানবিশির যেমন প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন প্রাথমিক বা প্রথম পর্যায়ের শিক্ষার শেষে পরবর্তী অনুশীলনের। সযত্নরোপিত শিশু তরুর স্থায়িত্ব নির্ভর করে পরিচর্যার উপর।

জাতীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে সত্যি সত্যি সর্বজনীন করে তুলতে এবং জাতির প্রত্যেক নরনারীকে বৃহত্তর শিক্ষালাভের সুযোগ-সুবিধা দিতে জন-সাহিত্যের অপরিহার্য প্রয়োজন। জন-সাহিত্য জিনিসটা কি? এ-প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাওয়া যায় ইতিহাসের পাতায়। ভগবান বুদ্ধের বাণী জগৎময় প্রচারিত হয়েছিল সাধারণ মানুষের মুখের ভাষায়। হিব্রু ও ল্যাটিন ভাষা হ'তে বাইবেল ভাষান্তরিক হয়েছিল ইংলণ্ডের চলতি ভাষায় রাজা অষ্টম হেনরির

রাজত্বকালে। জনসাধারণের ভাষায় বাইবেল-রচনার ভার অর্পিত হয়েছিল এক বিশেষজ্ঞ কমিটীর উপর। বাইবেলের ইংরাজী আজ আমাদের কাছে কিছুটা অদ্ভুত বোধ হলেও, তদানীন্তন ইংরাজী ভাষার স্ট্যাণ্ডার্ডে অত্যন্ত সহজ, সরল এবং প্রচলিত গ্রন্থই হচ্ছে বাইবেল। জনপ্রিয়তা ও প্রচলনের দিক দিয়ে বাইবেলের অনুরূপ ভারতীয় ভাষার রচিত যে-দু'-একখানা বইয়ের নামোল্লেখ করা যায়, তা হচ্ছে হিন্দী তুলসীদাসী 'রাম-চরিত-মানস' আর বাংলা কৃত্তিবাসী 'রামায়ণ' ও কাশীদাসী 'মহাভারত'।

কবি কাশীরাম দাসের উদ্দেশে বিরচিত মাইকেল মধুসূদনের সনেটটি স্মরণযোগ্য ঃ

চন্দ্রচূড়-জটাজালে আছিলা যেমতি
জাহ্নবী, ভারত-রস ঋষি দ্বৈপায়ন
ঢালিয়া সংস্কৃত হ্রদে রাখিলা তেমতি—
তৃষ্ণায় আকুল বঙ্গ করিত রোদন।
কঠোর গঙ্গায় পূজি ভগীরথ ব্রতী
পবিত্রিলা আনি মায়ে, এ তিন ভুবন ;
সেইরূপ ভাষা-পথ খননি স্ববলে
ভারত-রসের স্রোতঃ আনিয়াছ তুমি
জুড়াতে গৌড়ের তৃষা সে বিমল জলে।

ভাষার আভিজাত্য ও কৌলিন্যের নিগড় ছিন্ন করে সহজ মুক্ত ছন্দে সাহিত্য-পরিবেশন সর্বজনীন শিক্ষা-প্রসারের একটি প্রকৃষ্ট উপায়।

নতুন আঙ্গিক ঃ

আজকাল এক নতুন আঙ্গিকে স্বল্পশিক্ষিত বৃহত্তর জনসমাজের উপযোগী সাহিত্য-রচনার তাগিদ দেখা যায়। ইংলণ্ডের ন্যায় প্রগতিশীল দেশেও বিশ্ববিদ্যালয়গুলির Extra-Mural Department

(লোকশিক্ষা-বিভাগ) হ'তে এইরূপ সহজ জনসাহিত্য-সৃষ্টির সাগ্রহ চেষ্টা হচ্ছে। অস্ট্রেলিয়ার সিড্‌নী বিশ্ববিদ্যালয়ের লোক-শিক্ষা-বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তিকাগুলি যেমন ভাষার সারল্যে সুখপাঠ্য, তেমনি বিষয়-বৈচিত্র্যে উপভোগ্য। এই-সব সাহিত্য-রচনায় নিয়োজিত হন সে-সব দেশের বিভিন্ন বিষয়ের বিশেষজ্ঞগণ। বিশ্বভারতী কর্তৃক প্রকাশিত 'লোকশিক্ষা-গ্রন্থমালা' ও 'বিশ্ববিদ্যা-সংগ্রহ' পুস্তিকাগুলিও অভিনব ও মূল্যবান। এই নতুন ধরনের সাহিত্যরচনা-প্রসঙ্গে যে-কয়েকটি বিষয়ে বিশেষ চিন্তা ও প্রযত্ন প্রয়োজন, তা হচ্ছে ঃ

(ক) শব্দ-নির্বাচন ও শব্দ-ব্যবহার (Vocabulary)
(খ) রচনা-ভঙ্গী (Style)
(গ) বিষয়বস্তু (Subject-matter)
(ঘ) পুস্তকের আকার ও গঠন (Size and make-up)
(ঙ) মুদ্রণ (Printing)
(চ) চিত্রণ (Illustration)

শব্দনির্বাচন-ব্যাপারটি অত্যন্ত দুরূহ এবং সমস্যাপূর্ণ। অঞ্চল-ভেদে একই দেশ, জাতি ও ভাষার লোক বিভিন্ন শব্দ ব্যবহার করে। সাধারণ মানুষ কথাবার্তায় কি কি শব্দ ব্যবহার করে এবং সহজ হইতে ক্রমশঃ জটিল এবং জানা হইতে ক্রমশঃ অজানা নতুন শব্দ আয়ত্তীকরণ ইত্যাদি নানা বিষয়ে অনুসন্ধান ও নানা সমস্যার সমাধান আবশ্যক। শব্দনির্বাচন নিয়ে নানা ভাষায় এক্সপেরিমেণ্ট হয়েছে ও হচ্ছে। ইংরাজী ভাষায় Graded vocabulary বা শ্রেণী-বিন্যস্ত শব্দ-তালিকা আছে। এই-সকল তালিকা স্কুলপাঠ্য পুস্তক-রচনায় বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। পাঁচ শত, হাজার, দুই হাজার ইত্যাদি সংখ্যক শব্দ-সংবলিত তালিকা নতুন পড়ুয়াদের উপযোগী সাহিত্য-রচনার পক্ষে সাহায্যকারী।

শব্দনির্বাচনের জন্য পরীক্ষিত পদ্ধতিও অনুসৃত হয় এবং সাধারণতঃ

শিক্ষক-শিক্ষণ সংস্থাগুলিতে এইরূপ পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলে। নির্বাচিত শব্দ-তালিকা অবলম্বনে রচিত বই নতুন পড়ুয়াগণকে ধাপে ধাপে ভাষা ও সাহিত্যের উচ্চ হতে উচ্চতর-সোপান অতিক্রমণে সহায়তা করে।

রচনাভঙ্গী কথাটি বিতর্কমূলক। কারো কারো মতে জনগণের সাহিত্য রচিত হওয়া উচিত আঞ্চলিক ভাষায়। অর্থাৎ যে-অঞ্চলের লোক যে-ভাষায় কথা বলে, সেই ভাষাতেই তাদের জন্য সাহিত্য রচনা করা বিধেয়। মতান্তরে একমাত্র সাধু ভাষাই সর্বজননীন সাহিত্যের বাহন হবার যোগ্য, কারণ সাধু ভাষাই শাখা-প্রশাখা-বিশিষ্ট নদীর মূলধারার মতো ভাষাস্রোতের মূলধারা বা মূলাধার। এই মূলধারাটি অবলম্বন করেই ভাষাপ্রবাহিণীর দূরাভিসার। উভয় মতবাদেরই স্বপক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি আছে। আঞ্চলিক ভাষায় লিখিত সাহিত্যও উৎকর্ষের গুণে স্থায়ী সাহিত্যের মর্যাদা লাভ করেছে। তার দৃষ্টান্ত বাংলায় মঙ্গলকাব্য ও পূর্ববঙ্গগীতিকা এবং ইংরাজীতে স্কটদের জাতীয় কবি রবার্ট বার্নসের কাব্য। প্রাদেশিকতা-দোষযুক্ত হয়েও পূর্ববঙ্গগীতিকার কবি ও রবার্ট বার্নস জাতীয় সাহিত্যের সভায় স্থায়ী আসন লাভ করেছেন।

আরও একটা প্রশ্ন এই প্রসঙ্গে উত্থাপিত হয় যে, টানা গদ্য অথবা কথোপকথনের ঢং, জনগণের সাহিত্য-রচনায় কোন্‌টির ব্যবহার অধিকতর সমীচীন? ক্ষেত্রবিশেষে উভয়েরই ব্যবহার চলতে পারে। তবে একটা মধ্যপন্থা বিশেষ ভাবে গ্রহণীয়। প্রচলিত সাধু ভাষায় টানা গদ্যের সহিত কথ্য ভাষায় সংলাপ-যোজনা অতি উত্তম পন্থা। স্টাইল বা লেখার ভঙ্গী লেখক-মাত্রেরই নিজস্ব জিনিস। জনসাহিত্য-রচনায় কতকগুলি মূলনীতি অবশ্য-পালনীয়।

নতুন পড়ুয়াদের জন্য রচিত লেখার ভাষা সহজ ও সরল হতে হবে। বাক্যগুলি যথাসম্ভব হবে সরল বাক্য এবং দৈর্ঘ্যে পৃষ্ঠার এক পঙক্তির অনধিক হওয়াই বাঞ্ছনীয়। বাহুল্যোক্তি ও অলঙ্করণ একান্ত-

ভাবে বর্জনীয়। প্রয়োজন-বোধে সহজ ও স্বাভাবিক উপমার প্রয়োগ-দ্বারা বক্তব্য বিষয়কে স্পষ্ট করে তোলা যেতে পারে। অবান্তর প্রসঙ্গের উল্লেখ-দ্বারা মূল বক্তব্যটিকে জটিল ও কষ্টকল্পিত করা এই জাতীয় সাহিত্য-রচনার মুখ্য উদ্দেশ্য-সাধনের পরিপন্থী। প্রতিটি বাক্য, প্যারাগ্রাফ্ ও অধ্যায় পরস্পরের সহিত অর্থসঙ্গতি-সূচক ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ থাকবে, যাতে মূল বিষয়বস্তুটির অর্থ কোথাও ভঙ্গ বা খণ্ডিত না হয়।

আলোচ্য বিষয়বস্তু হতে পারে বিবিধ রকমের। কিন্তু লক্ষ্য রাখতে হবে যে, নতুন পড়ুয়ারা যেন প্রথমবারেই একাধিক বিষয়-বস্তুর অবতারণায় বিভ্রান্ত না হয়ে পড়ে। যে-কোন বিষয়েই হোক না কেন, বক্তব্যটি সরাসরি পেশ করাই উচিত। কথাগুলি মনোজ্ঞ ও হৃদয়গ্রাহী হোক—যে-কোন সাহিত্যসৃষ্টির ইহাই প্রধান উদ্দেশ্য। নয়া পড়ুয়াদের সাহিত্যে এ-কথাটি আরও বেশী তাৎপর্যপূর্ণ, কেননা এ-সাহিত্য যারা পাঠানুরাগী, তাদের পাঠস্পৃহার পরিতৃপ্তি বিধানের জন্য ততটা নয়, যতটা যাদের আদৌ কোন পাঠানুরাগ নেই, তাদের ভিতর নতুন অনুরাগ-সৃজনের জন্য। আর কেবল যে হালকা, উদ্দেশ্য-বিহীন পাঠানুরাগ-সৃজনই এর একমাত্র লক্ষ্য তা-ও নয়। সাহিত্যিক সুরুচি এবং কোন একটা গভীর বিষয়ে মনোনিবেশ করবার ক্ষমতা-সৃজনও জন-সাহিত্যের উদ্দেশ্য।

পুস্তকের আকার ও গঠন জিনিসটাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

প্রথমতঃ পড়ুয়াদের বইগুলি হবে ওজনে হালকা আর আকারে পরিমিত।

প্রাথমিক পাঠ্যের সাইজ বা আকার হতে পারে ঃ—

$$\frac{২০ \times ৩০}{৮} \text{ অথবা } \frac{২০ \times ২৬}{৮} \text{ অথবা } \frac{১৭ \times ২৭}{৮}$$

দ্বিতীয় পর্যায়ের বইয়ের আকার হতে পারে—

$$\frac{১৮ \times ২২}{৮} \text{ অথবা } \frac{২২ \times ২৬}{৮}$$

ছড়া, কবিতা বা গানের বইয়ের আকার আরও ছোট হলেও ক্ষতি নাই। ছাপার জন্য বেশ পুরু ও শক্ত কাগজ চাই, ছাপার দাগ যাতে এ-পিঠ ও-পিঠ ফুঁড়ে বের না হয়।

প্রাথমিক পাঠ্যগুলি পৃষ্ঠাসংখ্যায় অনধিক তিন ফর্মার বেশী না হওয়াই ভাল। অধ্যায়ে অধ্যায়ে এক-একটি বিষয় এমন ভাবে আলোচিত হবে, যেন একটি অধ্যায় পড়া শেষ করে পড়ুয়ার মনে একটা কৃতকার্যতার ভাব (Sense of achievement) জেগে ওঠে। তাতে পড়ুয়ার উৎসাহ বৃদ্ধি পাবে এবং তার পাঠস্পৃহা উজ্জীবিত হবে।

মুদ্রণ-সৌষ্ঠব ও পারিপাট্যের দিকে নজর রাখা অত্যন্ত প্রয়োজন। হরফগুলি হবে সুদৃশ্য ও স্পষ্ট। ছত্রিশ পয়েণ্টের হরফ হতে শুরু করে ক্রমশঃ ২৪, ১৮, ১৪ এবং ১২ পয়েণ্ট হরফ পর্যন্ত ব্যবহার করা চলে। বইয়ের পৃষ্ঠায় ছাপা লাইনের দৈর্ঘ্য চার ইঞ্চির অধিক না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। চার-ইঞ্চি-পরিমিত লাইন পড়ুয়ার দৃষ্টি-ব্যাপ্তির (vision-span) পক্ষে সুবিধাজনক। শব্দ ও পঙ্‌ক্তিগুলির মধ্যে বেশ খানিকটা ফাঁক না থাকলে দ্রুত পঠন কষ্টসাধ্য হয়। প্রাথমিক পাঠ্যে পৃষ্ঠা প্রতি চল্লিশটি হিসাবে শব্দের সন্নিবেশ এবং ক্রমে ক্রমে শব্দসংখ্যা বাড়িয়ে তিনশত পর্যন্ত উঠা চলে।

বইয়ে ছবি থাকবে বৈ কি? তবে বিষয়বস্তুর সহিত সম্পর্করহিত ছবির ব্যবহার নিরর্থক। ছবির ব্যবহার তখনই সার্থক, যখন ছবি হবে আলোচিত বিষয়বস্তুর অর্থজ্ঞাপক। বইয়ের পৃষ্ঠায় ছবি ছাপালে হয় পৃষ্ঠার শীর্ষে নয় তলদেশে ছবি ছাপান উচিত। টানা মুদ্রিত পঙ্‌ক্তিগুলির আংশিক সংকোচন পড়ুয়াদের পাঠের পক্ষে কিছুটা অসুবিধাজনক। ছবিগুলি কলাশাস্ত্রসম্মত ও সুরুচিপূর্ণ হওয়া চাই।

বইয়ের মলাট ও বাঁধাই সুদৃশ্য ও শক্ত করতে হবে। অনাবশ্যক রঙিন চিত্র-বৈচিত্র্যে চাক্যচিক্যময় মলাট দৃষ্টির পক্ষে পীড়াদায়ক।

বইয়ের বাঁধাই হবে শক্ত। ছোট ছোট আকারের বইয়ে মধ্য-ফোঁড় (Central stitching) সেলাই আর মধ্যম বা বৃহদাকৃতি বইয়ের বেলায় জুসবাইণ্ডিং অপরিহার্য।

সাহিত্য-রচনালয়

'দশে মিলি করি কাজ'—এই বহুপ্রচলিত ও বহুল-ব্যবহৃত নীতিবাক্য সাহিত্য-সৃজনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। নতুন পড়ুয়াদের জন্য যে-বিশেষ ধরনের লেখার প্রয়োজন, তাতে শব্দ, বাক্য, কাহিনী, বিষয়বস্তু প্রত্যেকটি বিষয়েই সর্বপ্রযত্ন আবশ্যক। যে-শব্দগুলি রচনায় ব্যবহৃত হবে, সেগুলি পাঠকবর্গের পরিচিত ও বোধগম্য কিনা, তা প্রথমেই লক্ষণীয়। যে-শব্দ পড়ুয়ার কাছে অপরিচিত এবং অবোধ্য তার ব্যবহার সম্বন্ধে বিশেষ সতর্কতা চাই। জানা শব্দ হতে অজানার দিকে কিভাবে ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে হবে, বাক্যের গঠন কিরূপ হবে, অধ্যায়ের দৈর্ঘ্য কতটা হওয়া উচিত—ইত্যাদি নানা বিষয়েই চাই বিশেষ চিন্তা ও যত্ন। যে-কোন লেখকের পক্ষেই একক ভাবে এই জাতীয় পাঠক-সাপেক্ষ সাহিত্য-রচনা দুষ্কর। কিন্তু কিছুসংখ্যক লেখক একত্র সমবেত হয়ে পরস্পরের মধ্যে নিয়ত আলোচনা ও ভাববিনিময় দ্বারা নিজেদের আত্ম-সাপেক্ষ লেখাকে অনেকাংশেই পাঠক-সাপেক্ষ করে তুলতে পারেন। সাহিত্য-রচনালয়ে থাকেন একজন বিশিষ্ট সাহিত্যিক-প্রাধিকারিক, জনকয়েক লেখক, শিল্পী ও সহায়ক। সাহিত্য-রচনালয়ের পরিবেশ হবে একান্ত শান্ত ও নিরিবিলি। সঙ্গে থাকবে একটি গ্রন্থাগার। সেখানে একমাস হোক বা দু'মাস হোক, লেখক, পরিচালক ও শিল্পী পরস্পরের সান্নিধ্যে বাস করবেন। সেই সময়টা অধ্যয়ন, আলোচনা ও পুনর্বিবেচনা দ্বারা যে-কোন বিষয়বস্তু-সম্বন্ধীয় রচনা জ্ঞান-পরিবেশন, শব্দচয়ন, রচনাভঙ্গী ইত্যাদি আঙ্গিকের দিক দিয়ে যথাসম্ভব ত্রুটি-বিরল করা যেতে পারে। পুনঃ পুনঃ আলোচনার ফলে রচনাগুলি

অপ্রাসঙ্গিকতা, অবোধ্যতা ও জটিলতামুক্ত হয়ে সহজ, সরল ও স্বাভাবিক হয়ে উঠে। প্রতিনিয়ত প্রয়োগ এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা দ্বারা রচনাগুলি সত্যই যাদের উদ্দেশ্যে রচিত, তাদের উপযোগী ও উপভোগ্য করে তোলার চেষ্টা করা হয় সাহিত্য-রচনালয়ে।

গত তিন-চার বৎসর যাবৎ বাংলায় ও ভারতের অন্যান্য আঞ্চলিক ভাষায় প্রাপ্তবয়স্ক ও শিশু-কিশোর-শ্রেণীর নতুন পড়ুয়াদের জন্য উৎকৃষ্ট সাহিত্য-রচনার উদ্দেশ্যে উক্তরূপ সাহিত্য-রচনালয়ের অনুষ্ঠান হয়ে আসছে। এখানে রচিত পুস্তিকাগুলি যে জনশিক্ষা-প্রসারে বহুল পরিমাণে সাহায্য করবে সে-বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই।

শিশু-সাহিত্যের স্বরূপ

অপাঠ্য সব পাঠ্য কিতাব সামনে আছে খোলা
কর্তৃজনের ভয়ে কাব্য কুলুঙ্গিতে তোলা।

একটি বারো বৎসরের বালক অতি নিবিষ্ট মনে বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা' পড়িতেছে। পড়িতেছে না যেন গোগ্রাসে গিলিতেছে! তার চোখে-মুখে একটা অদ্ভুত আগ্রহ এবং উত্তেজনার ভাব স্পষ্ট ফুটিয়া উঠিয়াছে। বইখানা সে একটু সংগোপনেই পড়িতেছে, কারণ ইহা তাহার পক্ষে নিষিদ্ধ বই। কর্তৃজনের সতর্ক দৃষ্টি এড়াইয়াই তাহাকে এই দুষ্কর্ম সমাধা করিতে হইতেছে। নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে ও একান্ত তদ্গতচিত্তে বালক এক অপরূপ রোমাঞ্চ-ঘন অনুভূতির আনন্দটুকু আকণ্ঠ পান করিতেছিল। এক সম্পূর্ণ অজ্ঞাত নতুন জগতের সহিত তাহার পরিচয় ঘটিতেছিল এই কাহিনীর মাধ্যমে। বালকটি নিঃশব্দেই পড়িতেছিল, যদিও নিঃশব্দ পঠনের বয়স তখনো পুরোপুরি তাহার হয় নাই।

এক অপূর্ব ভাষার ঝঙ্কার ও ভাব-ব্যঞ্জনায় বালকের মন অভিভূত। যাহা পড়িতেছিল তাহার বেশীর ভাগ কথার অর্থই সে জানে না। কিন্তু সমষ্টিগতভাবে গঠিত অংশটি একটি মনোহর কল্পলোকের আভাস আনিয়া দিতেছিল :

"× × × সম্মুখেই সমুদ্র। অনন্তবিস্তার নীলাম্বুমণ্ডল সম্মুখে দেখিয়া × × আনন্দে হৃদয় পরিপ্লুত হইল। ফেনিল নীল অনন্ত সমুদ্র। উভয় পার্শ্বে যতদূর চক্ষু যায়, ততদূর পর্যন্ত তরঙ্গভঙ্গপ্রক্ষিপ্ত ফেনার রেখা, স্তূপীকৃত বিমল কুসুমদামগ্রথিত মালার ন্যায় সে ধবল ফেনরেখা হেমকান্ত সৈকতে ন্যস্ত হইয়াছে; কাননকুন্তলা ধরণীর উপযুক্ত অলকাভরণ। অস্তগামী দিনমণির মৃদুল কিরণে নীলজলের একাংশ দ্রবীভূত সুবর্ণের ন্যায় জ্বলিতেছিল। অনতিদূরে কোন

ইউরোপীয় বণিকজাতির সমুদ্রপোত শ্বেতপক্ষ বিস্তার করিয়া বৃহৎ পক্ষীর ন্যায় জলদিহৃদয়ের উড়িতেছিল।”

সেই সমুদ্রগামী জাহাজটির সঙ্গে সঙ্গে বালকের কৌতূহলোদ্দীপ্ত মনটিও এক অজ্ঞাত মহাদেশের অভিযানে ছুটিয়া চলিয়াছে। গল্প, উপন্যাস, নাটক পড়া বালকের পক্ষে মানা। যে কোন বিবেকবুদ্ধি-সম্পন্ন অভিভাবকই এই নীতির সমর্থক। সতর্কতার সঙ্গেই নাটক-নভেলের দুষ্ট ছোঁয়াচ হইতে তিনি তাঁর ছেলেমেয়েকে মুক্ত রাখিবার চেষ্টা করিবেন। এই ঢাক-ঢাক নীতির অবাধ প্রয়োগের ফলেই আজ ছোটদের বঙ্কিম, ছোটদের শরৎচন্দ্র, ছোটদের সেক্সপীয়র জাতীয় দুধের স্বাদ-ঘোলে-মেটানো সাহিত্যের এত ছড়াছড়ি। যে কোন সাহিত্যেই ক্লাসিক-পর্যায়ভুক্ত রচনা, যার মূল্য কালের নিকষে নির্ধারিত হইয়া গিয়াছে, যে রচনা সাহিত্যের স্থায়ী সম্পদ, সে জাতীয় রচনাকে নিছক বয়সের অজুহাতে বা নীতির দোহাই দিয়া কিশোরপাঠকের পক্ষে “অনধিকার প্রবেশ্য” বলিয়া চিহ্নিত করিয়া রাখিলে হিত অপেক্ষা অহিতের সম্ভাবনাই বেশী।

গ্রন্থজগতে বিচরণ অনেকটা অজ্ঞাত মহাদেশ পর্যটনের মতোই বিস্ময়প্রদ এবং নব নব অভিজ্ঞতা অর্জনের প্রশস্ত ক্ষেত্র। কৃত্রিম বাধা-নিষেধে এই ক্ষেত্রকে সংকুচিত ও সীমায়িত করিয়া রাখা কোন মতেই যুক্তিযুক্ত নহে। বাংলা সাহিত্যে যেমন মাইকেল, বঙ্কিম, রমেশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র প্রভৃতি দিকপালগণকে বাদ দিয়া কিশোর-পাঠ্য গ্রন্থাগার সংগঠন সম্ভব নহে, তেমনি ইংরাজীতে স্কট, ডিকেন্স, থ্যাকারে, জর্জ ইলিয়ট, জেন অস্টেন এবং পরবর্তী কিপ্লিং, টমাস হার্ডি, অস্কার ওয়াইল্ড, গলস্‌ওয়ার্দী, ফরস্টার প্রমুখ সাহিত্য-স্রষ্টাগণ অপরিহার্য। কিপ্লিং সাম্রাজ্যবাদী, জঙ্গী মনোভাবাপন্ন লেখক —এই অজুহাতে অনেকে কিপ্লিং পাঠের বিরোধী। দেখা যায় কোন একটা সময়ে ইংরাজ ছেলেমেয়েরাই পরবর্তীকালে সাম্রাজ্যবাদের প্রতি প্রতিকূল মনোভাব পোষণ করিতে শিখিল। সুতরাং কিপ্লিং

পাঠ করিয়া সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব ও ঔপনিবেশিক দৃষ্টিভঙ্গী বৃদ্ধি পাইয়াছে, একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় না।

যে কোন একখানা বিশেষ ধরনের গ্রন্থ একজন সাধারণ প্রবীণ ও প্রাপ্তবয়স্কের মনে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে, অনেক ক্ষেত্রে শিশু এবং কিশোর পাঠকের মনেও অনুরূপ প্রভাব বিস্তার লাভ করিতে পারে। প্রাজ্ঞ ও প্রবীণের ভাবাবেগের মাপকাঠিতে শিশুচিত্তের পরিমাপ সঠিক হয় না। প্রবীণ যে আশঙ্কায় বই বিশেষের সংস্পর্শ হইতে শিশুকে দূরে নিরাপদ রাখিতে চান, বাস্তবিক পক্ষে অনেক ক্ষেত্রেই সেই আশঙ্কা অমূলক। স্যার ওয়ালটার স্কট কৃত "আইভ্যান হো", "লেডী অফ দি লেক", ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ কৃত "রবরয়েজ গ্রেভ", ম্যাক্স পেমবারটন কৃত "আয়রন পাইরেট" ইত্যাদি বই হাজারে হাজারে ছেলেমেয়েদের হাতে হাতে ঘুরিতেছে। কিন্তু ছেলেমেয়েরা এই জাতীয় দুঃসাহসিক অভিযান অথবা মহদাশয় দুর্বৃত্তের (Noble Bandit) রোমাঞ্চকর কাহিনী পড়িয়াই দুর্বৃত্ত হইয়া উঠিবে এরূপ ভয় সত্যই অমূলক। কিন্তু এই আশঙ্কায় যদি শিশুকে গ্রন্থ-জগতের বিচিত্র ও বিপুল ক্ষেত্রে অবাধ সঞ্চরণের অধিকার হইতে বঞ্চিত রাখা যায় তবে তাহার অপূরণীয় ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। শিশু বড় হইয়া উঠিবে, কিন্তু গ্রন্থপাঠের প্রতি তাহার রুচি বা আগ্রহ সৃষ্টি হইবে না। গ্রন্থপাঠে কতো সংখ্যক শিশু বা কিশোর ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে ইহার কোন সঠিক হিসাব নাই বটে, কিন্তু একথা ধ্রুব যে গ্রন্থপাঠ না করিয়া, অথবা গ্রন্থপাঠের সুযোগলাভে বঞ্চিত থাকিয়া যাহারা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে বা হইতেছে, তাহাদের তুলনায় প্রথমোক্তের সংখ্যা নেহাত নগণ্য।

শিশুচিত্তকে গ্রন্থমুখী করিয়া তুলিবার প্রধান উপায় শিশুকে গ্রন্থাগারের অবাধ স্বাধীনতা (Freedom of the library) দান। নেতিবাচক বাধানিষেধ প্রয়োগে সেই স্বাধীনতা খর্ব করিলে তাহার অনিষ্ট সাধন করা হয়। শিশুর বেলাতেই হউক আর প্রাপ্তবয়স্কের

বেলাতেই হউক—পাঠানুরাগ উদ্দীপিত করিবার বড় কৌশল পাঠককে বইয়ের সহিত পরিচিত করাইয়া দেওয়া, এবং পাঠককে বইয়ের সান্নিধ্যে লইয়া আসা। অবাঞ্ছিত বইগুলি শিশু-পাঠক বা বয়স্ক-পাঠকের হাতে তুলিয়া না দিলেও কিছু কিছু অবাঞ্ছিত বই আপনা-আপনিই তাহাদের হাতে আসিয়া পড়িবে। কিন্তু তাহাতে কিছু আসে যায় না। বহুক্ষেত্রেই দেখা যায় যে পাঠক নিজেই নিখুঁত-ভাবে উত্তম-অধমের বিচার সাধন করিয়া লয়। যোগ্যতমের উদ্‌বর্তন এক্ষেত্রেও স্বতঃসিদ্ধ।

যে সাহায্য শিশু-কিশোর পাঠককে দেওয়া একান্ত প্রয়োজন তাহা হইল মূলতঃ শিশু-পাঠককে সাহিত্যের ক্রমবিকাশের ধারার সহিত পরিচিত করিয়া তোলা।

কোন লেখকের পর কোন লেখকের লেখা বই পড়া সমীচীন, অথবা লেখক বিশেষের কোন বইখানা প্রথমে শুরু করা উচিত, কোন বইখানার পর কোন বই পড়িলে সাহিত্যের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা যায় এবং এলোমেলোভাবে কতকগুলি বই লইয়া নাড়াচাড়া না করিয়া একটা সুশৃঙ্খল পদ্ধতির অনুসরণ দ্বারা অপেক্ষাকৃত অল্পায়াসে অধিকতর সুফল অর্জন করা যাইতে পারে—ইত্যাদি বিষয়েও শিশু ও কিশোর পাঠককে নির্দেশ দেওয়া আবশ্যক।

শিশু-পাঠককে তথাকথিত 'শিশু-সাহিত্যের' চৌহদ্দির মধ্যেই আবদ্ধ করিয়া রাখা একান্ত অন্যায়। 'শিশু-সাহিত্যের' রচয়িতা শিশুরা নহে। 'শিশু-সাহিত্য' রচনা করেন বড়রা। এ যেন অনেকটা শিশুরাজ্যে অনধিকার প্রবেশের মতো। শিশু কি চায় তাহা শিশুই সর্বাপেক্ষা ভালভাবে জানে। শিশুর কাছে এই জগৎ অতি বৈচিত্র্যময় রূপেই প্রকটিত হয়। শিশু-মন নিত্য নব নব অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় রহস্যের অনুসন্ধানের জন্য উন্মুখ হইয়া থাকে।

আর সৌভাগ্যক্রমে জগতের বহু সাহিত্য সত্য, সুন্দর ও শাশ্বত সৃষ্টির সম্পদে এতো সমৃদ্ধ, যে উত্তমের সাথে কিঞ্চিৎ অপকৃষ্ট

উপাদানের অনুপ্রবেশ অপরিহার্য হইলেও তাহাতে আশঙ্কার হেতু বিশেষ নাই। আর সাহিত্যের সহিত পরিচয়ের ভিতর দিয়াই শিশুর কাছে বিশ্বরহস্যের গুণ্ঠনমোচন ঘটে।

শিশুরা কি চায়? শিশুরা কি ভালবাসে? এই প্রশ্নটাই সর্বাগ্রে বিবেচ্য। একটু লক্ষ্য করিলেই বুঝা যায়—শিশুরা চায় মজা, শিশুরা ভালবাসে তামাসা-কৌতুক। শিশুর কল্পনারাজ্যের যতো উদ্ভট, আজগুবি, অসম্ভব ও অমিলের ছড়াছড়ি। খেয়াল-রসের ভিয়েনে জগতের শ্রেষ্ঠ শিশু-সাহিত্যিকেরা শিশুমনের উপযোগী নানা অপূর্ব আহার্য তৈরি করিয়াছেন। খেয়াল-রসই শিশু-চিত্তের শ্রেষ্ঠ জারক রস।

আয়রে ভোলা খেয়াল খোলা
স্বপন দোলা নাচিয়ে আয়,
আয়রে পাগল আবোল-তাবোল
মত্ত মাদল বাজিয়ে আয়।

স্বপ্নলোকের রঙিন আকাশে উপকথার পক্ষীরাজ ঘোড়ার মতোই শিশু-কল্পনা অবাধে বিচরণ করে। কল্পনার সাহায্যেই শিশু তার চতুর্দিকে এক সীমাহীন পরিমণ্ডল সৃষ্টি করিয়া লয়—যার প্রকৃত খোঁজ-খবর প্রাজ্ঞ ও প্রবীণের অভিজ্ঞতার নাগালের বাইরে। সেই অসম্ভব ও অবাস্তব কল্পনা-রাজ্যের ভিতর দিয়া প্রত্যেক মানুষকেই একদিন ইতস্তত বিচরণ করিতে হয় বটে, কিন্তু কঠোর বাস্তব জীবনের নানা রূঢ় অভিজ্ঞতার সংস্পর্শে সেই শৈশবদিনের কল্পনা-রঙিন মুহূর্তগুলি কোথায় যেন হারাইয়া যায়। শিশু-দরদী ও সংবেদনশীল কবি ও শিল্পী ছাড়া বাস্তবধর্মী হাট-বাজারের পেশাদার লেখকের পক্ষে শিশুমনের বিচিত্র খেয়ালগুলির খোঁজখবর রাখা সম্ভব নহে। সেই কল্পনা-জগতের বৈচিত্র্য ও বিস্তৃতির হিসাব রাখা আর-কাহারো সাধ্য নহে। সেই কল্পনাজগতেরই একটি চিত্র:

হেথায় রঙিন আকাশতলে
স্বপন দোলা হাওয়ায় দোলে,
সুরের নেশায় ঝরনা ছোটে,
আকাশকুসুম আপনি ফোটে,
রঙিয়ে আকাশ রঙিয়ে মন
চমক জাগে ক্ষণে ক্ষণ।

উর্বর কল্পনায় কতো অদ্ভুত, কতো উদ্ভট, কতো চমকপ্রদ, কতো খাপছাড়া কথাই না দানা বাঁধিয়া উঠে। আর সেই সৃষ্টিছাড়া, অর্থহীন কথাগুলিই সুনিপুণ শিল্পীর হাতের গুণে এক অনবদ্য শিশু-সাহিত্যে পরিণত হয়। ইংরাজী সাহিত্যে বিখ্যাত শিশু-গ্রন্থ "এ্যালিস ইন্ ওয়াণ্ডারল্যাণ্ড" (Alice in Wonderland by Lewis Carroll) এবং জে. এম্. ব্যারীর "পিটার প্যান এ্যাণ্ড ওয়েণ্ডি" (Peter Pan and Wendy by J. M. Barrie) এই জাতীয় সাহিত্য।

অর্থহীন আবোল-তাবোল কথার ছড়া শিশু, আর কেবল শিশু কেন, শিশুর বাবা-মা, কাকা-দাদা প্রভৃতির কাছেও কতো প্রিয়—সেকথা সুকুমার রায়ের পাঠক-পাঠিকামাত্রেই জানেন।

ঠাস্ ঠাস্ দ্রুম্ দ্রাম্, শুনে লাগে খট্‌কা,
ফুল ফোটে ? তাই বল ! আমি ভাবি পট্‌কা !
শাঁই শাঁই পন্ পন্, ভয়ে কান বন্ধ—
ওই বুঝি ছুটে যায় সে ফুলের গন্ধ ?
ঘর্ঘর ভন্ ভন্ ঘোরে কত চিন্তা !
কত মন নাচে শোন—ধেই ধেই ধিন্‌তা !

অথবা ইংরাজী ছড়া :—

Hey diddle diddle
The cat and the fiddle,

The cow jumped over the Moon ;
The little dog laughed
To see such fun
And the dish ran away with the spoon.

নিছক কথার সমষ্টি, শব্দের অনুকৃতি! কিন্তু তাই কতো সুন্দর! অর্থ নাই, না থাকুক! অনর্থক কথাগুলিই কি অনবদ্য!

জগতের সব সেরা সাহিত্যেই নন্‌সেন্স ভার্স (Nonsense Verse) একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে।

আবার এই নন্‌সেন্স ভার্সের ভিতর দিয়া কোন সমসাময়িক ব্যক্তি বা ঘটনার প্রতি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপও বর্ষিত হইয়া থাকে।

'What Pitt is to Addington,
London is to Paddington.'

আঠারো শতকের প্রতিভাবান ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী উইলিয়ম পিটের সহিত তুলনায় তাঁহার পরবর্তী এ্যাডিংটনের নগণ্যতা বুঝাইয়া দিতেছে উপরোদ্ধৃত ছড়াটি। তৎকালীন লণ্ডনের পথেঘাটে চ্যাংড়া ছেলেরা মুখে মুখে এই ছড়া কাটিত।

বছর ত্রিশেক পূর্বে প্রেসিডেণ্ট হুভারের (Hoover) আমলে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র মাদক-বর্জন নীতি অবলম্বন করিয়াছিল। মদ্য-পিপাসী ইয়াঙ্কীদের মনোভাবটি চমৎকার ফুটিয়া উঠিয়াছে নিম্নোক্ত ছড়ার ছন্দে। তৎকালীন ব্রিটিশ-রাজ পঞ্চম জর্জ নাকি এই ছড়াটি শুনিয়া ভারী আমোদ পাইতেন। পাইবার কথাই, কারণ পঞ্চম জর্জ ছিলেন সুরা-রসের একজন অকৃত্রিম সমঝদার।

"Four and twenty Yankees, feeling rather dry.
Slipped across to Canada to have a drop of rye
When the rye was opened
The yanks began to sing

"Who the hell is Hoover ?
God save the King !"

এমনি ধরনের ছড়া বাংলাতেও বিস্তর আছে। একটা নমুনা—

পুঁটুরাণীর বর

"শোলার টুপি মাথায় দিয়ে
চারটি ঝোলা কাঁধে নিয়ে
বর এসেছে পোশাক পরে সবুজ-শাদা-কালো—
তা যাই বলো, পুঁটুরাণী বর পেয়েছে ভালো ॥
বলের মতো মুখখানা গোল, হোক্ না খ্যাঁদা নাক,
হোক্ না ট্যারা চোখদুটি তার হোক্না মাথায় টাক
চার-চারটে পাস দিয়েছে,
তার উপরে বিলেত গেছে,
বিলেত থেকে এনেছে এক মস্ত বড়ো ঢাক্,
নিজেই বাজায় সকল সময়—টাক-ডুমাডুম-টাক্ ॥"

বিলাত-প্রত্যাগত গর্বস্ফীত উন্নাসিকদের কাছে এ বিদ্রূপ একেবারেই অসহ্য।

শিশুর মন সহজে লেখাপড়ার দিকে আকৃষ্ট হইতে চায় না। ছন্দের দোলায় শিশুর মনকে দোলাইয়া দাও, অশান্ত অবাধ্য মন হয়তো খানিকটা পোষ মানিবে। এদিক দিয়া দক্ষিণারঞ্জন, যোগীন্দ্রনাথ, মনোমোহন, সুকুমার, সুনির্মল, সুখলতা এবং আরও অনেকে বাংলা সাহিত্যকে অশেষ সম্পদে সমৃদ্ধ করিয়াছেন। স্বপ্ন, কল্পনা, বাস্তব, মনস্তত্ত্ব অনেক কিছুই ছন্দোমধুর অর্থ-নিরীহ ছড়ার মধ্যে স্থান পাইয়াছে। এমনি একটি সুখপাঠ্য ছড়া:

হাতে-খড়ি

"আজ সকালে সানাই বাজে খোকার হাতে-খড়ি
সবাই বলে, চল্না ছুটে পড়ি কি ভাই মরি!

যতো কালি লাগবে দেবো বলে কালো হাতি
কালিন্দীরই কালো জলে আমার মাতামাতি !
ফিস্‌ফিসিয়ে খোকার কানে বলে সাদা মেঘ
আমি দেবো সাদা কাগজ পবন দেবে বেগ !
লাখো কাগজ জড়ো করে আনবো তোমার ঠাঁই
লেখো খোকা অ-আ-ক-খ চিন্তা কিছুই নাই !
রাজহাঁস কয় আমি দেবো কলম যতো লাগে
দোয়েল বলে, গাইবো যে গান সূয্যি উঠার আগে !
বলছে ঊষা পরিয়ে দেবো খোকার ভালে টিপ্‌
জোনাকিরা জ্বালতে চাহে মঙ্গলেরই দীপ।
খোকা বলে, চুপ করো সব কিসের হাতে-খড়ি ?
মহাকাব্য লিখ্‌ছি বসে আগে তা শেষ করি ॥"

কিছুদিন পূর্বেও শিশুসাহিত্যের বাজারে ভয়ঙ্কর ও ভীতিপ্রদ কাহিনীর বেশ ছড়াছড়ি ছিল। কল্পনাপ্রসূত এক ভয়াবহ পরিবেশের মধ্যে স্থাপন করা হইত গল্পের নায়ককে। নানা বিপদ-আপদ হয় চাতুর্যে, নয় অসমসাহসিকতায় কাটাইয়া উঠিয়া সেই নায়ক পাঠকের বিস্ময় উৎপাদন করিবে—ইহাই এ-জাতীয় গল্পের রীতি। আফ্রিকা অথবা মালয় অথবা বোর্নিওর অথবা অন্য কোন দেশের গভীর ও অগম্য জঙ্গলে নানা হিংস্র ও ক্রূরপ্রকৃতির জন্তু-জানোয়ারের বিরুদ্ধে মানুষের লোমহর্ষক অভিযান-কাহিনী ? ভূত-প্রেত-দৈত্য-দানার নানা আজগুবি গল্পই এই জাতীয় শিশু-সাহিত্যের প্রধান উপজীব্য। এই শ্রেণীর শিশু-সাহিত্যকে Horror Comics আখ্যা দেওয়া হয়।

রাডিয়ার্ড কিপ্লিংয়ের জঙ্গল-কাহিনী (Jungle Stories) আর বাঙালী প্রমদারঞ্জন রায়ের 'বনের খবর' এই শ্রেণীর সাহিত্যের পর্যায়ে পড়ে না ; তার কারণ, এগুলি লেখকের স্বকপোলকল্পিত একেবারে আজগুবি কাহিনী নহে, আর সাহিত্যিক উৎকর্ষের দিক দিয়াও ইহাদের মূল্য অনস্বীকার্য। তথাকথিত হর‍্যর কমিক্‌স্‌

(Horror Comics) বা ভয়-কাহিনীর বাজার এখন মন্দা। এই শ্রেণীর বইয়ের কু-প্রভাব অতি সুস্পষ্ট। কিশোর পাঠকের মনে একটা অহেতুক ভীতি সঞ্চার ভিন্ন আর কোন প্রভাবই ইহা দ্বারা সঞ্চারিত হয় না। সস্তা গোয়েন্দা-উপন্যাস আর রোমাঞ্চ-রহস্য যেমন সাহিত্যপদবাচ্য নহে, তেমনি এই ভয়-কাহিনীগুলিও শিশু-কিশোর সাহিত্যের সংজ্ঞালাভের অযোগ্য। দুঃখের বিষয় বাংলায় এই শ্রেণীর গল্প-কাহিনীর প্রচলন উপেক্ষা করিবার মতো নহে। অনেক প্রকাশক ও লেখক এই শ্রেণীর বইয়ের ব্যবসা করিয়া বেশ দু'পয়সা রোজগার করিতেছেন। বহু সাধারণ পাঠাগারে এবং স্কুল-লাইব্রেরীতে এই শ্রেণীর বই-ই শিশু-পাঠ্য বই হিসাবে সংগৃহীত এবং পঠিত হইতেছে।

হর‍্যর-কমিক্‌স্‌ হইতে স্বতন্ত্র ধরনের আর একশ্রেণীর শিশু-সাহিত্য সম্প্রতি বেশ জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। ইংরাজীতে এই শ্রেণীর সাহিত্যকে বলা হয় সচিত্র ক্লাসিক (Illustrated Classics) বাংলাদেশেও কয়েকটি বহুলপ্রচারিত দৈনিক সংবাদপত্রের উদ্যমে এই শ্রেণীর রচনার প্রচলন হইতেছে। ইহাতে পুরাণকাহিনী, বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ, নাটক বা নভেলের কাহিনীর সংক্ষিপ্তসার রচনা করিয়া কতকগুলি বর্ণাঢ্য ছবির সাহায্যে অতি অল্প পরিসরের মধ্যে সেই সংক্ষিপ্তসারের মাধ্যমে মূল আখ্যানের সহিত পাঠকের পরিচয়সাধনের চেষ্টা করা হয়। পাঠ্যাংশ অপেক্ষা রঙচঙা ছবিগুলির দিকেই দৃষ্টি বেশী আকৃষ্ট হয় এবং ছবিগুলির তাৎপর্য বুঝিবার জন্যই পাঠ্যাংশ পড়িবার কিছুটা গরজ জন্মায়।

রবিবারের পত্রিকাটি টেবিলের উপর রাখা মাত্রই বাড়ির ছোটছেলেমেয়েরা লাল-কালো রঙে আঁকা মহাভারত বা রামায়ণ কাহিনীর ছবিগুলি দেখিবার জন্য ঝুঁকিয়া পড়ে। ছবিগুলির পরি-চায়ক সংক্ষিপ্ত পাঠ্যাংশটুকু না পড়া পর্যন্ত কৌতূহল নিবৃত্ত হয় না। ছবিগুলি যে জনপ্রিয় সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু এখন প্রশ্ন

হইল যে, এই শ্রেণীর রচনার মূল বা মুখ্য উদ্দেশ্য কি? এই বিষয়ে ইংলণ্ডের শিক্ষাবিদ ও সাহিত্যিকমহলে যথেষ্ট আলাপ-আলোচনা চলিতেছে। ইংলণ্ডের গ্রন্থাগার পরিষদের সম্পাদক মিঃ ওয়েলস্-ফোর্ট বলেন যে এই শ্রেণীর ছবি-বই শিশু-পাঠকের কৌতূহল নিবৃত্ত করে, কিন্তু তাহার কল্পনার উদ্দীপনে খুব বেশী সাহায্য করে না। সে দিক দিয়া এই শ্রেণীর ছবি-সাহিত্যের (Illustrated Comics) উদ্দেশ্য,—অর্থাৎ মূল গ্রন্থপাঠে আগ্রহ-সৃষ্টি—বহুলাংশেই ব্যর্থ হইয়া যায়। চার্লস ল্যাম্ব (Charles Lamb) প্রণীত "টেল্স্ ফ্রম সেক্স-পীয়র" (Tales from Shakespeare) যে পরিমাণে মূল সেক্সপীয়র পাঠে আগ্রহ জন্মায়, ছবি-সাহিত্য তাহার শতাংশের একাংশ আগ্রহও সৃষ্টি করিতে পারে কিনা সন্দেহ। যে সকল কালজয়ী সাহিত্য-গ্রন্থ ছবি-বই (Illustrated Classics) সঙ্কলিত হইতেছে, তাহার মধ্যে "বাইবেল", সেক্সপীয়রের "হ্যামলেট", ডিকেন্সের "ক্রিস্‌মাস ক্যারল", লুই ক্যারলের "এলিস ইন্ ওয়াণ্ডারল্যাণ্ড", "দি ইলিয়াড" ও "ক্রাইম এ্যাণ্ড পানিশমেণ্ট" প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। ছবি-বইয়ের বহুল প্রচার সত্ত্বেও মূল গ্রন্থগুলির চাহিদা আশানুরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে না। মূলগ্রন্থ পাঠে পাঠকের আগ্রহ বৃদ্ধি হওয়া দূরে থাকুক, বরঞ্চ সহজে বাজীমাৎ করিয়াছি এইরূপ একটা আত্মতুষ্টির ভাবই বৃদ্ধি পায়। এই আত্মতুষ্টি আত্মপ্রবঞ্চনার নামান্তর। ইহা শিশু-সাহিত্যের উদ্দেশ্য হইতে পারে না।

শিশু-সাহিত্যের জাদুকর

শিশু-সাহিত্যের সার্থক স্রষ্টা হিসাবে হ্যান্‌স্ ক্রিশ্চিয়ান এণ্ডারসেনের জগৎজোড়া নাম। ঈশপের গল্প, বিষ্ণুশর্মার পঞ্চতন্ত্র আর গ্রীসের পরী-উপাখ্যানের মতো হ্যান্‌স্ ক্রিশ্চিয়ান এণ্ডারসেনের গল্পগুলিও নানা ভাষায় অনূদিত হয়ে সারা জগতের শিশুদের মনোরঞ্জন করে আসছে। শুধু শিশুদেরই বা বলি কেন, বড়রাও এই গল্পগুলির সহজ সরল সৌন্দর্যে মুগ্ধ না হয়ে পারে না। বলা হয় যে পৃথিবীর যেখানেই সেক্সপীয়র পঠিত হয়, সেখানেই হ্যান্‌স্ ক্রিশ্চিয়ান এণ্ডারসেনও পঠিত হয়ে থাকেন।

ডেনমার্ক রাজ্যের একটি ছোট্ট দ্বীপ ফুনেন। তার অন্তর্গত একটি ছোট্ট শহর ওডেন্সা। এই শহরেই ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে এক গরীব মুচির ঘরে হ্যান্‌সের জন্ম হয়। তিনি ছিলেন তাঁর গরীব পিতামাতার একমাত্র সন্তান। গরীবঘরের ছেলে হলেও, একমাত্র সন্তান বলে হ্যান্‌স্ ছিলেন তাঁর বাপ-মায়ের আদরের দুলাল। হ্যান্‌সের শিশু-কালে তার বাবা সময় পেলেই হ্যান্‌স্‌কে সঙ্গে নিয়ে দীর্ঘ পথে বা প্রান্তরে বা বনে বনে ঘুরে বেড়াতেন। আর বেড়াবার সময় বালক হ্যান্‌স্‌কে গাছ-লতাপাতা, ফুলফল, পশুপাখী ও প্রকৃতির অন্যান্য বৈচিত্র্যের সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দিতেন। হ্যান্‌সকে প্রায়ই পাঠিয়ে দেওয়া হত তাঁর ঠাকুমার বাড়ী। ঠাকুমার কাছে তিনি শুনতেন অসংখ্য রূপকথার কাহিনী। শিশুকালের এই স্মৃতিগুলি হ্যান্‌সের মনে গভীর রেখাপাত করেছিল এবং পরবর্তী জীবনে তাঁর কল্পনা-প্রবণতার সহায়ক হয়েছিল।

কিন্তু হ্যান্‌সের কপালে এই সুখের দিনগুলি বেশী দিন টিকল না। অকালে বাবা মারা গেলেন। মা আবার বিয়ে করলেন। মায়ের নূতন স্বামী হ্যান্‌স্‌কে প্রতিপালন করতে নারাজ হলেন।

কাজেই অতি অল্প বয়সে হ্যান্‌স্‌কে এই বিপুল বিশ্বে নিজের স্থান করে নেবার ভার গ্রহণ করতে হল। দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করলেও মায়ের প্রাণ ছোট হ্যান্‌সের জন্য আকুল হয়ে উঠল। নিরুপায় মা হ্যান্‌সের হাতে ধরে তাকে নিয়ে এলেন রাজধানী কোপেনহেগেন শহরে। বিদ্যার মূলধন অতি সামান্যই, আর্থিক সংস্থান আরও শোচনীয়। একমাত্র সম্বল সামান্য কিছু অভিনয়নৈপুণ্য। শহরে আসার উদ্দেশ্য, যদি কোন পেশাদার রঙ্গমঞ্চে ছোটখাট অভিনয়ে কিছু রোজগার হয়।

মা ও ছেলে শহরে ঢুকছেন। শহরের প্রবেশপথে এক বুড়ী বেদেনীর সঙ্গে দেখা। বেদেনীরা ভূত-ভবিষ্যৎ গুণতে পারে। মা বেদেনীকে ছেলের ভবিষ্যৎ গুণে বলতে অনুরোধ করলেন। বেদেনী ভবিষ্যদ্বাণী করল, "এই ছেলে ভবিষ্যতে খুব নামজাদা লোক হবে। যখন এই ছেলে আবার তার নিজ শহরে ফিরবে সেদিন তার সম্মানে সারা শহর আলোকমালায় সজ্জিত হবে।"

একদিন এই বেদেনীর ভবিষ্যদ্বাণী হ্যান্‌স্‌ ক্রিশ্চিয়ান এণ্ডারসেনের জীবনে অক্ষরে অক্ষরে সফল হয়েছিল। কিন্তু সেই সাফল্যলাভের পথটি ছিল দীর্ঘ ও অশেষ দুঃখসঙ্কুল। রাজধানীর বিরাট জনতা গ্রাস করে নিল সেই ছোট বালকটিকে। জীবন-সংগ্রামের ফেনিল আবর্তে নিঃসহায় নিঃস্বম্বল এই বালকটি ক্ষুদ্র তৃণখণ্ডের মতো কোথায় তলিয়ে গেল। পদে পদে বেদনা ও ব্যর্থতা এণ্ডারসেনের গতিপথ বিঘ্নিত করে তুলল। কিন্তু তাঁর অন্তরের বহ্নি,—প্রতিভার দীপশিখা স্তিমিত হলেও চিরদিন ছিল অনির্বাণ এবং একদিন এই স্তিমিত ক্ষীণ দীপশিখাই প্রজ্বলিত হয়ে উঠল ভাস্বর দীপ্তিতে।

দীর্ঘ পর্যটন ও দীর্ঘতর জীবন-সংগ্রাম দুইই ঘটেছিল এণ্ডারসেনের জীবনে। সাহিত্য ও শিল্পজগৎ প্রথমেই তাঁর কণ্ঠে বিজয়মাল্য পরিয়ে দেয় নি। কিন্তু ব্যর্থতার তীব্রতা ও জীবনের নানা তিক্ত অভিজ্ঞতা উত্তীর্ণ হয়ে যে মোহন মানসলোকের সন্ধান হ্যান্‌স্‌

ক্রিশ্চিয়ান এণ্ডারসেন পেয়েছিলেন তাই প্রতিবিম্বিত হয়েছে তাঁর অজস্র রচনায়—যে রচনার জাদুস্পর্শ শিশুমনকে যুগে যুগে আকৃষ্ট, আবিষ্ট করে আসছে। চীনামাটির মেষপালিকার সহিত চীনামাটির চিম্‌নি-ঝাড়ুদারের প্রেম, মৎস্য-কন্যা কর্তৃক রাজকুমারের বন্ধনমোচন, নাইটিঙ্গেলের গানে মুমূর্ষু চীন-সম্রাটের চিত্তবিনোদন ইত্যাদি হাজারো রকমের গল্প রচনা করেছিলেন এই প্রতিভাশালী সাহিত্য-স্রষ্টা।

একটা গল্প এখানে বলি। গল্পটার নাম আগ্‌লি ডাক্‌লিং—কুৎসিত হাঁসের বাচ্চা।

পাতিহাঁসের খোঁয়াড়ে পাঁচ ছয়টা ডিম ফুটিফুটি করছে। এর মধ্যে একটা ডিম অন্যগুলির চাইতে আকারে বেশ বড়। হাঁসীর তাতে কি? কোন প্রকার পক্ষপাতিত্ব না করে সে সবগুলি ডিমের উপরেই সমভাবে তা দিয়ে যাচ্ছে। ক্রমে ডিমগুলি ফুটতে শুরু করল, আর তা থেকে বেরুতে লাগল এক একটা প্যাঁক-প্যাঁকে ছানা। ছানাগুলি ভারি সুন্দর, যেমন শাদা তেম্‌নি গোলগাল। বড় ডিমটা থেকে বেরুনো বাচ্চাটা কিন্তু সেরকম হল না। এটার গায়ের রং বিশ্রী ধোঁয়াটে, আর এটা দেখতে কিম্ভূতকিমাকার বড়। মা-হাঁসীটা তার ছোট সুন্দর বাচ্চাগুলিকে নিয়ে পুকুরে মনের সুখে সাঁতার কাটে। ঐ কুৎসিত বাচ্চাটাকে তেমন আমল দেয় না, কাছে এলে ঠোকর মেরে তাড়িয়ে দেয়। অন্য পাতিহাঁসেরা বলে, "হ্যাঁ লা, কোত্থেকে এই বিশ্রী ছানাটাকে আমদানি করলি, তাড়িয়ে দে তাড়িয়ে দে।" হাঁসী বলে, "আমার যেমন কপাল, এটা মলে বাঁচি।" অন্য বাচ্চাগুলির বেজায় দেমাক—রূপের অহঙ্কারে ফেটে পড়ে যেন। কুৎসিত বাচ্চাটাকে সবাই মিলে একযোগে তেড়ে আসে, বেচারী পালিয়ে বাঁচে।

দল-ছাড়া ঘুরতে ঘুরতে এ-মাঠ সে-মাঠ, এ-জলা সে-জলা, হয়ে কুৎসিত বাচ্চাটা এসে পড়ল এক বিস্তীর্ণ বিলে। চারদিকে দল-কলমী

আর নোনা ঘাস—মাঝে মাঝে জল; কোথাও বা চারদিকে খালি জল যতদূর চোখ যায়। কোথাও ভ্যাপসা ধোঁয়া উঠছে—একটা উগ্র পচা গন্ধ। আশেপাশে ঘরবাড়ী লোকজন কিচ্ছু নেই। বিলে আছে সারস, কোরোমণ্ট, বুনো হাঁস ও অন্য কয়েক রকমের জলচর পাখী। এখানে ওখানে বিকট স্বরে ব্যাঙের গোঙানি চলেছে। এখানে এসে "হাঁপ ছেড়ে বাঁচা গেল" ভেবেছিল সেই কদাকার হাঁসের বাচ্চাটা। কিন্তু এভাব বেশীক্ষণ রইল না। হঠাৎ সে যে জলাশয়টার ধারে বসেছিল সেখানে উড়ে এসে বসল কয়েকটা বুনো হাঁস। তাদের চালচলন অন্য ধরনের, ভব্যতার ধার মোটেই ধারে না। বিনা ভূমিকায় ওকে তেড়ে এল। বুনোগুলির গায়ের জোরও বেশী, আর তারা সংখ্যাতেও পাঁচজন, ওদের সঙ্গে ও পারবে কেন। পাশের নলখাগড়ার ঝোপে ঢুকে কোনমতে প্রাণ বাঁচাল। এমন সময় হঠাৎ গুড়ুম গুড়ুম—তুমুল গর্জন আর সঙ্গে সঙ্গেই সেই বুনো পাঁচটার তিনটা রক্তাক্ত হয়ে লুটিয়ে পড়ল জলে। লালে লাল হয়ে গেল জল। একটা হাঁস আহত হয়ে কলমীদামের নীচে অদৃশ্য হয়ে গেল। অন্যটা ধোঁয়ার সঙ্গে আকাশে মিলিয়ে গেল বুকফাটা আর্তনাদ করতে করতে। যে তিনটি জলে লুটিয়ে পড়েছিল তার দুটো একেবারেই খতম হয়ে গিয়েছে, তৃতীয়টার তখনো ছটফটানি শেষ হয়নি। ঘেউ-ঘেউ-ঘেউ—কোথা থেকে সাক্ষাৎ যমদূতের মত দুটো কালো শিকারী কুত্তা সেখানে ছুটে এসেছে। শিকারীদের গুলিতে হাঁসগুলি বিদ্ধ হওয়ার সাথে সাথেই ডালকুত্তারা ছুটে এসে শিকার কুড়িয়ে নিয়ে যায়। যে হাঁসটা তখনও ছটফট করছিল একটা ডালকুত্তা প্রথমেই সেটার ঘাড়ে কামড়ে ধরল—সঙ্গে সঙ্গে সব ঠাণ্ডা। বাকি হাঁস দুটোকেও মুখে করে নিয়ে গেল ডালকুত্তারা। ভাগ্যিস নলখাগড়ার ঝোপের আড়ালে আশ্রয় নিতে পেরেছিল তাই এ যাত্রা বেঁচে গেল সেই বিশ্রী বাচ্চাটা। ডালকুত্তাগুলির সামনে পড়লে আর রক্ষে ছিল না।

বিলটাও নিরাপদ নয়। বুনো হাঁস শিকার করতে আসে মাংসলোভী শিকারীরা দলে দলে, তাই আবার শুরু হল পথ চলা। এবারে আশ্রয় মিললো বড় সড়কের ধারে এক বুড়ীর ঘরে। বুড়ী আর তার মেয়ে থাকে সেখানে। বুড়ী বেজায় গরীব, বুড়ীর মেয়েটার আবার তিরিক্ষি মেজাজ। বুড়ীর বাড়ী বলতে একটিমাত্র কুঁড়ে ঘর—একই ঘরে রান্না খাওয়া ও শোয়া। প্রথম দিন সন্ধ্যাবেলা ঘরের বাইরে একটা বেতের ঝুড়িতেই আশ্রয় নিতে হল, কারণ, সন্ধ্যা হতে না হতেই বুড়ী আর মেয়ে ঘরের দরজাটা এঁটে দিয়েছে ভাগ্যিস সেই ঝুড়িটার মধ্যে ছিল খানিকটা খড়কুটা বিছানো, নইলে দারুণ শীতে বেচারীর প্রাণে বাঁচাই দায় হত।

ভোর না হতেই বুড়ীর মেয়ে ঘুম থেকে উঠেছে আর দুয়ার খুলে বাইরে এসেই সেই ঝুড়িটা নিয়ে রওনা হয়েছে বাগানের দিকে। ঝুড়িটা ধরতেই হাঁসের বাচ্চাটা প্যাঁক্ শব্দ করে উঠেছে। বুড়ীর মেয়ে তখন হাঁসটাকে গলা ধরে তুলে ধরেছে। "আরে কোত্থেকে এল এই বিশ্রী বাচ্চাটা, দূর হয়ে যা, বলেই এক ঝট্‌কা মেরে দিয়েছে সেটাকে এক আছাড়। আছাড় খেয়ে হাঁসটা, প্রাণভয়ে ছুটতে ছুটতে ঢুকেছে বুড়ীর ঘরে। সেখানেও কি নিস্তার আছে? বুড়ী দেখতে পেয়েছে সেটাকে আর অমনি লাগিয়েছে এক তাড়া, তাড়ার পর তাড়া খেয়ে বেচারীর মাথা হয়ে গেছে গোলমাল। কি করবে, কোথায় যাবে? দিশেহারা হয়ে দিয়েছে শূন্যে এক লাফ, —আর পড়বি তো পড় এক ময়দার গামলায়। সারা গায়ে পাখায় পালকে লাগল ময়দার গুঁড়ো। একেই তো যা চেহারা তার উপর ময়দার ছোপ—আহা কি ছিরি! বুড়ী আর বুড়ীর মেয়ে যা-তা বলে গালাগাল দিতে লাগল। গালাগাল আর তাড়া খেয়ে বেচারী পাগলের মতো দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটতে শুরু করেছে। এ দুনিয়ায় তার স্থান নেই—তার কদাকার চেহারাটা সকলেরই চক্ষুশূল, —ধিক এই বিড়ম্বিত জীবনে।

বুড়ীর বাড়ী হতে তাড়িত হয়ে হাঁসটা এক শরবনে আশ্রয় নিল। সুখে না হলেও অনেকটা সোয়াস্তিতে কাটল কয়েকটা দিন। কিন্তু সেখানে খায় কি? আহারের অন্বেষণে আবার বেরুতে হল সেই আশ্রয় ছেড়ে। এবার খানিকদূর গিয়েই দেখতে পেল এক ধনীর সুরম্য উপবন। সেই উপবনের মধ্যস্থলে আছে এক প্রশস্ত সরোবর। কাকচক্ষুর মতো নির্মল নিস্তরঙ্গ তার জল। কী মনোরম পরিবেশ। বিরাট উদ্যানের চারিদিকেই সুদৃশ্য তরুলতা আর অজস্র রঙিন ফুলের বাহার। হাঁসটা শেষবারের মতো এখানেই তার ভাগ্য পরীক্ষা করে দেখবে—মনে মনে স্থির করল। যদি এখানেও আশ্রয় না জোটে তবে এই বিপুল বিশ্বে আর তার স্থান নেই। জীবনের বিড়ম্বনা আর সে সইতে পারবে না। ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল সরোবরের দিকে। ধীরে ধীরে জলে নামল। তীরের আশেপাশে জলজ ঘাস আর শেওলায় খুঁজতে লাগল আহার্য। কিন্তু খানিক-ক্ষণ পরেই তার নজরে পড়ল আর এক দৃশ্য। বিপরীত দিক হতে তারই দিকে এগিয়ে আসছে ভাসতে ভাসতে দুইটি বৃহদাকার রাজহাঁস। তার মনে হল যেন দুটি সাক্ষাৎ যমদূত। উদ্যতচঞ্চু প্রত্যক্ষ মরণ প্রতি মুহূর্তে এগিয়ে আসছে তার দিকে। আর পালাবার পথ নাই, নিস্তার নাই। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই তার এই কদাকার ঘৃণিত দেহটা ওদের তীক্ষ্ণ চঞ্চুর আঘাতে জর্জরিত হবে! এই চরম সঙ্কটে সে হয়ে উঠল মরিয়া। এতদিন বিনা প্রতিবাদে পড়ে পড়ে মারই খেয়েছে—প্রতিপক্ষের সামনা-সামনি দাঁড়াবার মতো ছিল না কোন সাহস। কিন্তু আজ, জীবনে এই প্রথম, তার পৌরুষ জাগ্রত হল,—মরতেই যদি হয় যুঝেই মরব! তাই স্থির হয়ে সে প্রত্যক্ষ মরণের প্রতীক্ষা করতে লাগল। ক্রমে সেই রাজহাঁস দুটো তার কাছে এগিয়ে এল। কিন্তু এ কী! আক্রমণ দূরে থাকুক সেই আগন্তুক দুজন তাদের সুঠাম বঙ্কিম গ্রীবা উন্নত করে তাকে জানাল স্বাগত অভিনন্দন, "হে তরুণ সুকান্তি রাজহংস, আজ এই

রৌদ্রোজ্জ্বল প্রভাতে আমরা তোমায় স্বাগত জানাচ্ছি। তুমি রাজহংসকূলের সুযোগ্য প্রতিভূ ; হে সুন্দর, হে নবীন, তুমি প্রবীণের সস্নেহ সম্ভাষণ ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করো। আগামী দিনের সূর্য তোমারি জন্য উদিত হবে। তারুণ্য ও সৌন্দর্যের জয় হউক।”

নিজের কর্ণকেই প্রথমটা বিশ্বাস হয় নি। “একি সত্যি যা শুনছি—একি স্তুতিবাক্য না প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ!” এইবার হঠাৎ তার দৃষ্টি পড়ল নির্মল স্বচ্ছ জলে তার নিজ প্রতিবিম্বের প্রতি। এ কী, এ যে স্বপ্ন অপেক্ষাও রোমাঞ্চকর! কোথায় সেই কুৎসিত হাঁসের বাচ্চা! তার পরিবর্তে দুগ্ধশুভ্র, উন্নতগ্রীব, রক্তচঞ্চু মহিমময় এক তরুণ রাজহংস। এও কী সম্ভব! কখন ঘটেছে এই রূপান্তর তার নিজের অজ্ঞাতসারে। দুঃখ, বেদনা ও ব্যর্থতার মধ্য দিয়েই ঘটেছে এই বিস্ময়কর পরিবর্তন, এই রোমাঞ্চকর রূপান্তর। ধিকৃত, লাঞ্ছিত জীবনে ঘটেছে মহিমার নব অরুণোদয়।

আজ তার উপলব্ধি হল—পাতিহাঁসের খোঁয়াড়ে জন্ম নিলেও কোন ক্ষতি নেই যদি রাজহংসের ডিম হতে সে জন্মলাভ হয়। এই হল হ্যান্‌স্‌ ক্রীশ্চিয়ান এণ্ডারসেনের জীবনদর্শনের একটা প্রধান কথা।

কাব্যে আধুনিকতার আস্বাদ

এখন যে যুগের আমরা মানুষ,—বললে ভুল হবে না যে এটা যন্ত্রের যুগ, এটা বিজ্ঞানের যুগ। বিদ্যুতের যুগকেও পিছনে ফেলে মানুষ আজ অ্যাটমের যুগের দিকে এগিয়ে এসেছে। এ যুগের একটা বিশেষ লক্ষণ হচ্ছে বস্তুতান্ত্রিকতা ও ভোগবাদ। প্রাত্যহিক জীবনে নানা সুখ, সম্ভোগ, আরাম, আয়াস কত বেশী লাভ করা যায় তারই জন্য এযুগের মানুষ অতিমাত্রায় ব্যতিব্যস্ত। সব কিছুরই পরখ ও মূল্য নিরূপণ হচ্ছে কঠোর বাস্তবের মানদণ্ডে। ব্যবহারিক জীবনে কোন্ জিনিসটা কতটা লাভজনক সেটাই প্রধান বিচার্য বিষয়। বিষয়বুদ্ধি-প্রধান মানুষের কাছে নিছক কল্পনা-বিলাসের কোন দাম নাই। এই পরিস্থিতিতে কল্পনাশ্রয়ী কাব্যের মূল্য ও আদর যে অতি অকিঞ্চিৎকর হয়ে দাঁড়াবে তাতে আর আশ্চর্য কী?

একজন আধুনিক কবির সওয়ালেই কথাটা মর্মান্তিকভাবে ব্যক্ত হয়েছে।

A poet in heaven, we invoke,
But a poet next-door is a joke.

অতি নিষ্ঠুর ব্যঙ্গ! কী মর্মান্তিক পরিহাস! কিন্তু বিষয়টা একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে যে এই কাজের যুগেও কবি ও কাব্য একেবারে অ-কেজো, অ-দরকারী নয়। সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতি যেন একটা বিরাট ছন্দে বাঁধা। বিজ্ঞান আজও পারে নি, আর কোন দিন পারবেও না এই বিশ্ব-প্রকৃতির অমোঘ নিয়মকে লঙ্ঘন করতে। আসলে বিশ্বরহস্যের উৎস বা মূল সন্ধানই বিজ্ঞানের উপজীব্য।

মানুষ কাজ করে। মানুষের যাবতীয় উদ্যম যদি একটা সুর বা ছন্দের তালে তালে নিয়ন্ত্রিত করা যায় তবে সেই উদ্যম অধিকতর সহজ ও সুফলপ্রসূ হতে পারে। বিশ্ব-কর্ম যেমন একটা সুর বা

ছন্দে বাঁধা, তেমনি মানুষের যাবতীয় কর্মপ্রচেষ্টাকে একটা সুর বা ছন্দে বেঁধে দিতে পারলে সেই প্রচেষ্টায় অধিকতর সার্থকতা আশা করা যেতে পারে। ছন্দই শৃঙ্খলা! ছন্দোহীনতা আনে বিশৃঙ্খলা। ছন্দ, সুর ও গানের মধ্য দিয়ে জেগে উঠে আনন্দ। আর আনন্দ এনে দেয় কাজের প্রেরণা। যে কাজে মানুষ আনন্দ পায় না সে কাজ হয়ে দাঁড়ায় ক্লান্তিদায়ক। আনন্দের ভিতর দিয়ে মানুষ অনেক বেশী কাজ করতে পারে, পরিশ্রম পরিশ্রম বলেই বোধ হয় না, আনন্দ যেন কর্মীর সঞ্জীবনী-শক্তি। এর উদাহরণ অতি সহজেই দেওয়া যায়। সৈন্যদল মরণ-আহবে চলেছে তালে তালে মার্চ করে—সঙ্গে বাজছে যুদ্ধের দামামা ও ব্যাগ-পাইপ। লা মার্সাই সঙ্গীতের অনুপ্রেরণায় ফরাসী বিপ্লবী সেনাদল বহুগুণে পরাক্রমশালী রাজতন্ত্রী সৈন্যের পরাভব ঘটিয়েছিল। আমাদের দেশে ধান কাটার গান, নৌকা বাওয়ার গান, ছাদ পেটানোর গান এমনিতর শ্রম লাঘব করার কৌশল—বহুকাল হতেই মেহনতী মানুষের শ্রমসাধ্য কাজকে সহজতর ও আনন্দকর করে এসেছে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ নয়াচীনের বিপুল কর্মপ্রচেষ্টার উল্লেখ করা যায়। নয়াচীনের কর্মপদ্ধতির সমালোচনা হয়েছে প্রচুর, কিন্তু তার অন্য একটি দিকও আছে। চীন দেশ পরিভ্রমণ করতে এসেছিল একদল চেকোস্লোভাক পর্যটক। তাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল নয়াচীনের গণশক্তির কর্ম-নিযুক্তির পদ্ধতি পর্যবেক্ষণ করা। তারা খুব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব কিছু দেখেছে, আর তাদের অভিমত হচ্ছে এই যে নয়াচীনের নানাবিধ সংগঠন প্রচেষ্টার আশু সাফল্যের পিছনে আছে সত্যিকারের আনন্দের অনুপ্রেরণা। চীনারা গানের তালে কাজ করার সৌকর্যে বিশ্বাসী। নয়াচীনে আজ শিল্পী, কবি ও ছড়া-রচয়িতার যথেষ্ট সমাদর। হাজার হাজার গান, ছড়া ও ছবি রচিত হচ্ছে, ছাপান হচ্ছে আর চারদিকে বিলি করা হচ্ছে। গানের ভিতর দিয়ে, ছড়ার ভিতর দিয়ে, সুরের ভিতর দিয়ে এতগুলি

মানুষকে সে দেশে কাজে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে। গানের চটুল সুরে কঠিন পাথর চূর্ণীকৃত হচ্ছে, আর সুদৃঢ় ওক্ লীলায়িত ভঙ্গীতে বেঁকে যাচ্ছে। একটু নমুনা—

Where's a home without songs ?
What's a house without poems ?
The more we sing, the more we produce,
Poems change into rice and songs into grain.

গান গেয়ে দাঁড় মাঝি টানে,
গেয়ে গান নাচে বাউল,
গান গেয়ে ধান কাটে চাষা।

ভাষা ভিন্ন হলেও ভাব এবং সুরের অতি সুন্দর সমন্বয় দেখা যাচ্ছে।

এই বস্তুবাদের যুগেও কাব্যের প্রয়োজন আছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যে তরুণ ইংরাজ কবি কামান-গর্জনের সঙ্গে কাব্যগুঞ্জন যুক্ত করে খ্যাতিমান হয়েছিলেন সেই রূপার্ট ব্রুক (Rupert Brooke) বলেছিলেন একটা মোক্ষম কথা :—

There are only three things in the world. One is to read poetry, another is to write poetry, and the best of all is to live poetry.

আধুনিক যুগের কবি ও কাব্যকে বুঝতে হলে আধুনিক যুগটাকেও ভাল করে বোঝা দরকার। সভ্যতার ভোল পালটাচ্ছে। সেই কৃষি-নির্ভর পল্লীকেন্দ্রিক সমাজ-ব্যবস্থার বদলে আজ নূতন শহরে সমাজ গড়ে উঠছে। আধুনিক সভ্যতার মূল কেন্দ্র আজ আর গাঁয়ে নয়। আধুনিক সভ্যতার অভিব্যক্তি ঘটছে শহরগুলিকে কেন্দ্র করে। শহর ও শিল্পাঞ্চলের মানুষের সুখ-দুঃখ, আশা-নৈরাশ্য, মিলন ও দ্বন্দ্বকে উপলক্ষ করেই না আধুনিক কবি বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে।

কিন্তু পল্লীপ্রেমিক কবি শহরের প্রতি বিমুখ।

এই যে রাজধানী পাষাণকায়া
বিরাট মুঠিতলে চাপিছে দৃঢ়বলে
ব্যাকুল বালিকারে নাহিক মায়া।

শহররাক্ষসী নিরীহ পল্লীবালাকে নিগৃহীত করছে। শহরের আবিলতায় পল্লীপ্রেমিক কবির প্রাণ তাই কণ্ঠাগত। পুরনো দিনের কবিরা অনেকেই সেই পল্লী-প্রধান জীবনধারার ও শান্ত আরণ্য প্রকৃতির অনুরাগী। শহরের কর্ম-কোলাহল, জনসমাবেশ, যন্ত্র নির্ভর কৃত্রিম জীবনের প্রতি তাদের তীব্র বিদ্বেষ কবিতার ছন্দে যেন মুখর হয়ে উঠেছে।

ইঁটের পরে ইঁট
মাঝে মানুষ কীট
নাইকো ভালবাসা
নাইকো খেলা।

কিন্তু আধুনিক কবির দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ অন্য ধরনের। শহরকে কেন্দ্র করেই এই শ্রমশিল্প-বিজ্ঞানের যুগে মানুষের জীবন। আধুনিক কবিরা তাই শহর ও শহুরে জীবনের নানা বৈচিত্র্যকে অবলম্বন করে তাঁদের গানের মালা গাঁথবার প্রয়াস করছেন, শহর-সমাজের আনাচ-কানাচ থেকেই তাঁদের কাব্য-সৃষ্টির মালমসলা সংগৃহীত হচ্ছে। তাঁরা নূতন উপমা, নূতন রূপক, নূতন আঙ্গিকের অনুসন্ধানে ব্যস্ত। তাই কোন রূপসীর কৃষ্ণকেশদামের স্বরূপ ব্যক্ত করতে গিয়ে আধুনিক কবি আজ আর মেঘমেদুর আকাশের দিকে তাকাচ্ছেন না, তাকাবার অবকাশও বড় কম, চারদিকেই যে পাষাণ প্রাচীর। পিচঢালা কুচকুচে কালো রাস্তাই তো এ-জন্য যথেষ্ট। শিল্পোন্নতি ও রাজনীতি, ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও সামাজিক সমানাধিকার ইত্যাদি বিষয় আধুনিক কাব্যের উপজীব্য। নিছক নীতিকথার ধার কেউ ধারে না। প্রয়োজন-সিদ্ধি আজ আধ্যাত্মিক সাধনার স্থান পরিগ্রহ করেছে।

আধুনিক কাব্যের কোন একটা নির্ধারিত জন্মদিন ও নির্দিষ্ট বয়স নেই। যেটা আজ আধুনিক সেইটাই আগামী দিনে পুরনো। সময়ের পরিবর্তনের মত কাব্যকলারও পরিবর্তন ঘটে, আর নূতন পরিবর্তনকেই 'আধুনিক' আখ্যা দেওয়া হয়। তবু আজকের দিনে আমরা যাকে 'আধুনিক কবিতা' বলছি তার আবির্ভাবের অবশ্য একটা দিন-ক্ষণ মোটামুটি ঠিক করা আছে; আর তা না থাকলে 'আধুনিক' কথাটাই যে নিরর্থক হয়ে দাঁড়ায়।

উনিশ শতকের শেষ দিকে ইংলণ্ডের রাজকবি লর্ড টেনিসনের মৃত্যু হল। দীর্ঘজীবী টেনিসন বহুদিন ইংলণ্ডের কাব্যগগনে শোভা পাচ্ছিলেন। তাঁর তিরোধানে অনেকেই ভেবেছিল: English poetry had died with him—ইংরাজী কাব্যের পরিসমাপ্তি ঘটল। কিন্তু উত্তরকাল এই আশঙ্কাকে অমূলক প্রমাণ করেছে। সুইনবার্ন, মেরিডিথ, রবার্ট ব্রিজেস্, উইলিয়ম্ বাট্লার ইয়েটস, হাউপ্টম্যান এবং টমাস্ হার্ডি সময়ের দিক দিয়ে ভিক্টোরীয় যুগের বটেন, কিন্তু ভাবাভিব্যক্তিতে পরবর্তী কালের। টেনিসনের কণ্ঠ নীরব হয়ে গেলেও ইংরাজী কাব্য-মালঞ্চের বিচিত্র গুঞ্জন স্তব্ধ হয়ে যায় নি। সে গুঞ্জন চলেছে অবিরাম নব নব সুরে, ছন্দে ও ব্যঞ্জনায়। বাংলা কাব্যের ইতিহাসেও প্রায় অনুরূপ একটি ঘটনা ঘটেছিল মহাকবি রবীন্দ্রনাথের প্রয়াণে। সহসা যেন প্রদীপ্ত সূর্য অস্তমিত হল, বাংলার কাব্য-গগনমণ্ডল ঘনান্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে গেল। অনেকের সংশয় হল—বাংলা কাব্য-মঞ্চে শেষ যবনিকা নেমে এল কি? রবীন্দ্রনাথের অনন্যসাধারণ প্রতিভার ঔজ্জ্বল্যে অপেক্ষাকৃত হীন প্রতিভাধরেরা একান্তে ম্লান হয়ে পড়েছিলেন। সমসাময়িক অনেক কবিই রবীন্দ্রনাথের সর্বব্যাপী ছায়ায় আচ্ছন্ন হয়ে ছিলেন। কিন্তু এঁদের মধ্যেও এমন জনকয়েক ছিলেন, যাঁরা রবীন্দ্রনাথের সমকালীন হয়েও পুরোপুরি রবীন্দ্র-প্রভাবাধীন হয়ে পড়েন নি, পরন্তু বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্বকীয়তা রক্ষা করে চলেছিলেন। বাংলা কাব্যে

এ-দলের মধ্যে নাম করতে হয় কবি সত্যেন্দ্রনাথ, কুমুদরঞ্জন, কালিদাস রায়, যতীন্দ্রমোহন প্রভৃতির। এঁদের কৃতিত্ব এই যে, রবীন্দ্র-যুগে জন্মে এবং রবীন্দ্র-প্রতিভার একনিষ্ঠ গুণগ্রাহী হওয়া সত্ত্বেও এঁরা কাব্য-সাধনায় স্বকীয়তা ও স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে পেরেছেন। এঁদের রচনা বাংলা কাব্যের এক অমূল্য অবদান। কিন্তু কি সময়, কি বৈশিষ্ট্য কোন দিক দিয়েই এঁদের আমরা তথাকথিত আধুনিক কবির দলে ফেলতে পারি না। এঁরা মূলতঃ প্রাচীনধর্মী কবি। পূর্বাচরিত আদর্শ, পন্থা বা আঙ্গিকের বিরুদ্ধে এঁরা কোন বিদ্রোহ-ধ্বজা উত্তোলন করেন নি। পুরনোকে মেনে নিয়েই এঁরা নূতন সৃষ্টির প্রয়াসী।

বাংলা কাব্যে আধুনিক সময়ে সত্যিকারের বিদ্রোহাভাস ফুটে উঠল মোহিতলাল, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এবং নজরুলের রচনায়। রবীন্দ্রনাথের সমকালীন এই তিনজন কবি-ই রবীন্দ্রকাব্য-ধর্মকে লঙ্ঘন করে নূতন আদর্শ ও আঙ্গিকে কাব্য সৃষ্টি করে খ্যাতিমান হলেন। মোহিতলালের কাব্যে দেহজ প্রেমের প্রাধান্য দেখা যায়। মোহিতলালই প্রথম আধুনিক বাংলা কাব্যে রক্ত-মাংসে গড়া মানব ও মানবীর জৈব আকর্ষণ এবং দেহ-প্রধান প্রেমকে মর্যাদা দান করলেন। এ-হিসেবে তিনি পরবর্তী চরমপন্থী আধুনিক কবিকুলের পথিকৃৎ। যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ছিলেন পেশাদার ইঞ্জিনীয়র। রবীন্দ্রকাব্য যেন এক একটানা আনন্দের সুর। দুঃখ, নৈরাশ্য, দ্বন্দ্ব, অনাদর, অবিশ্বাস, অন্যায়, অবিচার, অভাব—এ সবের যেন স্থান নাই রবীন্দ্রকাব্যে।

> সে সবার ঊর্ধ্বে নির্লিপ্ত নির্মল
> ফুটিয়াছে কাব্য যেন সৌন্দর্যকমল
> আনন্দের সূর্যপানে; তার কোন ঠাঁই
> দুঃখদৈন্য-দুর্দিনের কোন চিহ্ন নাই।
> জীবনমন্থন বিষ নিজে করি পান
> অমৃত যা উঠেছিল করে গেছে দান।

যতীন্দ্রনাথের কাব্য এর বিপরীতধর্মী। সেখানে দুঃখবাদ মর্যাদা পেয়েছে। জীবন কেবল একটানা আনন্দের সুর নয়। দুঃখের স্থানও জীবনে কম নয়। যতীন্দ্রনাথের কাব্যিক বৈশিষ্ট্য এইখানে সুপরিস্ফুট। তৃতীয় জন হচ্ছেন কাজী নজরুল ইসলাম। ভাবের গভীরতায় নজরুল অপর দুইজন অপেক্ষা হালকা। কিন্তু নজরুল সমসাময়িক যুগের কবি। স্বাধীনতা যুদ্ধের সৈনিকদল অনুপ্রেরণা লাভ করেছিল নজরুলের অগ্নিগর্ভ ছন্দে ও গানে। রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ-প্রেমের গান কমনীয় ছন্দের অনুপম অভিব্যক্তিঃ

অয়ি ভুবনমনমোহিনী
নির্মল সূর্যকরোজ্জ্বল ধরণী,
জনক-জননী-জননী।

আর অগ্নিবীণার কবির কণ্ঠে নিনাদিত হল যুদ্ধের তূর্যধ্বনিঃ

দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে যাত্রীরা হুঁশিয়ার,

* * * *

ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল যারা জীবনের জয়গান
আসি অলক্ষ্যে দাঁড়ায়েছে তারা দিবে কোন্ বলিদান।

নজরুল-ছন্দের বলিষ্ঠতা ও তেজোব্যঞ্জকতা তৎকালীন মুক্তি-সংগ্রামকে সতেজ ও সঞ্জীবিত করে তুলেছিল। বাংলায় নজরুলই প্রথম মার্চ-সঙ্গীতের স্রষ্টা।

কিন্তু মোহিতলাল-যতীন্দ্রনাথ-নজরুলকেও পুরোপুরি তথাকথিত আধুনিক কবির পর্যায়ে ফেলা যাবে না। এঁরা আধুনিকতার অগ্রদূত বটেন, কিন্তু কাল এবং কাব্য-ধর্মের দিক থেকে আধুনিকের পর্যায়ভুক্ত নন।

ইংরাজী সাহিত্যে তথাকথিত আধুনিকতার সূত্রপাত হয় প্রথম মহাযুদ্ধের পর মোটামুটি উনিশ শ' বিশের পর থেকে। সর্বগ্রাসী যুদ্ধের ভয়াল ধ্বংসলীলা মানুষের মনের উপর এক প্রবল প্রতি-

ক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল। ব্যর্থতা, নৈরাশ্য ও শূন্যতায় মানুষের মন ভারাক্রান্ত। স্বপ্নাতুর আবেগ-বিহ্বল কাব্যবিলাসের দিন ফুরিয়ে এল। নূতন একদল কবি আসর জমালেন—যাঁরা পুরনো রীতি এবং আঙ্গিককে পুরোপুরি অস্বীকার করে নূতন পথ ও পদ্ধতির প্রবর্তন করলেন। এই নূতন পথের পথিকৃৎ হলেন উইল্‌ফ্রেড গিব্‌সন্‌, এডিথ্‌ সিট্‌ওয়েল্‌, সাচেভারেল্‌ সিট্‌ওয়েল্‌, এজ্‌রা পাউণ্ড, অডেন, স্টীফেন স্পেণ্ডার, এলিয়ট প্রমুখ কবিবৃন্দ। আবার কোন কোন বিষয়ে এঁদেরও অগ্রগামী হচ্ছেন ইংরাজ কবি হেন্‌লী এবং আমেরিকার কবি ওয়াল্ট হুইটম্যান। যে-কয়েকটি লক্ষণ তথাকথিত আধুনিক কবিতাকে বৈশিষ্ট্য দিয়েছে তা সংক্ষেপত :—

(১) শব্দ-বাহুল্য বর্জন। অল্পকথায় ভাব প্রকাশের চেষ্টা। যন্ত্রযুগে বিজ্ঞান যেমন সময়, দূরত্ব প্রভৃতি নানা বিষয়কে সংক্ষেপিত করেছে, কাব্য-ধর্মও যেন সেই পথকেই শ্রেয় বলে গ্রহণ করেছে।

(২) দ্বিতীয় লক্ষণ তীক্ষ্ণতা। যা বলতে চাই তা কল্পনাশ্রিত উপমা-রূপকের সাহায্যে সুষ্ঠু সুন্দর না করে সোজাসুজি সরাসরি কথায় বলব। উপমা-রূপক-প্রভৃতি অলঙ্কারকে আধুনিক কবিরা যে বর্জন করেছেন তা নয়। তাঁদের উপমা, রূপক, শ্লেষ ও বক্রোক্তি অধিকতর শাণিত এবং প্রত্যক্ষীভূত এবং বাস্তবধর্মী। যা চোখে দেখা যায়, যা কানে শোনা যায়, যা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় জানা যায় তাই দিয়ে অলঙ্কারের ডালা সাজাতে চেয়েছেন এঁরা। আষাঢ়ের পুঞ্জ মেঘে এঁরা কোন রূপসীর এলোকেশের সন্ধান করেন না—হোজ-পাইপের জলে ধোওয়া রাজপথের কালো টার্মাকের রং আর কুচেকুচে কালো চুলের বাহার—এ উপমা কি হয় না! আধুনিক কাব্যের আদর্শ, কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের কথায় খুব সুন্দর ভাবেই বলা হয়েছে :—

"হে মহাজীবন, আর এ-কাব্য নয়
এবার কঠিন কঠোর গদ্য আনো,

পদ-লালিত্য ঝংকার মুছে যাক
গদ্যের কড়া হাতুড়িকে আজ হানো।
প্রয়োজন নেই কবিতার স্নিগ্ধতা—
কবিতা তোমায় দিলাম আজকে ছুটি,
ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময় ঃ
পূর্ণিমা-চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি।”

শব্দ-স্বল্পতা আর প্রয়োগতীক্ষ্ণতা থেকেই আধুনিক কবিতার তৃতীয় বৈশিষ্ট্যের উদ্ভব। আধুনিক কবিতার এই লক্ষণটি হচ্ছে—দুর্বোধ্যতা। আধুনিক কবিতার বিরুদ্ধে একটা বড় অভিযোগ এই যে, এ কবিতা বোঝা কঠিন বা অসম্ভব। যেমন এলিয়টের শ্রেষ্ঠ কাব্য “পড়ো জমি” (Waste Land)—এ কাব্যের ব্যঞ্জনা খুব সহজে সাধারণ পাঠকের কাছে ধরা দেয় না। শব্দ-সংক্ষেপের ফলে একটা কথা বুঝতে হলে আগের বহু কথা বা আনুপূর্বিকতার সঙ্গে পরিচয় থাকা চাই। আধুনিক কাব্য আবেগবর্জিত ও বুদ্ধি-প্রধান। এর আকুতি ও আবেদন প্রধানতঃ বুদ্ধির কাছে, আবেগের নিকট নয়।

কোন এক আধুনিক বাঙালী কবির দুটি লাইন—

অ্যাল্‌হামব্রার স্বপ্নমদির সন্ধ্যামায়া
গরম হাওয়ায় টোলেডো ছড়ায় গ্রেকোর ছায়া।

এই ছত্র দুটির অর্থ পুরোপুরি বুঝতে হলে ইতিহাস ভাল করে জানতে হবে, ভূগোলের সঙ্গে পরিচয় অবশ্যই থাকা চাই এবং আরও অনেক কিছুই জানা থাকলে ভাল হয়। অর্থাৎ কবিতা পাঠ করার সময় হাতের কাছে একখানা এনসাইক্লোপিডিয়া নিয়ে বসা ভাল। কিন্তু তাতেই যে সব সময় সুরাহা হবে তাও নয়। আধুনিক কবিরা অনেকে কবিতার ভিতর এমন অনেক একান্ত নিজস্ব বস্তু, ব্যক্তি বা নাম-ধাম ইত্যাদি ঢুকিয়ে বসে থাকেন যার অর্থ কবি নিজে ছাড়া কোন পাঠকের পক্ষে বোঝা অসম্ভব।

আধুনিক কবিরা চিরাচরিত কথার মিল বা ছন্দকে পরিত্যাগ করে ভাবের ছন্দ নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছেন। *Vers libre, free verse* বা গদ্য-ছন্দের চলন হয়েছে আধুনিক কালে। কেবল ছড়া বা পদ্যেই নয়, তথাকথিত গদ্যেরও একটা ছন্দ আছে। এ-ছন্দ ধ্বনির মিল নয়। এ-ছন্দ আরও সূক্ষ্ম রসবোধসাপেক্ষ। এ-ছন্দ কানের ভিতর দিয়ে না হলেও মর্মের দুয়ারে ঠিক আঘাত করে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ তাঁর দীর্ঘ কবি-জীবনে বহুবার বহু বিচিত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। বহুবার তাঁকে তাঁর সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে "আধুনিক" হতে হয়েছে। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে তথাকথিত আধুনিক গদ্য-ছন্দের স্বপক্ষে তিনি যে সওয়াল রচনা করে গেছেন সে অতি মূল্যবান ঃ

"কাব্যের অধিকার প্রশস্ত হতে চলেছে। গদ্যের সীমার মধ্যে সে আপন বাসা বাঁধছে ভাবের ছন্দ দিয়ে। একদা কাব্যের পালা শুরু করেছি পদ্যে, তখন সে মহলে গদ্যের ডাক পড়েনি। আজ পালা সাঙ্গ করবার বেলায় দেখি কখন অসাক্ষাতে গদ্যে-পদ্যে রফা-নিষ্পত্তি চলেছে। যাবার আগে তাদের রাজিনামায় আমিও একটা সই দিয়েছি। এ-কালের খাতিরে অন্য কালকে অস্বীকার করা যায় না।"

ধ্বন্যাত্মক ছন্দ আর প্রচলিত উপমা ও রূপকের সাহায্য ত্যাগ করেছেন, কেবল এই অজুহাতেই আধুনিক কবি হেয় বা অবজ্ঞেয় —তা হতে পারে না। নূতন আঙ্গিক ও নূতন ঢং-এর অত্যুগ্রতা অনেক সময় অনভ্যস্ত কানে বেসুরো বাজে। রসলিপ্সু মনের দুয়ারে অতিবাস্তব আবেগহীনতার কোনো আবেদন-ই পৌঁছয় না। কিন্তু মনকে, কানকে তৈরী করে নিলে আধুনিক কবিতাও যে আনন্দের সাড়া জাগিয়ে তুলতে পারে তার সাক্ষ্য নেহাত অপ্রচুর নয়।

জীবনানন্দ দাশের "মৃত্যুর আগে"

দেখেছি সবুজ পাতা অঘ্রাণের অন্ধকারে হয়েছে হলুদ,
হিজলের জানালায় আলো আর বুলবুলি করিয়াছে খেলা,
ইঁদুর শীতের রাতে রেশমের মতো রোমে মাখিয়াছে খুদ,
চালের ধূসর গন্ধে তরঙ্গেরা রূপ হয়ে ঝরেছে দু'বেলা
নির্জন মাছের চোখে ; পুকুরের পারে হাঁস সন্ধ্যার আঁধারে
পেয়েছে ঘুমের ঘ্রাণ—মেয়েলি হাতের স্পর্শ লয়ে গেছে তারে ;
মিনারের মত মেঘ সোনালি চিলেরে তার জানালায় ডাকে,
বেতের লতার নিচে চড়ুয়ের ডিম যেন নীল হ'য়ে আছে,
নরম জলের গন্ধ দিয়ে নদী বারবার তীরটিরে মাখে,
খড়ের চালের ছায়া গাঢ় রাতে জ্যোৎস্নার উঠানে পড়িয়াছে ;
বাতাসে ঝিঁঝির গন্ধ—বৈশাখের প্রান্তরের সবুজ বাতাসে ;
নীলাভ নোনার বুকে ঘন রস গাঢ় আকাঙ্ক্ষায় নেমে আসে ;

এই কবিতাটিকে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ "চিত্ররূপময়" আখ্যায় ভূষিত করে-ছিলেন। চিত্রগুলি কেবল দৃশ্যের নয় বিশেষভাবে গন্ধের ও স্পর্শের। দৃষ্টি, গন্ধ ও স্পর্শের যেন এক বিচিত্র ভোজ। রেশমের মতো রোম, ঘুমের ঘ্রাণ, সোনালি চিল, বাতাসে ঝিঁঝির গন্ধ, সবুজ বাতাস, এই সবই কন্‌ভেন্‌শন্‌বহির্ভূত, অপ্রচলিত, কিন্তু অনবদ্য।

একজন আরও সাম্প্রতিক কবি-কণ্ঠের ডাক শুনি :

শোন বাইরে এস
বাঁকের মুখে পরান মাঝি হাঁক দিয়েছে ;
শোন বাইরে এস,
ধান বোঝাই নৌকো রাতারাতি পেরিয়ে যাচ্ছে,
খোকাকে শুইয়ে দাও
বিন্দার বৌ শাঁখে ফুঁ দিয়েছে।
এবার আমরা ধান তুলে দিয়ে
মুখ বুজে মরব না,

এবার আমরা তুলসী-তলায়
মনকে বেঁধে রাখবো না
বাঁকের মুখে কে যাও ?
লণ্ঠনটা বাড়িয়ে দাও।
আমাদের হাঁকে রূপনারায়ণের স্রোত ফিরে যাক্
আমাদের সড়কিতে কেউটে আঁধার ফর্সা হয়ে যাক্
আমাদের হৃৎপিণ্ডের তাল দামামার মত,
ঝড়ের চেয়েও তীব্র আমাদের গতি।

এ অতি সহজ, স্বচ্ছ কথা। এর ভিতর দিয়ে খাদ্যাভাব-পীড়িত জনগণের অভিযোগ ব্যক্ত হয়েছে। এর কাব্যগুণ নিয়ে বিতর্কের অবকাশ কি আছে? দেশ-বিভাগের পর ছেলে-ভুলানো ছড়ার ভিতর দিয়ে সেই সনাতন "উলুখড়ের" দুঃসহ বেদনার প্রতিধ্বনি শুনি।

তেলের শিশি ভাঙল ব'লে
খুকুর 'পরে রাগ করো,
তোমরা যে-সব বুড়ো খোকা
ভারত ভেঙে ভাগ করো—!

এ প্রতিধ্বনি মানুষের হৃদয়-বেদনার চিরন্তন প্রতিধ্বনি। 'আধুনিক' বলেই আধুনিক কবিতা অনাদরের বস্তু নয়। সাহিত্যে ও কাব্যে নূতন স্বষ্টির প্রয়াস চলেছে। কালের কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে আজকের 'আধুনিক' কবিতাও যে আমাদের ভাষার চিরন্তন সম্পদরূপে পরিগণিত হবে তাতে সন্দেহ কি?

তবে আধুনিক কবিদের বিরুদ্ধে একটা বড় নালিশ আছে। তাঁরা দাবি করেন যে তাঁরা ইতরজনের কবি, তাঁরা সমাজের নিচু মহলের কবি। তাঁরা কামার, কুমোর, ছুতোর, মেথরের কবি। তাঁরা "কর্মের আর ঘর্মের কবি।" কিন্তু সত্যিই কি তাই? সত্যি কি তাঁরা মাটির মানুষের কাছাকাছি আসতে পেরেছেন? আধুনিক কবিরা

(অধিকাংশই) আর যাই করে থাকুন, মাটির মানুষের কাছাকাছি আসতে পারেন নি—একথা নিঃসন্দেহে সত্য। তাঁরা বস্তি নিয়ে কবিতা লিখেছেন, চাষী-মজুরের দুঃখে বিগলিত হয়েছেন, সমাজের বঞ্চিতা-পতিতাদের জন্য তাঁদের দরদের অন্ত নেই, কিন্তু এত করেও তাঁরা বেড়ার ওধারেই রয়ে গেলেন। তার কারণ, তাঁরা যে ভাষায় কথা বলেন, আর কথাকে তীক্ষ্ণ ও শাণিত করবার জন্য যেসব রূপক ও অলঙ্কারের সাহায্য গ্রহণ করেন তা আদৌ মাটির মানুষের কাছে বোধগম্য হয় না। তাঁরা বস্তিবাসীর কাহিনী শৌখীন বালীগঞ্জীয় ভাষায় ব্যক্ত করেন বলেই এই বিভ্রাট। তাঁদের দাবি ও দম্ভ তাই অধিকাংশেই অসার। সত্যিকারের লোক-কবি বাঙালী কৃত্তিবাস ও কাশীদাস, স্কটল্যাণ্ডের জাতীয় কবি রবার্ট বার্নস্। সেই কবিই নরকুলে ধন্য যাঁকে মনের মন্দিরে নিত্য সেবে সর্বজন। কাব্যরস-পিপাসু গৌড়জন প্রতীক্ষায় আছে উত্তরকালের গণচিত্ত-জয়ী কবির জন্য।

যে আছে মাটির কাছাকাছি,
সে কবির বাণী লাগি কান পেতে আছি।

* * *

এসো কবি অখ্যাত জনের অজ্ঞাত মনের ;
মর্মের বেদনা যত করিও উদ্ধার
প্রাণ-হীন এ-দেশেতে গানহীন যেথা চারিধার।
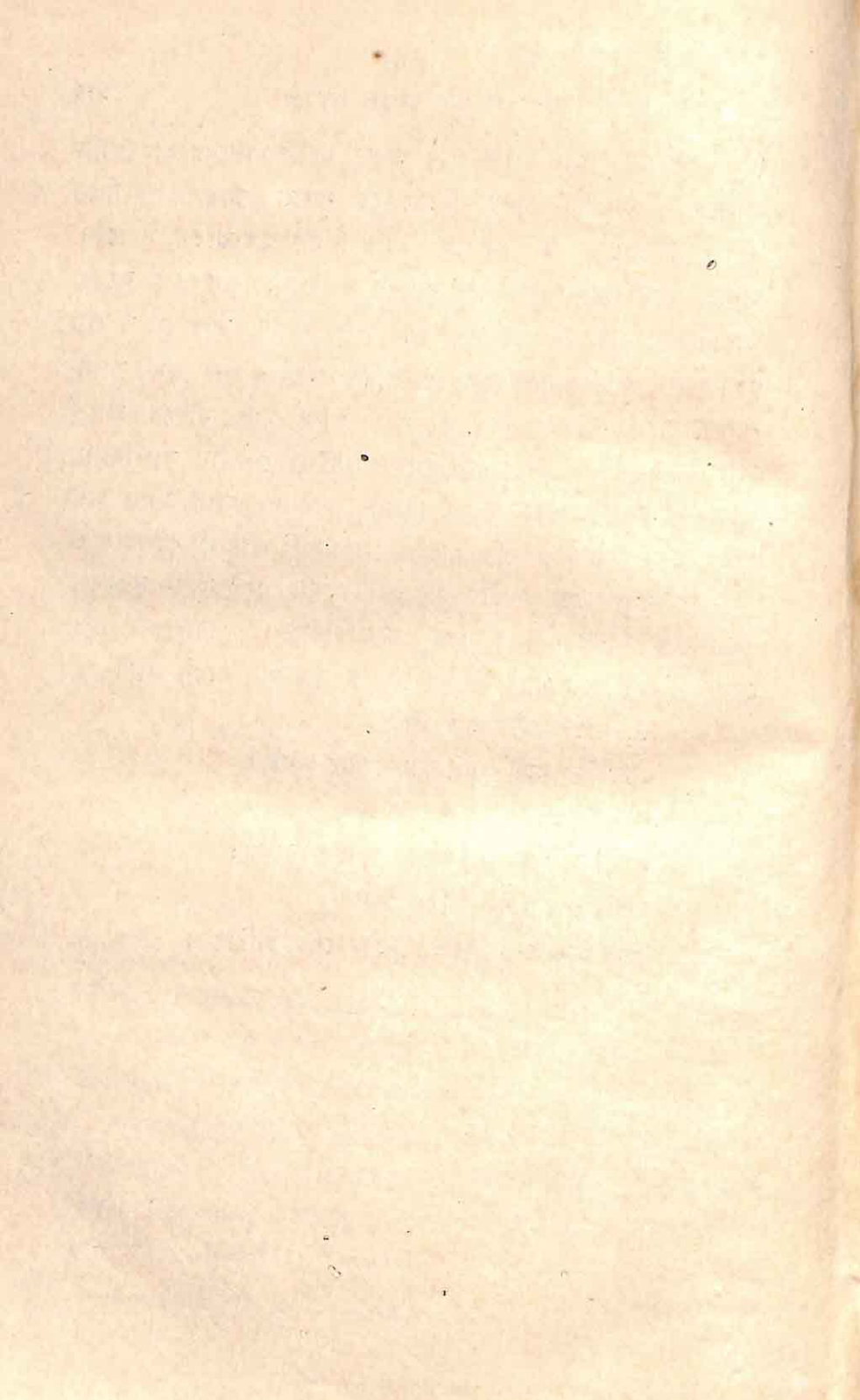
॥ লেখকের অন্যান্য বই ॥

১। সীমান্তের সপ্তলোক ২। অন্যদেশ ৩। আপন দেশ		ভ্রমণ সাহিত্য
৪। সমাজ শিক্ষার ভূমিকা ৫। জনশিক্ষার কথা		শিক্ষা বিষয়ক
৬। Never Too Late ৭। Inspection of Schools and Other Essays		Educational